শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১০

প্রকাশকাল
১৫.০৬.১২

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯, মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫
০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
৩৫০.০০ টাকা
৩৫০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

স ম্পা দ কী য় : এক

মহৎ শিল্প-সাহিত্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক চিন্তা থাকা যেমন জরুরি; রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতা থাকা আরো জরুরি। কেননা শিল্প ও শিল্পীর যৌথ প্রয়াসই মানুষের মুক্তি ঘটাতে পারে।

বর্তমান সময়ে একটি বিষয় প্রায় ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে; সেটা হল পুরস্কার-প্রথা; যা অনেক শিল্পীর সৃষ্টির ক্ষমতাকে খর্ব করে দিচ্ছে। এর ফল হিসেবে শিল্পীর মনোজাগতিক দায়বদ্ধতারও মৃত্যু ঘটছে। কেননা চূড়ান্ত বিচারে পুরস্কার দেয়া ও নেয়া বাণিজ্যিক রূপ নিয়ে শিল্পের মূল উদ্দেশ্যকেই নস্যাৎ করে দিচ্ছে। তথাকথিত পুরস্কার কখনোই কোনো ভালো কাজের স্বীকৃতি হতে পারে না। কাজেই প্রকৃত শিল্পীমাত্রেরই বাণিজ্যের মোড়কে ঢাকা এই ধরনের পুরস্কার থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

গোলাঘরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত
০১.০৮.২০১০

স ম্পা দ কী য় : দুই

দেখতে দেখতে প্রকাশ হচ্ছে 'গোলাঘর'-এর ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা। ইতোমধ্যে নিন্দা ও প্রশংসা দুই-ই পেয়েছি ভালোই; ওটা আমাদের তো আলো-ই! কতদূর যাওয়া যায় দেখা যাক; পাঠক-লেখক-সম্পাদকের মধ্যে কেন এত ফাঁক!...

'গোলাঘর' অতি রুগ্ন শরীর নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল; ধীরে ধীরে এর শরীর মোটা হচ্ছে; কিন্তু শরীর মোটা হওয়া মানেই তো ভালো স্বাস্থ্য নয়! কতটা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী– সেই বিচারের ভার পাঠকের ওপর রইল।

দুই

গোলাঘর-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় 'আমাদের ইশকুল বাড়ি' নামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল যার কবির নাম আমরা তখন জানতে পারিনি। কারণ কবিতার সঙ্গে কিংবা প্রেরিত খামের গায়ে কবির নাম ছিল না। তবে ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা প্রকাশের কিছুদিন পরে সেই কবির নাম আমরা জানতে পেরেছি। কেন তিনি কবিতার নামের সঙ্গে কিংবা ডাক-খামের গায়ে নিজের নাম লেখেননি? জবাবে তিনি জানালেন এমনিতেই নামটি লেখা হয়নি। আত্মগোপনে থাকা সেই কবি হলেন কাজলেন্দু দে; ঢাকা সিটি কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করছেন এবং নিভৃতে উৎকৃষ্ট সব কবিতার চর্চা করছেন। উল্লেখ্য তিনি আমার কলেজ জীবনের শিক্ষক।

গত দুই সংখ্যায় প্রকাশিত আবদুশ শাকুর প্রণীত ‘গোলাপসংগ্রহ’ গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত রচনাটির সঠিক শিরোনাম: “কবি বেলাল চৌধুরীর সঙ্গে গোলাপ নিয়ে একদিন”। কিন্তু ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে “বেলাল চৌধুরী-আবদুশ শাকুর কথোপকথন: গোলাপ নিয়ে একদিন”। অনভিপ্রেত এই ভুলের জন্য ‘গোলাঘর’ দুঃখিত।

সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

সম্পাদক
শওকত হোসেন
১৩.০৮.২০১০

সূচি

স্মরণ
প্রয়োজন কি? ২২৩ ০৭

ব্যক্তিত্ব/প্রবন্ধ
ব্রিটিশ শাসনের রোষানলে মুকুন্দদাস
বদিউর রহমান ০৯

রাজনীতি/প্রবন্ধ
বাংলাদেশে বাম শক্তির ব্যর্থতা এবং করণীয়
মো. আনিসুর রহমান ১৭

কবিতা
একুশ জন কবির একুশটি কবিতা ৩৬

প্রকাশিত কবিতার দু’টি আলোচনা
আলম খোরশেদ : এক/মুজিব মেহদী : দুই ৬১

রম্য / প্রবন্ধ
প্রসঙ্গ: রম্য রচনা
আবদুশ শাকুর ৭৯

গল্প
পিঠটান
মনির জামান ৯৫

গোলাঘর
আকমল হোসেন নিপু ১১৭

প্রকাশিত দু'টি গল্পের আলোচনা
তুহিন সমদ্দার ১২৪

চলচ্চিত্র / প্রবন্ধ
বিশ্বচলচ্চিত্রকর্মা সত্যজিৎ: ভিন্ন বিবেচনায়
রবিউল হুসাইন ১৩১

সংগীত / প্রবন্ধ
গণসংগীতের গাঙচিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস
মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী ১৪০

অনুবাদ / কবিতা
একান্ত কথন চতুষ্টয়/ মাহমুদ দারবিশ
মফিদুল হক ১৪৮

দর্শন / প্রবন্ধ
লোকায়ত দর্শন: মুক্ত ভাবনার গোড়ার কথা
সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার ১৫১

বিজ্ঞান / প্রবন্ধ
বিবর্তনের পথে ইতিহাসের বাঁকে
আসিফ ১৬১

অনুবাদ / গল্প
নওয়াবদিন ইলেক্ট্রিশিয়ান/ দানিয়াল মুঈনুদ্দীন
শওকত হোসেন ১৬৮

অর্থনীতি / প্রবন্ধ
রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-চিন্তা: একালের নিরীখে
সেলিম জাহান ১৮২

মূল্যায়ন / প্রবন্ধ
আহমদ ছফার প্রবন্ধ: অন্তর্গত দায়ভার
হাসান অরিন্দম ১৮৯

পর্যটন / নিবন্ধ
বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমম্ভাবনা
মো. নূরুল আমিন ১৯৮

মিডিয়া / প্রবন্ধ
ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ‘সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি’ ধারণা: একটি তত্ত্বীয় পর্যালোচনা
কাবেরী গায়েন ২০১

শিশু - কিশোর / প্রবন্ধ
শিশু ও টেলিভিশন
ফাহ্মিদা মঞ্জু মজিদ ২২৩

নগর / নিবন্ধ
যানজটজনিত স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি
হোমায়রা আহ্মেদ ২২৮

বই আলোচনা
বাঁধ ভেঙে দাও: ১৯৬০ সালে রচিত সম্প্রতি উদ্ধারকৃত উপন্যাস প্রসঙ্গে
মিলন রায় ২৩২

ধর্ম / প্রবন্ধ
অক্ষয়কুমার দত্ত: ধর্মচিন্তা
অন্নপূর্ণা বিশ্বাস ২৩৭

বই আলোচনা
ক্রসফায়ার থাকলে আইন-আদালত থাকার প্রয়োজন কি?
জাহেদ সরওয়ার ২৬৩

পুনর্মুদ্রণ / প্রবন্ধ
কেন লিখি
জীবনানন্দ দাশ ২৬৭

অনুবাদ / কবিতা
মাহমুদ দারবিশ / একান্ত কথন চতুষ্টয়
মফিদুল হক ২৭২

গোলাঘর
আকমল হোসেন নিপু ২৭৫

শিশু - কিশোর / প্রবন্ধ
শিশু ও টেলিভিশন
ফাহ্‌মিদা মঞ্জু মজিদ ২৮২

চলচ্চিত্র / প্রবন্ধ
বিশ্ব চলচ্চিত্রকর্মা সত্যজিৎ
রবিউল হুসাইন ২৮৫

রচিত-সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ
কবি সমরেশ দেবনাথ ২৯৪

স্মরণ

.....

মুকুন্দদাস

১২৮৫-১৩৪১

[মুকুন্দদাস-এর জন্ম ১২৮৫ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরের বানাড়ি গ্রামে। বাবার দেয়া নাম যজ্ঞেশ্বর দে। বাবা গুরুদয়াল দে এবং মা শ্যামাসুন্দরী দেবী। পদ্মা নদীতে বানাড়ি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে বাবা সপরিবারে বরিশাল চলে যান। বরিশালের ডেপুটি আদালতে বাবা আর্দালির চাকরি নেন এবং আলেকান্দা এলাকায় একটি মুদির দোকান খোলেন। মুকুন্দদাস বরিশাল জেলা স্কুল ও ব্রজমোহন স্কুলে পড়েছেন তবে প্রবেশিকাও

পাস করেন নি। পিতার মুদির দোকানে দোকানদারি করা ও শহরের যুবকদের নিয়ে আড্ডা দেয়া ছিল তাঁর প্রাক-শিল্পী জীবনের কাজ। ১৯ বছর বয়সে বীরেশ্বর গুপ্ত নামে এক বৈষ্ণবের কণ্ঠে গান শুনে কীর্তনের দলে যোগদান।

পরে সেই বৈষ্ণবকে সঙ্গে নিয়ে একটি কীর্তনের দল গঠন। ১৯০২-এ রামানন্দ গোসাঁইজী বা হরিবোলানন্দ নামে এক সাধুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ। মন্ত্রগুরু রামানন্দ স্বামীর কাছ থেকেই 'মুকুন্দদাস' নাম গ্রহণ। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্তের কাছ থেকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। অতঃপর চারণ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ। দেশাত্মবোধক সংগীত ও নাটক রচয়িতা। 'স্বদেশী যাত্রা' নামে এক অভিনব যাত্রার উদ্ভাবক, অভিনেতা ও প্রচারক। লিখতেন 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায়। মাতিয়ে রাখতেন যাত্রাগানের মাধ্যমে পুরো বরিশাল। কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক 'বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণ-সম্রাট মুকুন্দ' উপাধিতে এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'সন্তান' আখ্যায় ভূষিত। বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনে (১৯০৫–১৯১১) বিশেষ ভূমিকা পালন। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক গান ও স্বদেশী যাত্রাভিনয়ের জন্য পড়েন ইংরেজ সরকারের কোপানলে। ১৯০৮-এ গ্রেফতার ও জামিনে মুক্তি লাভ। 'মাতৃপূজা' গীত-সঙ্কলনে ইংরেজ-বিদ্বেষী গান প্রকাশিত হওয়ার কারণে হয় তিন বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা। জরিমানার টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে পৈতৃক দোকান বিক্রি। কারাবাসের সময়ে স্ত্রী সুভাষিণী দেবীর মৃত্যুবরণ। অসহযোগ আন্দোলনে (১৯২০–১৯২২) ও আইন অমান্য আন্দোলনকালে (১৯৩০) যাত্রাপালা গেয়ে জনসাধারণের মনে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি, কৃষক-মজুর, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর ও নারীর জাগরণের ক্ষেত্রে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ, পরাধীন ভারতকে ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর গান ও যাত্রাপালা শাণিত অস্ত্রের মতো কাজ করেছে। রচিত গ্রন্থ: সাধনসঙ্গীত, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, পথ, সাথী, সমাজ, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। মৃত্যু ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ বঙ্গাব্দে।]

বদিউর রহমান

ব্রিটিশ শাসনের রোষানলে মুকুন্দদাস

প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনে উন্মাতাল পরিবেশে মুকুন্দদাসের জীবন গড়ে উঠেছে। যার পেছনে ছিল মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত'র মতো সংগঠক এবং দৃঢ়চেতা মহাপুরুষের অনুপ্রেরণা। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের আদর্শ, বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন, বিদেশি বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন, বন্দেমাতরম ধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা, নিষেধাজ্ঞা অমান্য, ব্রিটিশ শাসক কর্তৃক প্রাদেশিক সম্মেলন ভণ্ডুল ইত্যাদি নানা ঘটনা মুকুন্দদাসকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। এসব দেখে-শুনে মুকুন্দদাস কণ্ঠে তুলে নেন স্বদেশী গান আর যাত্রাপালা। গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে মুকুন্দদাস স্বদেশী গান আর যাত্রাপালার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে সচেতন করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই পথ মসৃণ নয়, বন্ধুর; তা জেনেই তিনি এই পথে নেমেছেন। '১৯০৫ সালের শারদীয় ছুটির সময়ে মুকুন্দদাস ৩/৪ টাকা দক্ষিণা নিয়ে যাত্রা শুনিয়ে সেই অর্থে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করতেন। তাঁর চিত্তক্ষেত্রে শ্যামা মা, আর শ্যামা দেশজননী একাকার হয়ে গিয়েছিল। গান গাইতেন, চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ত।

গানের পদ-

জাগো গো জাগো গো জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কেউ তো জাগিবে না মা-
তুই না নাচালে কারো নাচিবে না ধমনী।

তার মুখে অভয়বাণী-

ভয় কি মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমররঙ্গে।

ব্রিটিশ শাসকের শাসনাধীন জিলায় যাচ্ছেন স্বাদেশিক যাত্রার বিজয়-অভিযান নিয়ে, তিনি যাত্রাপালা তৈরি করেছিলেন অশ্বিনীকুমারের আদর্শ নিয়ে, স্বদেশী ও অশ্বিনী কুমারের আদর্শের জয় ঘোষিত হচ্ছিল জিলায় জিলায়। বাংলার যুবশক্তি দণ্ড-ভয় উপেক্ষা করে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশের কাজে। পরপর ৩৬টি

ইনজাংশন জারি করা হয়েছিল পুলিশের তরফ থেকে মুকুন্দকে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিতে। মুকুন্দও অন্য এলাকায় চলে যেতেন এবং সেখানে নতুন উদ্যমে তাঁর কণ্ঠ বেজে উঠত।'*(হীরালাল দাশগুপ্ত: স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল: সাহিত্য সংসদ কলকাতা: দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭ পৃ. ৬১-৬২)*

এর প্রতিবাদে মুকুন্দদাসের সরাসরি উচ্চারণ:

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম।
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।

কিংবা

ফুলার আর কী দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে।
মন তো তোমার নয়।

ইংরেজ শাসক আর তার প্রতিনিধি সম্বন্ধে এমন উচ্চারণের সঙ্গে কেবল তুলনা করা যায় সমসাময়িক আর-এক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের–

এদেশ ছাড়বি কি না বল
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।

–এর সঙ্গে। চিরায়ত বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম যাত্রাপালা অভিনয়ের মাধ্যমে মুকুন্দদাস ব্রিটিশবিরোধী এইসব বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। দেশপ্রেমের দায়বদ্ধতা নিয়েই মুকুন্দদাস অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তাঁর এই কর্মকাণ্ডে টনক নড়েছে ব্রিটিশরাজের। তাঁর কণ্ঠরোধ করার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকার। চলে যাত্রাপালা অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা, গ্রেফতার, জেল, রচিত নাটক বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি নানা নিষ্পেষণ। প্রথমে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় 'মাতৃপূজা' যাত্রাপালা অভিনয়ের ওপর। একে একে ছত্রিশ বার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই পালাভিনয়ের ওপর। কোনো স্থানে 'মাতৃপূজা' অভিনয় আয়োজনের সংবাদ পেলেই সরকার তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞা যেহেতু আসে কোনো থানার মাধ্যমে সেহেতু তার কার্যকারিতাও থাকে ঐ থানার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো নির্দিষ্ট থানায় নিষেধাজ্ঞা আসার খবর পেলেই মুকুন্দদাস ত্বরিত সেই থানার এলাকার বাইরে অন্য থানায় অভিনয়ের আয়োজন করেন। সেই অভিনয়ের সংবাদ থানার মাধ্যমে মহকুমা বা জেলা সদরে পৌঁছে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আসতে আসতে অভিনয় শেষ হয়ে যায়। এমনভাবে মাতৃপূজা যাত্রা পালাভিনয়ের ওপর বারবার নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হয় সরকারকে। কিন্তু মুকুন্দদাসের অভিনয় থামাতে পারেনি আইনি শাসন। পুলিশের চোখ এড়িয়ে বা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অভিনীত হয়েছে 'মাতৃপূজা'। এই পালা অভিনয়ে প্রচুর লোক সমাগম হত। এই সংবাদ পেয়ে

দলবলসহ মুকুন্দদাসকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা নেয় ব্রিটিশ সরকার। সুযোগ খুঁজতে থাকে।

একদিন মুকুন্দদাস তার দলবল নিয়ে বড় নৌকায় বরিশাল থেকে উত্তর শাহবাজপুর (বর্তমান ভোলা) রওনা হলেন। নৌকায় উদাত্ত কণ্ঠে গান, পালার মহড়া, রান্না-খাওয়া ইত্যাদি চলছে পুরোদমে। নৌকা চলছে গভীর রাতে। এই নৌপথে সরকারি লঞ্চ নিয়ে ধাওয়া করে পুলিশ নৌকাসহ গ্রেফতার করে মুকুন্দদাস ও তার দলবলকে। ক্রোক করা হয় নৌকার সকল মালামাল। লঞ্চের সঙ্গে নৌকা বেঁধে নিয়ে আসা হয় বরিশাল। ১০৮ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে পরের দিনই আদালতে তোলা হয় মুকুন্দদাসকে। দায়ের করা হয় রাজদ্রোহের মামলা। বরিশালের উকিলদের সহায়তায় সেদিন মুকুন্দদাস ৫০০ টাকার মুচলেকায় জামিন পান। মামলার পরবর্তী তারিখ পড়ে। অভিযোগ দায়ের করা হয় নোয়াখালি থেকে প্রকাশিত 'মাতৃপূজার গান' পুস্তিকার একটি গানের আপত্তিকর(!) অংশের জন্য। সেই অংশটুকু এরকম:

বাবু বুঝবে কি আর মলে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে ॥

এবং

ছিল ধান গোলাভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা
চোখের ঐ চশমাজোড়া দেখ না তোরা খুলে।

এই মামলায় সরকার পক্ষে ওকালতি করেন ব্যারিস্টার নলিনীভূষণ গুপ্ত।

মামলার শুনানির আগে এবং মামলার পরবর্তী তারিখের তিন দিন আগে জামিনে মুক্ত থাকা অবস্থায় বরিশালের সদর রোড থেকে মুকুন্দদাসকে আবার গ্রেফতার করা হয়। এবার মামলা দেয়া হয় ১২৪ ধারায়। পাঠানো হয় জেলহাজতে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভবরঞ্জন মজুমদার এবং নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও একই সঙ্গে গ্রেফতার হন। এবারের মামলা হয় বরিশাল থেকে 'দেশের গান' নামে একটি বই প্রকাশের অপরাধে। এই বইটিতে মুকুন্দদাসের অভিযুক্ত গানটিও স্থান পায়। ভবরঞ্জন মজুমদার ছিলেন ঐ বইয়ের সম্পাদক আর নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মুদ্রাকর। বইটির প্রকাশক ছিলেন মুকুন্দদাসের ছোট ভাই রমেশচন্দ্র দে। নোয়াখালি থেকে দেড় বছর আগে প্রকাশিত বইয়ের মুদ্রিত গানের অভিযোগে দায়ের করা মামলা দুর্বল হতে পারে ভেবেই এই দ্বিতীয় মামলা।

মামলা আদালতে উঠল কিন্তু মুকুন্দদাসের পক্ষে কোনো আইনজীবী দাঁড়ালেন না। মুকুন্দদাস নিজেই আইনি সহায়তা গ্রহণের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করে। বন্দি অবস্থায় আদালত থেকে জেলখানা যাবার সময় আইনজীবী সমিতি'র সামনে দাঁড়িয়ে মুকুন্দদাস ক্ষোভ প্রকাশ করে উকিলদের ভর্ৎসনা করেন। বরিশালের উকিলদের তাতেও ঘুম ভাঙে না। এই সংবাদ পেয়ে বরিশালের

উকিলদের লজ্জা মোচনের দায় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন ভোলা মহকুমার দুই অগ্রগামী আইনজীবী নবীনচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র সেনসহ আরও কয়েকজন। এই শরৎচন্দ্র সেন পরবর্তী সময়ে স্বামী পূর্ণানন্দ গিরি মহারাজ নামে পরিচিত হন। তারা বরিশাল কোর্টে এসে মুকুন্দদাসের পক্ষে ওকালতি করেন। তারপর বরিশালের আইনজীবীদের সঙ্গে আলাপ করে বরিশালের আইনজীবী যাদবচন্দ্র রায়কে মুকুন্দদাসের পক্ষে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মুকুন্দদাসের ছোট ভাই রমেশচন্দ্র দে ভাইয়ের মামলার তদবির করতে আদালতে আসতেন। একদিন পুলিশ তাকেও গ্রেফতার করে। অপরাধ নোয়াখালি থেকে প্রকাশিত 'মাতৃপূজার গান' পুস্তিকার প্রকাশক ছিলেন রমেশচন্দ্র দে।

বরিশালের আদালতেই এই মামলার বিচার হয়। বিচারে মুকুন্দদাসের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানা হয়। অনাদায়ে আরও এক বছরের জেল এবং মুকুন্দদাসের ভাই রমেশচন্দ্র দে'র ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড । পুলিশ মুকুন্দদাসের মেডেলগুলো জব্দ করে নিলামে দেয়। এই মেডেল বিক্রির টাকা দিয়েই তার জরিমানার টাকা শোধ করা হয়। উল্লেখ্য, মুকুন্দদাসের বাবা গুরুদয়াল দে নিলামে মেডেল ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে বেশি দাম দিয়ে মেডেলগুলো উদ্ধার করেছিলেন। ব্রিটিশের চোখে আপত্তিকর গানটি পুনঃপ্রকাশের অপরাধে 'দেশের গান' বইয়ের সম্পাদক ভবরঞ্জন মজুমদারকে দেড় বছর এবং মুদ্রক নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় আদালত। কারাগারে মুকুন্দদাসকে দিয়ে রান্নার কাজ করানো হত, তেলের ঘানি টানানো হত। বলতে বলতে জেলে মুকুন্দদাসের অনেক শিষ্য জুটে যায়। মুকুন্দদাস তাদের গান শোনাতেন, দেশের কথা শোনাতেন। বিষয়টি জেল কর্তৃপক্ষের নজরে এলে বাংলাভাষীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে মুকুন্দদাসকে পাঠানো হয় দিল্লি কারাগারে। কারাদণ্ড ভোগ শেষে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ বা এপ্রিল মাসে মুকুন্দদাস দিল্লি জেল থেকে মুক্ত হন। কেবল জেল নয়, ব্রিটিশ সরকার মুকুন্দদাসের কর্মকাণ্ডে এত বিচলিত হয়েছিল যে একের পর এক নিষিদ্ধ করে তাঁর অনেকগুলো যাত্রাপালা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা অনুসারে এইসব বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৩১-এর জরুরি ক্ষমতা আইনের ১৯ ধারাটি এরকম:'19. Where any newspaper, book or other document wherever made appears to the (Provincial Government) to contain any words, signs or visible representations of the nature described in Section-4, Sub-section (1) the (Provincial Government may, by notification in the Official Gazette), stating the ground of its opinion, declare every copy or the issue, of the newspaper, and every copy of such book or other documents to be forfeited to His Majesty, and thereupon any Police-officer may seize the same wherever found in British India, and any Magistrate may by warrant authorise any Police

officer not below the rank of sub-inspector to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be.'

মুকুন্দদাসের রচিত প্রথম যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পুস্তিকার একটি গানের অংশবিশেষ 'বাবু বুঝবে কি আর মলে /ছিল ধান গোলাভরা শ্বেত ইঁদুরে করল সারা'-র জন্য মুকুন্দদাসের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা এবং তিন বছর সাজা হয়। মাতৃপূজা প্রসঙ্গে মুকুন্দ-গবেষকের-মন্তব্য–'১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২রা বৈশাখ বরিশালের রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে অগণিত লোকসহ স্বয়ং অশ্বিনীকুমার মুকুন্দের 'মাতৃপূজা' অভিনয় শ্রবণ করিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইয়া মুকুন্দকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, 'বীর হও। অন্যায়ও যদি করতে হয় বীরের মতো কর।'*(জয়গুরু গোস্বামী: চারণকবি মুকুন্দদাস: বিশ্ববাণী কলকাতা: দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৯৭৮: পৃ. ৭১৯)*। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই মাতৃপূজা পালাভিনয়ের ওপর ব্রিটিশ সরকার ছত্রিশ বার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বরিশাল থেকে শাহবাজপুর যাবার পথে নৌকায় মুকুন্দদাস, তাঁর দলবল এবং নৌকার সকল মালামাল আটক করা হলে 'মাতৃপূজা'র সমুদয় কপিও পুলিশ নিয়ে যায় এবং পরে ধ্বংস করে ফেলে। 'মাতৃপূজা' কখনও ছাপা হয়নি, তাই পুলিশের নেয়া কপিগুলো ছিল হাতে লেখা। এ প্রসঙ্গে আর-এক গবেষক লেখেন: 'মুকুন্দদাসের প্রথম যে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়, তার নাম মাতৃপূজা। গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কারণ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই এটি বাজেয়াপ্ত হয়। ফলে 'মাতৃপূজা' নাটক প্রকাশের সুযোগ পায়নি।'*(শিশির কর: ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই: আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮, পৃ. ২৩৩)*

মুকুন্দদাসের যাত্রাপালা 'কর্মক্ষেত্র' একাধিকবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। 'কর্মক্ষেত্র' প্রথম নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল। ঐ তারিখে জারি করা গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে 'কর্মক্ষেত্র' নিষিদ্ধের ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা বলে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে। বইয়ের মুদ্রাকর ছিলেন বরিশালের আদর্শ প্রেসের স্বত্বাধিকারী সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর এর প্রকাশক ছিলেন লেখক মুকুন্দদাস নিজেই; প্রকাশের ঠিকানা ছিল কাশীপুরের 'আনন্দময়ী আশ্রম'। 'কর্মক্ষেত্র' নিষিদ্ধ হবার পরও এর আর দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয় বরিশালের অভ্যুদয় প্রেস থেকে এবং তৃতীয় সংস্করণ বরিশালেরই বাসন্তী প্রেস থেকে। দু'টি সংস্করণেরই প্রকাশক ছিলেন মুকুন্দদাস নিজে আর প্রকাশস্থান কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম। এই দু'টি সংস্করণ একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুলাই তারিখের গেজেট ঘোষণায়। এই নিষেধাজ্ঞাও আসে ১৯৩১-এর ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারায়। পরবর্তী সময় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' প্রকাশিত 'মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী'তে 'কর্মক্ষেত্র'

পালাটি মুদ্রিত হয় খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিলের গেজেট ঘোষণায় বাজেয়াপ্ত হয় মুকুন্দদাসের 'পথ' নাটকটি। ওই গেজেট ঘোষণার নম্বর 'বেঙ্গল নং ১১৬৬৮-৮০ পি'। 'পথ'-এর মুদ্রাকর ছিলেন বরিশাল আদর্শ প্রেসের সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রকাশক স্বয়ং মুকুন্দদাস আর প্রকাশস্থান কাশীপুর আনন্দময়ী আশ্রম।

ব্রিটিশ সরকার মুকুন্দদাসের আরও দু'টি বই বাজেয়াপ্ত করে। এ দু'টি হল 'কর্মক্ষেত্রের গান' ও 'পথের গান'। বই দু'টি যথাক্রমে 'কর্মক্ষেত্র' এবং 'পথ' যাত্রাপালার গানের সংকলন। 'কর্মক্ষেত্রের গান' বইটির তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ নভেম্বরের গেজেট ঘোষণায়। ১৯৩১-এর ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারা বলে। লেখক মুকুন্দদাস নিজেই এটি বরিশাল থেকে প্রকাশ করেন। 'পথের গান' বইটি নিষিদ্ধ হয় ১৯৩২-এর ১৪ নভেম্বরের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে। এটিও নিষিদ্ধ হয় ১৯৩১-এর প্রেস আইনের ১৯ ধারায়। 'পথের গান' বইটিও লেখক মুকুন্দদাস নিজেই বরিশাল থেকে প্রকাশ করেন।

১৯৪৭-এর ১৪ ডিসেম্বর ভারত বিভক্ত ও স্বাধীন হলে ১৯৪৮-এর ৫ এপ্রিল তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে এই দুটি বই-এর 'বাজেয়াপ্ত আদেশ' প্রত্যাহার করা হয়। 'মাতৃপূজা' এবং 'পথ' যাত্রাপালার কোনো কপি এখন আর পাওয়া যায় না। 'মাতৃপূজা' প্রকাশের আগেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং পুলিশ এর সমুদয় কপি (হাতে লেখা) নষ্ট করে ফেলে। 'পথ' পালাটি ছাপার পর বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে জানা গেলেও এর কোনো কপি পাওয়া যায় না। তবে 'পথ' পালাটির একটি কপি লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে গবেষকের মন্তব্য: 'পথ' নাটকটির কোনো কপি এদেশে পাওয়া না গেলেও একটি বই সযত্নে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত আছে। বইটির প্রচ্ছদের প্রথম পাতায় লেখা আছে 'প্রসক্রাইবড পাবলিকেশন। বেঙ্গল কোয়ার্টার্ল লিস্ট, ১৯৩১। পি বি বেন বি ৪১। (পিবি= প্রসক্রাইবড পাবলিকেশন'। বেন=বেঙ্গলি) এই কথাগুলো কালো কালিতে হাতে লেখা। পরের পাতায় আছে একটি সিল। তাতে লেখা 'ইন্ডিয়া অফিস'। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতেও 'পথ' নাটকের একটি কপি আছে। এই বইটি নিষিদ্ধ করে যে গেজেট বিজ্ঞপ্তি বের হয়, তার একটি অনুলিপি কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে। তাতে দেখা যায়: 'ভারতীয় প্রেস (জরুরি ক্ষমতা) আইনের (১৯৩১) ১৯ ধারায় বইটি নিষিদ্ধ হয়।'*(শিশির কর: ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই: পৃ. ২৩৫)* ব্রিটিশ শাসনের এই সব অত্যাচার নির্যাতন মুকুন্দদাসকে তাঁর চলার পথ থেকে পিছু হটাতে পারেনি। বরং আরও শক্তি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণকবি মুকুন্দদাস। আরও জোরালো কণ্ঠে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী গান কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন এই অকুতোভয় শিল্পী-সংগ্রামী। হয়ে উঠেছেন চারণ থেকে চারণসম্রাট মুকুন্দদাস।

এই সময় বাংলা সাহিত্যের আরও কয়েকজন নাট্যকারের বেশ কিছু নাটক ব্রিটিশ রাজরোষে পড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এই নাট্যকারদের মধ্যে আছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মনোমোহন বসু, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন গোস্বামী, মন্মথ রায় প্রমুখ। স্বদেশী যুগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে নাটক তথা নাট্যাভিনয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটক সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। একটি নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষকে যত তাড়াতাড়ি কাছে টানা যায় বা আকৃষ্ট করা যায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। ফলে শাসকদের কড়া নজর থাকে নাটকের ওপর। এইসব লেখকের যে নাটক বাজেয়াপ্ত হয়েছে তাকে সরাসরি ব্রিটিশবিরোধী বলা যায় না। এর অনেকগুলোই ঐতিহাসিক নাটক। বাঙালির স্বদেশী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্যে তার অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে সামনে আনার উদ্দেশ্যেই রচিত-অভিনীত হয়েছে এইসব নাটক।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঐতিহাসিক নাটকগুলো সে সময়ে দর্শক-শ্রোতার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তিনি একদিকে নিষ্ঠার সঙ্গে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন তেমনি ব্রিটিশ বেনিয়া শাসকদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরও বর্ণনা দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসক রুষ্ট হয়ে তার বেশ কয়েকটি নাটক নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে গিরিশচন্দ্র ঘোষের তিনটি নাটক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। নাটক তিনটি (ক) সিরাজদ্দৌলা, (খ) মীরকাসিম এবং (গ) ছত্রপতি শিবাজী।

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইতিহাসের আড়ালে কয়েকটি দেশাত্মবোধ-জাগানিয়া নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে 'তারাপদ', 'রানা প্রতাপ সিংহ', 'নূরজাহান', 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'মেবার পতন' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই নাটক প্রচারে ব্রিটিশ সরকার চুপ করে থাকেনি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন তারিখের এক সরকারি আদেশে একসঙ্গে তাঁর তিনটি নাটক অভিনয় ও প্রচার নিষিদ্ধ হয়। নাটকগুলো হল: (ক) রানা প্রতাপ সিংহ, (খ) মেবার পতন এবং (গ) দুর্গাদাস।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এইসব নাটক নিষিদ্ধকরণে ব্রিটিশ সরকার ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। নাটকগুলোকে সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহী না বলে এর বক্তব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতির আশংকার কথা বলে এগুলোকে নিষিদ্ধ করে। ব্রিটিশ সরকার এই নাটক তিনটিকে নিষিদ্ধ করার যুক্তি হিসাবে আদেশে উল্লেখ করে:

'The plays are not seditions but tend to promote hatred between Hindus and Muhammadan and fall within Sec. 153, Indian Penal Code and Degrades have been written be D.L. Roy, Deputy Magistrate and it is a improbable that he intended by these writting to put class against class. It will probably be sufficient to tell the author to withdraw the book from circulation and direct the police to prohibit the performance of the play in Bengal and East Bengal Districts.'

এই আদেশে এইসব নাটকে যে অতীত ঐতিহ্য সন্ধান এবং স্বাজাত্যবোধের কথা উচ্চারিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসন সে বিষয়টি একেবারেই আড়ালে রেখেছে। এতে একদিকে নাটক নিষিদ্ধ হল অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বন্ধনে চিড় ধরাতেও সহায়ক হল।

দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করতে নাটক ও নাট্যশালাকে অবলম্বন করে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)। অধ্যাপনা ছেড়ে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন এই কৃতী নাট্যকার। তাঁর ইতিহাসভিত্তিক নাটকের মধ্যে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭), 'নন্দকুমার' (১৯০৮), 'পদ্মিনী' (১৯০৬), 'বাঙ্গলার মসনদ' (১৯১০) ইত্যাদি তার দেশপ্রেমের গভীরতারই স্বাক্ষর। এছাড়া তিনি ইংরেজ শাসনে অর্থনৈতিক দুর্দশার ওপর ভিত্তি করে 'দাদা ও দিদি' (১৯০৮) নাটক লেখেন।

ব্রিটিশ সরকার দাদা ও দিদি নাটকটি প্রকাশনা, মুদ্রণ ও অভিনয় বন্ধ করে দেয়। এই সময় ব্রিটিশ সরকার আর যেসব নাটক বাজেয়াপ্ত করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র নাটক'। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে বিদেশি শাসকের সমালোচনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২ মে তারিখের এক আদেশে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

মনোমোহন বসুর 'সমাজ' নাটকটিও রাজরোষে পড়ে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাসভিত্তিক নাটক 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ' এবং 'দুর্গাসুর' নাটক দুটিও ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট তারিখের একই আদেশে নাটক দুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইতিহাসভিত্তিক নাটক 'তারাবাঈ' ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে। এই নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদে লেখা আছে: 'তারাবাঈ' ঐতিহাসিক নাটক: মহাত্মা কারলেন টড সাহেবের প্রণীত। রাজস্থান হইতে সংগৃহীত গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা ইং ১৯১৬'। মন্মথ রায় রচিত 'কারাগার' নাটকটি রাজরোষে পড়ে।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের নোটে এই নাটক অভিনয়ে আপত্তির কথা বলা হয়। পরে এই নাটকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। 'পেলারামের স্বদেশিকতা' নামে একটি নাটক নিষিদ্ধ হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট। ১৯১০ ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আরও বেশ কিছু নাটক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।
সেগুলো হলো, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত'র 'আশা কুহকিনী', সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'হোলো কী', মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল', কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মাতৃপূজা', হারাধন রায়ের 'মীরা উদ্ধার', অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়', নিখিলকান্ত রায়ের 'সোনার বাংলা' ইত্যাদি।

রাজনীতি/প্রবন্ধ

মো. আনিসুর রহমান

.....

বাংলাদেশে বাম শক্তির ব্যর্থতা এবং করণীয়

"No social order ever disappears before all the productive forces for which there is room in it have been developed."
– Karl Marx.

"For a mass of people to be led to think coherently...is...far more important ...than the discovery of some philosophical "genius" of a truth which remains the property of small groups of intellectuals."
– Antonio Gramsci

"Reading it was an exciting experience for me. It indicates, I think, the direction in which revolutionary thought and practice must move. I was

reminded througout of nothing so much as the "Thesis on Feuerbach", the true distillation of Marxist thought."
– Paul M. Sweezy (১৯৮২ সালে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব সোসিওলজিতে দেয়া 'পার'-এর ওপর কীনোট পেপার সম্বন্ধে)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস স্মারক বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত। এই বিভাগের শহীদ শিক্ষক গিয়াসউদ্দীন আহমদ ছোটবেলা থেকেই আমার বন্ধু ছিলেন, এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর প্রাণ হাতে নিয়ে যুদ্ধে সহায়তা করবার কাহিনী আমি জানি। অন্যান্য শহীদদেরও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত অবদান স্মরণীয়। এঁদের কাছে জাতির ঋণ এবং এঁদের অকাল বিয়োগে জাতির ক্ষতি অপরিসীম। আমি এঁদের সবাইকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি, তাঁদের পরিবারবর্গের পরম দুঃখের সাথী হিসেবে তাঁদের হাত ধরছি।

মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মত্যাগ শুধু দেশের স্বাধীনতার জন্য হয়নি, একটি সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের জন্য হয়েছিল। আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে এই আদর্শ থেকে অনেক, অনেক দূরে চলে এসেছি। আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধিকার/স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল ধারাসমূহের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের প্রতিশ্রুতির পেছনেও তাদের অবদান ছিল। দেশের মূল রাজনৈতিক ধারা জোতদার-অধ্যুষিত থাকলেও দেশের তরুণ সমাজ ও আপামর জনসাধারণের মধ্যে তারাই প্রগতিশীল আকাঙ্ক্ষা আনবার কৃতিত্বের দাবিদার। তবুও স্বাধীনতার পর তাদের কোথায় ভুল হল এবং আজো হচ্ছে এবং তারা কী করতে পারেন? এই প্রশ্নের আলোচনাই আমার এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

স্বাধীনতার পর দেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাজাত প্রগতিশীল গণ-উদ্যোগ, এবং বাম ধারাসমূহের অবস্থান

অ-প্রথাগত গেরিলাযুদ্ধ-ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধ, যে যুদ্ধে সামরিক বাহিনী সহ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছাত্র-যুব সমাজ ও সাধারণ জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে কঠিন কষ্ট ভাগ করে নিয়ে যুদ্ধ করেছিল, দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি ছাড়িয়ে বাস্তব সম্ভাবনায় এগিয়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর দেশের অনেক স্থানে তরুণ সমাজ, ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায়, এমন-কি কিছু সরকারি আমলাও সাধারণ জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নানান রকম যৌথ উদ্যোগ-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে নেমে গিয়েছিল, সেনাবাহিনীরও কিছু অংশ লাঙ্গল ধরেছিল– যেরকম কাজ সমাজতান্ত্রিক চেতনার মধ্যেই পড়ে বলেই আমার ধারণা। এ-ধরনের অনেক কাজের

বিবরণ *যে আগুন জ্বলেছিল* বইতে (রহমান ১৯৯৭) সংকলিত আছে যে বইটি এই বিভাগেরই 'জনইতিহাস চর্চা কেন্দ্র' একটি সেমিনার করে লঞ্চ করেছিল। অসংখ্য উদ্যোগের মধ্যে কয়েকটি উদ্যোগ ছিল: গুরুদাসপুরের 'গণমিলন' যেখানে বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের সমবায়-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক অর্থনৈতিক ও গণশিক্ষার উদ্যোগ নেয়া হয়; ঠাকুরগাঁর কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামে শুরু হওয়া 'টিপ্ গণ ছি ছি' শ্লোগানধর্মী গণশিক্ষা আন্দোলন যেটি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামেও ছড়াতে শুরু করেছিল; বগুড়ার তিতুমীর হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের লেখাপড়ার খরচ নিজেরা হোস্টেলের প্রাঙ্গণে চাষ-আবাদ ও অন্যান্য আয়-বহনকারী কর্মকাণ্ড করে তুলে অভিভাবকদের অর্থসাহায্যের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিয়ে হোস্টেলটি 'মুক্ত হোস্টেল' ঘোষণা করা; আর রংপুর জিলার ষাটটি গ্রামের 'স্বনির্ভর আন্দোলন' যে আন্দোলন বাইরের সবরকম সাহায্য নেবার বিরুদ্ধে শপথ নিয়ে গ্রাম-উন্নয়নের কাজে নেমে গিয়েছিল এবং যার চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের লঙ্গরখানা-বিরোধী ও দান-খয়রাত বিরোধী অসাধারণ মোকাবিলা (রহমান ১৯৯৭: ১০৭-১৩০) মাও জে দং-কে নিশ্চয় খুশি করত। এসমস্ত উদ্যোগ ছাড়া একটি প্রগতিশীল এন,জি,ও – 'নিজেরা করি' – বিভিন্ন স্থানে বঞ্চিত মানুষদের তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য যোগযুক্ত করতে নেমে যায় যার কাজের মূল মন্ত্র ছিল মার্কসবাদের সঙ্গে পাওলো ফ্রেইরির 'কনশিয়েন্টাইজেশন'।

কিন্তু এ-ধরনের কোনো উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক বাম মহল ফর্মালি শরীক হয়নি। কিছু বাম শক্তি শেখ মুজিবকে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দিয়ে যায়; কিছু শক্তি সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে 'বিপ্লব'-এর প্রচেষ্টা চালায়। মুজিব হত্যার পর একটি জনবিচ্ছিন্ন 'বাম' শক্তি 'সিপাই বিদ্রোহের' মাধ্যমে এবং শেষ পর্যন্ত এক দক্ষিণপন্থী সামরিক জেনারেলের হাতেই নেতৃত্ব তুলে দিয়ে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের' হাস্যকর চেষ্টা করে। এর অনেক খেসারতের মধ্যে গণমিলন ও রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলনও সামরিক বাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং নতুন সরকার গুছিয়ে বসলে আর মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা হতাশায় স্তিমিত হতে থাকলে অন্যান্য গণউদ্যোগধর্মী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলোও আস্তে আস্তে নিভে যায়।

মনে হয় দেশের প্রতিষ্ঠিত বাম ধারাগুলো এদেশে একটা বিরাট তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে-যে একটি নতুন স্বতঃস্ফূর্ত অত্যন্ত প্রগতিশীল চেতনা ও স্পৃহা দেশের মাটি থেকেই বাস্তব উদ্যোগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল তার তাৎপর্য তেমন যত্ন সহকারে বিশ্লেষণ করেনি। সমাজতন্ত্রের বইতে উৎপাদন-সম্পদের মালিকানার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন হবে– এই তত্ত্ব রয়েছে বিধায় এদেশের বাম মহলের মনে এই ধারণা বোধ হয় বদ্ধমূল হয়েছিল যে সমাজ পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হতেই হবে সম্পদের মালিকানার পুনর্বণ্টন। বলা বাহুল্য এতে তৎকালীন জোতদার সরকার অবশ্যই রাজি ছিল না, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি যাই থাকুক না কেন। কিন্তু এদেশে

বৈষম্য-বিরোধী চেতনা নিয়ে দীর্ঘকালীন স্বাধিকার সংগ্রাম, নেতৃত্বের কাছ থেকে সমাজতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি এবং সমাজে সব শ্রেণীর মানুষ এক ট্রেঞ্চে শুয়ে-বসে মুক্তিযুদ্ধ করা এমন একটা বস্তুগত ও চেতনাগত অবস্থার দিকে দেশকে এগিয়ে দিয়েছিল যে তখন তখনি আইনগতভাবে সম্পদের মালিকানা স্পর্শ না করেও দেশে যৌথ সৃষ্টিশীলতাধর্মী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল মূল্যবোধধর্মী উদ্যোগের জন্য অনুকূল একটা সময় এসে গিয়েছিল। এমনকি, এরকম উদ্যোগের ফসলও সব ক্ষেত্রে চিরাচরিত হারে উৎপাদন-সম্পদের মালিকদের ঘরে উঠে যাচ্ছিল না – এই ফসলের ওপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম-বেশি গণ-অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছিল। এরকম উদ্যোগ চলতে থাকলে এবং দেশব্যাপী বিস্তৃত হলে, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ক'রে অনুপ্রাণিত তরুণ ও ছাত্রসমাজ এরকম উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে গেলে এদের ফসলের ওপর গণ-অধিকারের চেতনা আরো বিস্তৃত হবার সম্ভাবনা ছিল। উপরিকাঠামোতে জোতদার সরকারের রাজত্ব থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের চরিত্র, প্রতিশ্রুতি এবং তদ্‌জাত প্রেরণার জন্য এই উপরিকাঠামোর শক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল বিধায় দেশে নতুন প্রগতিশীল পথে উৎপাদন শক্তির বিকাশ শুরু হয়ে গিয়েছিল যার গতি উপরিকাঠামোর পক্ষে রোধ করা সম্ভব ছিল না।

এভাবে সমাজে নবজাগ্রত প্রগতিশীল মূল্যবোধকে মাঠ-পর্যায়ে বাস্তব আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করবার কাজে দেশব্যাপী জোয়ার আনবার লক্ষ্যে এবং এরকম কাজের প্রত্যয়গত ও ব্যবস্থাপনাগত মান উন্নত করবার লক্ষ্যে দেশের প্রগতিশীল মহল যদি এগিয়ে আসত, তাহলে শুধু কথায় বা আন্ডারগ্রাউন্ড তৎপরতায় নয়, বাস্তব সমাজ-জীবনে প্রগতিশীল মূল্যবোধধারী সক্রিয় শক্তির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বন্দ্ব তীব্রতর হতে থাকত যাতে সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনা বাড়ত বলেই সাজেস্ট করা যায়। কিন্তু এভাবে এরকম একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এসে সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাজ-প্রগতির আরো অনুকূলে আনবার যে ঐতিহাসিক সুযোগ দিয়েছিল তাকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রগতিশীল/বিপ্লবী মহল কব্জা করতে চেষ্টা করেনি।

শেষ পর্যন্ত চরম দক্ষিণপন্থীর হাতে শেখ মুজিব হত্যার পর কয়েক বছর প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে সমাজ অনেকখানি পিছিয়ে পড়ল, দেশে বৈষম্যও আকাশের দিকে হাত বাড়াল। মুক্তিযুদ্ধের পরপর যে জনগণ নিজেদের দরিদ্র জ্ঞান না ক'রে যার যা ছিল তাই নিয়েই দেশ গড়বার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এবং পড়তে প্রস্তুত ছিল তাদেরকে বলা হল তারা 'দরিদ্র্য এবং তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা হচ্ছে। একথা শুনে শুনে জনগণ তাদের এই পরিচয়টাই আত্মস্থ করল, দারিদ্র্য-রেখার ওপারে – যে দারিদ্র্য-প্রত্যয়কে আমি একটি গবাদি-পশু-প্রত্যয় বলে আসছি (রহমান ২০০৪) – বসে পড়ল কবে প্রসাদ পেয়ে এপারে আসতে পারে সেই প্রত্যাশায়। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের যে মানুষ বলেনি 'আমরা গরিব' তাদের শেখান হল তারা গরিব।

বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্রের (আপাত) পরাজয়

এরপর এল বিশ্বমঞ্চেই সমাজতন্ত্রের পরাজয়। তা-ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো রায়–এ নয় সমাজতন্ত্র"। পোল্যান্ডে জাতীয় শ্রমিক সংগঠনই কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল – এ কী রহস্য!

রাশিয়ার চিঠি-তে রবীন্দ্রনাথ সে দেশ ঘুরে এসে ইন্‌টুইটিভ্‌লি বলেছিলেন যে এই 'ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব' টিঁকতে পারে না । কিন্তু বাংলাদেশের বাম ধারাসমূহ বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনের কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আজো জনগণকে দিয়েছে বলে আমার জানা নেই, এই বিশ্লেষণ ক'রে আত্মসমালোচনা ক'রে বাম শক্তির বর্তমান সময়ে অবস্থান দায়িত্ব ও কৌশল নতুন ক'রে চিন্তা ক'রেও জনগণকে মনে হয় জানায়নি (সাম্প্রতিক একটি ব্যতিক্রমী লেখা: আকাশ ২০০৯)। বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভুলটা কোথায় হয়েছে যার জন্য তার এমন শোচনীয়ভাবে, সমাজের ভেতরের আন্তঃর্দ্বন্দ্বেই, পরাজয় হল তার বিশ্লেষণ করে বিপ্লবী তত্ত্বকে নতুন করে ঢেলে জনগণের কাছে নির্ভরযোগ্য করে পেশ করতে না পারলে জনগণই-বা তাদের পেছনে দাঁড়াবে কেন।

ভ্যানগার্ড পার্টি তত্ত্ব, 'পার' এবং গ্রামসি

আমি অন্যত্র বিশ্লেষণ করেছি যে (রহমান ১৯৮৯) বিশ্বে আনুষ্ঠানিক সমাজতন্ত্রের পতনের মূলে লেনিনের 'ভ্যানগার্ড-পার্টি' তত্ত্বের দায়িত্ব রয়েছে। মার্কস চেয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর নিজের উদ্যোগে বিপ্লব হবে, কিন্তু তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন এটা অত সহজ নয়। সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীও অনেক সময়েই অ-বিপ্লবী ট্রেড্ ইউনিয়নিজমের দিকে ঝুঁকে যায়। আর শ্রমিক-কৃষকদের শুধু নিজেদের চেষ্টায় দেশব্যাপী সংগঠন ক'রে বিপ্লবের প্রচেষ্টা করা সময় ও সম্পদের দিক দিয়েও কঠিন, এজন্যও প্রগতিশীল মধ্যবিত্তদের সহায়তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু লেনিন এই বিবেচনাটাকে ঘুরিয়ে একটা 'ভ্যানগার্ড'-তত্ত্ব দিয়ে দিলেন যে 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবীরাই এসব ব্যাপার বেশি বোঝে, তাই তারাই শ্রমিকদের শিখিয়ে-পড়িয়ে বুদ্ধিগত পর্যায়ে 'ওপরে' তুলবেন, তারা নিজেরা শ্রমিকদের বুদ্ধিগত পর্যায়ে নামবেন না (লেনিন ১৯১৮:২০৫)। এর ফলে বাম শক্তিবর্গ শ্রমিকশ্রেণীকে যা শেখাতে থাকল তা কতগুলো বাঁধা বুলি যা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সম্মানজনক নয় এবং সমাজে একটি বুদ্ধিগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

আমি এ-ও বলেছি যে, প্রথমত, কেউই সব কিছু অপরের চাইতে বেশি বোঝে না, কোনো বিষয় বেশি বোঝে, কোনো বিষয় কম। দ্বিতীয়ত, সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের মতো একটা 'জ্ঞান-সম্পর্ক'ও রয়েছে, যেখানে 'জ্ঞানের মালিকানা'র বণ্টনও অত্যন্ত অসম, এবং এই মালিকানার জোরে একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সাধারণ জনগণের

ওপর প্রভুত্ব করে যে প্রভুত্ব শুধু উৎপাদন সম্পর্কে বিপ্লব হলেও থেকে যায় এবং বাড়তেও থাকে যদি এ সম্বন্ধে সচেতনতা ও এ ব্যাপারে সমতা আনবার প্রক্রিয়া না থাকে। এরকম ঈপ্সিত প্রক্রিয়াকে পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ ('পার') বলা হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় শোষিত শ্রেণীকেও তাদের নিজেদের গবেষণা করতে আহবান করা হয় (রহমান ১৯৮২)। লাতিন আমেরিকায় আমার বন্ধু সহকর্মী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী-একটিভিস্ট 'লোকালি ইনস্পায়ার্ড সমাজতন্ত্রের' – 'দেশজ প্রেরণাজাত সমাজতন্ত্র' – স্বপ্নদ্রষ্টা পরলোকগত অরল্যান্দো ফালস বর্দার নেতৃত্ব ও অনুপ্রেরণায় ওই মহাদেশের কয়েকটি দেশে – বিশেষ ক'রে কলম্বিয়া, মেক্সিকো ও নিকারাগুয়ায় – 'পার' সমৃদ্ধি লাভ করেছে (ফালস্ বর্দা ১৯৮৮)। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় মার্ক্সিস্ট বুদ্ধিজীবী মান্থলি রিভ্যু পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক পরলোকগত পল সুইজিও জ্ঞান-সম্পর্কের এই তত্ত্ব এবং পার-এর প্রত্যয়কে স্বাগত জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধকারকে লিখেছিলেন (প্রবন্ধের শুরুতে তৃতীয় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)।

১৯৭০ দশকের শেষ দিক থেকে বিশ্বের নানা দেশে তৃণমূল কাজে 'পার' পদ্ধতির প্রয়োগ হতে থাকে (রহমান ২০০৮)। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতন বিশ্বকে এক মেরুর অধীনে নিয়ে আসে এবং বিশ্বব্যাপী বামধারা দিশাহারা হয়ে যায়। আমার নিজের বিশ্লেষণে 'ডিকটেটরশিপ অব দি প্রোলেতারিয়েতর' নামে বুদ্ধিজীবী ও আমলাদের একনায়কত্ব পূর্ব ইউরোপে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ। আর চীনে মাও জে দং-এর মৃত্যুর পর পরই যে 'বিড়ালের রং' বদলে গেল তার কারণ অনুসন্ধানে 'লিট্‌ল্ রেড বুক্'-কে *পিপলস্ থট্* না বলে *মাও জে দং-এর থট্* বলবার গভীর তাৎপর্য চিন্তা করবার মতো – মাও চলে গেলে পিপল্ তো তাই বসে থাকল এবার কার থট্ অনুসরণ করবে এই প্রশ্ন নিয়ে। [আমার সমাজতন্ত্রের পতনের এই বিশ্লেষণের সঙ্গেও পল সুইজি এবং তাঁর মান্থলি রিভ্যু-এর সহযোগীরা একমত পোষণ করেছিলেন (রহমান ২০০৭: ২৪৮)]। আর আমি নিজে বার্লিন দেয়ালের পতনের পর পরই হাঙ্গেরির একটি গ্রামে একটি 'পার' প্রজেক্ট পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেছিলাম সেখানে মানুষদের কোনো কিছু আলোচনা করবার জন্য একত্র করা কী ভীষণ কঠিন হয়ে গিয়েছিল – তারা ওপর থেকে খবরদারিতে এতকাল এমনই আতঙ্কিত জীবন যাপন করছিল যে তাদের দেশে 'সমাজতন্ত্র' আসবার আগে তাদের যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল তা-ও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এমনই সেখানকার এতদিনকার 'সমাজতন্ত্র' তথা 'কম্যুনিজম'-এর মহিমা!

'পার'-এর মূল দর্শন – প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞান-বুদ্ধি আছে এবং তা অনুশীলনে আরো বিকশিত হতে পারে – গ্রামসির দর্শনের সঙ্গে একাত্ম (এই প্রবন্ধের শুরুতে দ্বিতীয় উদ্ধৃতি দেখুন)। বিশ্বের অনেক বাম মহলকে আজকে গ্রামসির চিন্তা প্রভাবান্বিত করছে। তবে গ্রামসি জনগণের মধ্যে অগ্রসর চিন্তাধারী 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়ালের' নেতৃত্ব চেয়েছেন, যাদের তিনি জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত একটি

নতুন ধরনের *এলিট* ইনটেলেকচুয়াল শ্রেণী আখ্যায়িত করেছেন (গ্রামসি ১৯৭১: ৩৪০)। 'পার' শোষিত জনগণের সবাইকে যৌথভাবে আর্থ-সামাজিক-গবেষণা করতে আহবান করছে এবং তাদের যৌথ চিন্তাকে ও যৌথ নেতৃত্বকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, এবং শোষিতদের কালেক্টিভের কাছে তাদের নিজেদের নেতৃত্বেরও জবাবদিহিতা চাচ্ছে। (মার্কসের "রাষ্ট্রের বিলুপ্তি" প্রত্যয়ও সরাসরি জনগণের কালেক্টিভের 'ফ্রি এসোসিয়েশন' চেয়েছে)। বাস্তবে 'পার'-প্রক্রিয়া থেকেই অনেক স্থানে 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল' গড়ে ওঠে, এবং অনেক স্থানে এরকম কোনো ব্যক্তির একক নেতৃত্ব এসে পড়ে যা দীর্ঘস্থায়ীও হয়ে যেতে পারে। এরকম একক নেতৃত্ব সব সময় কালেক্টিভের স্বার্থে কাজ না-ও করতে পারে, এবং শোষক শ্রেণীকেও সহজতর সুযোগ দিতে পারে তাকে বিপথে নেবার। এইজন্য 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল'দেরও জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন (রহমান ২০০০: ১১৫)। ভারতের মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত 'ভূমিসেনা' আন্দোলনে নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যে এরকমই সম্পর্কের বিবরণ প'ড়ে (ডি সিল্‌ভা ও অন্যান্য ১৯৭৯) অরল্যান্দো ফালস্ বর্দা এই আন্দোলনেই 'পার'-এর মূল নীতিগুলো প্রকাশ পেয়েছে বলে বিচার করেন (ফালস্ বর্দা ২০০১:২৭)। ভূমিগেণার নেতা কালুরাম – একজন অসাধারণ 'অর্গানিক ইনটেলেকচুয়াল' – আমাকে বলেছিলেন 'আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে যখন জঙ্গলপট্টির মানুষরা উঠে দাঁড়াবে, তখন আমাকে আর প্রয়োজন হবে না, আমি ওদের একজন হয়ে ওদের মধ্যে মিশে যাব'।

এদেশে ২০০২ সাল থেকে দারিদ্র্য-গবেষণা-সাপোর্ট সংস্থা রিইব (রিসার্চ ইনিয়েটিভ্‌স বাংলাদেশ) - এর উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে 'পার' প্রক্রিয়া শুরু হয় যে-প্রক্রিয়াকে সরাসরি 'গণগবেষণা' বলা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের নানা স্থানে 'রিইব' ও রিইব-এর হাত ধরে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'-এর উদ্যোগে পিছিয়ে-থাকা মানুষদের গণগবেষণা চল্‌ছে। এর ফলে দেশের নানা স্থানে বহু পিছিয়ে থাকা মানুষ – মূল ধারায় শুধু নয়, দেশের বেশ কিছু অন্ত্যজ গোষ্ঠীদের মধ্যেও – নিজেদের সংগঠন বা সলিডারিটি গ্রুপ সৃষ্টি ক'রে অন্যায়-অবিচার-অস্পৃশ্যতা, নারী-নির্যাতন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং আর্থসামাজিক-শিক্ষাগত উদ্যোগ নিয়ে সমাজে তাদের স্থান আগের চেয়ে উন্নত করছে। উদাহরণস্বরূপ কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে অন্ত্যজ সম্প্রদায়দের মধ্যে গণগবেষণা ক'রে লক্ষণীয় জাগরণ; নীলফামারির মঙ্গা-পীড়িত অঞ্চলের কৃষকদের গণগবেষণার মধ্য দিয়ে একত্র হয়ে লাক্ষা ও ব্রি-৩৩ চাষ ক'রে মঙ্গা থেকে মুক্ত হওয়া (*দি ডেইলি স্টার* ২০০৯), কুয়াকাটায় সাড়ে তিনশ'র ওপরে গণগবেষক মৎস্যজীবীদের দু'টি সমবায় সমিতি ক'রে নিজেদের মাছ বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করে 'রাখি বিজনেস' শুরু করা ('উদ্বৃত্ত নিজেরা রাখি', যা মার্কসকে নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দ দিত), আড়তদার-দাদনদারদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, এবং সার্বিকভাবে গণগবেষণায় অংশগ্রহণকারী মৎস্যজীবীদের মধ্যে আত্মজাগরণ যা স্থানীয় জনগণকে ও

পর্যবেক্ষণকারীদের বিস্মিত করেছে (খান ২০০৯); কোলকোন্দ ইউনিয়নে চার গ্রামের গণসংগঠনের সমন্বয়ে সমবায় কনজুমার স্টোর ক'রে আর এক ধরনের 'রাখি বিজনেস'; মুক্তিনগর ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ সহ বিভিন্নরকম নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী গণগবেষকদের সংগঠিত আন্দোলন (মাহমুদ ২০০৭:৬৮) ইত্যাদি শত শত গণগবেষণাজাত গণউদ্যোগ[১] ।

সব জায়গায় গণগবেষণা আশানুরূপ কাজ করছে সেরকম কোনো দাবি নেই – অনেক স্থানেরই এরকম কাজের আরো অনেক উন্নতি হতে পারে যেজন্য প্রগতিশীল ও যোগ্য এনিমেটর/সহায়ক কর্মীর প্রয়োজন । তবে গণগবেষণা হচ্ছে এরকম সব স্থানেই তারাও যে 'গবেষণা' করতে পারে এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরিচয়টিও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিশেষ আত্মগর্ব ও মানসিক শক্তি দিচ্ছে ।

অন্যদিকে জনগণের নিজস্ব চিন্তাকে শ্রদ্ধা করা, এবং এই চিন্তাকে আরো অগ্রসর হতে সাহায্য করা যা 'পার'-এর উদ্দেশ্য, তার কোনো পরিচয় এদেশের আনুষ্ঠানিক বাম মহলের কথায়-কাজে বোধ হয় তেমন প্রতিফলিত হয়নি । তাঁরা যেন জনগণকে ঘেরাও-বন্ধ ইত্যাদির জন্য মবিলাইজ করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করেন । আর 'সর্বহারা' কথাটি যা তাদের অনেকেই ব্যবহার করেন । এটি তো বঞ্চিত মানুষদের বুদ্ধি-ক্ষমতার ওপর একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নয় এবং তাদের আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা-বোধের জন্য পরম ক্ষতিকর – এই সম্বোধন এই শ্রেণীর মুক্তির জন্য অন্য কোনো শ্রেণীর ওপর নির্ভর ক'রে থাকতেই আহ্বান করে না কি? (মার্কস 'প্রলেটারিয়েট কথাটি ব্যবহার করেছেন এলিয়েনেটেড্ প্রডাক্টিভ্ ফোর্স অর্থে যার বর্তমানে শুধু শ্রমক্ষমতা আছে কিন্তু যে ক্ষমতায় আসলে তার নিজের ইতিহাস নিজেই রচনা করতে পারবে ।)

সাম্প্রতিক কালের স্বতঃস্ফূর্ত গণগবেষণা ও গণ-প্রাকসিস্

অবশ্য 'পার' হল বাইরে থেকে কোনো মহলের প্রচেষ্টা, বঞ্চিত শ্রেণীদের নিজস্ব যৌথ গবেষণা ও তদ্‌জাত কর্মকাণ্ড প্রণোদিত করবার জন্য । অন্যদিকে দেশের বহু স্থানে বঞ্চিত মানুষরা নিজেরাই একত্রে নিয়মিত আলোচনা-বৈঠক ক'রে নিজেদের জীবন এগিয়ে নেবার জন্য নানারকম সৃষ্টিশীল যৌথ উদ্যোগ নিয়ে চলেছে যাকে স্বতঃস্ফূর্ত গণগবেষণা ও গণ-প্রাকসিস্ (একত্রে আলোচনা, কাজ ও কাজের বিশ্লেষণ) বলা যায় । এরকম উদ্যোগের পেছনে কোনো এক বা একাধিক স্থানীয় ব্যক্তির অগ্রণী ভূমিকা থাকতে পারে, তবে সবাই মিলে আলোচনা ('গবেষণা') করেই উদ্যোগগুলো নেয়া এবং তাদের তত্ত্বাবধান করা হয় । সম্প্রতি রিব-এর উদ্যোগে দেশের ৭০ জনের মতো সাংবাদিককে দিয়ে সমস্ত দেশময় বঞ্চিত মানুষের নিজেদের জীবন নিজেদের চেষ্টায় এগিয়ে নেবার বিভিন্ন উদ্যোগের সন্ধান করা হয় যা থেকে অত্যন্ত অনুপ্রেরণাময় কিছু গণউদ্যোগ চিহ্নিত হয় (তাহমিনা ও অন্যান্য ২০০৮) । লক্ষণীয় যে এসমস্ত উদ্যোগ

মুক্তিযুদ্ধজাত অনুপ্রেরণা থেকে নয় – পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরই এদের জন্ম। উদাহরণস্বরূপ, আশির দশকে ঝিনাইদহে কালিগঞ্জ উপজেলার মহেশ্বরচান্দা গ্রামের কৃষকরা ও তরুণরা তাদের গ্রামে একটা বড়ো রকমের ভূমি সংস্কারই ক'রে ফেলেছে যা প্রায় অবিশ্বাস্যই – তারা সর্বোচ্চ ফলনের জন্য গ্রামে জমি স্বেচ্ছায় পুনর্বণ্টন করে, আইল উঠিয়ে দেয় এবং আধুনিক পদ্ধতিতে যৌথ চাষ ক'রে গ্রামে 'কৃষি বিপ্লব' করে, তা ছাড়া আরো অনেক খাতে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে গ্রামে একটা অত্যন্ত প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক 'বিপ্লব'ই ঘটিয়ে ফেলে। কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ ইউনিয়নে তিনটি উপজেলায় সাতটি গ্রামের ৩৫০টির মতো চাষি তাদের বর্ষায় পানিতে-ডোবা ধানী জমি একত্র ক'রে 'নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচান' এই শ্লোগান দিয়ে যৌথ মাছ চাষ ক'রে আর একটি বড়ো ঘটনা ঘটিয়েছে। নিজেদের শিক্ষা উন্নত করবার জন্য ডিহি ইউনিয়নের সর্ষা উপজেলার অল্প আয়ের ক্ষেতমজুররা নিজেরা চার আনা-আট আনা ক'রে চাঁদা দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরি করেছে যেটা শুধু বই পড়বারই জায়গা নয়, এই অভিনব লাইব্রেরি বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, স্বাস্থ্যচর্যা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেবারও ব্যবস্থা ক'রে লাইব্রেরির সংজ্ঞাকেই বদলে দিয়েছে। শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যা বাড়াবার জন্য নয়, সার্বিক জীবনের এবং গণ-উৎপাদন শক্তির বাস্তব উন্নতির জন্য শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এই সংজ্ঞাকে পুনর্নির্মাণ ক'রে, এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এরা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী-সচেতনতা থেকে ধনী লোকদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয় না তারা দিতে চাইলেও । যৌথ উদ্যোগে পাঠাগারের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। গাইবান্ধার সাহাপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের ব্যতিক্রমধর্মী নেতৃত্বে ইউনিয়নের মানুষরা বিশেষ ক'রে তরুণরা অনেক রকমের আর্থ-সামাজিক যৌথ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে বেশ কয়েক বছর ধরে । দেশের বহু স্থানে অত্যন্ত নিম্ন আয়ের মানুষরা নিজেদের গ্রুপ সঞ্চয় ও ঋণ ফান্ড চালু করেছে– সারা দেশে এরকম হাজার হাজার গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে – এরকম ফান্ড তারা নিজেরাই ম্যানেজও করছে যার মধ্যে এনজিও-দের মতো শোষণমূলক ঋণ নেই এবং ঋণের ফসল গ্রুপের সদস্যরাই পাচ্ছে। জামালপুরে শহরের উপকণ্ঠে ছয়টি গ্রামে এবং সংলগ্ন এলাকায় দুঃস্থ নারীরা উন্নত চুলা তৈরির প্রযুক্তি শিখে নিয়ে ৭০টি মহিলা সমিতি গঠন করেছেন এবং এর দৃষ্টান্তে ২০ টি পুরুষ সমিতিও গঠন হয়েছে, যারা উন্নত চুলা প্রযুক্তি ছড়ানো ছাড়াও নিজেদের সঞ্চয় ফান্ডও গঠন ও ম্যানেজ করছেন। অনেক স্থানেই নিম্নবিত্ত অভিভাবকরা সমবায়-সমিতি ক'রে নিজেদের সন্তানদের জন্য স্কুল ক'রে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করছেন।

এরকম বহু স্বতঃস্ফূর্ত গণ-উদ্যোগ ও গণপ্রাকসিস্ থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশে সামরিক শাসন আসবার পর তৃণমূলে গঠনমূলক গণউদ্যোগ কিছুকাল পিছিয়ে গেলেও বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে কিছু কিছু অংশ নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নেবার জন্য আবার নানারকম যৌথ আর্থসামাজিক উদ্যোগ নেয়া শুরু করেছে – "পুরনো সমাজব্যবস্থারই

গর্ভে" যা মার্কসকে নিশ্চয়ই আনন্দ দিত – , এবং এই অর্থে এসব স্থানে উৎপাদন-শক্তি প্রগতিশীল পথে এগুচ্ছে।

একটি সংস্থা – 'নিজেরা করি' যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি– স্বাধীনতার পর থেকেই বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গে প্রগতিশীল কাজ শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই সংস্থার ছত্রছায়ায় আজকে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় সাড়ে বারো হাজার সমিতির সদস্যদের সম্পদ ও সেবার অধিকার আদায়ে উন্নতি হচ্ছে, এবং তারা নিজেরাও বহু জায়গায় যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগ – যৌথ ধান মাছ হাঁস-মুরগি চাষ, শ্যালো পাম্প ও ক্র্যাসার মেশিন স্থাপন, তাঁত বোনার কারখানা, ছোট ব্যবসা, এবং নিজেদের গ্রুপ সঞ্চয় ফান্ড সৃষ্টি ও পরিচালনা – নিয়ে চলেছে, এবং এতে তাদের লক্ষণীয় আর্থ-সামাজিক উন্নতি হচ্ছে (বরকত ২০০৮: ৩৬১-৩৬৬)। বলা বাহুল্য 'নিজেরা করি'র কাজেও স্বতঃস্ফূর্ত গণগবেষণা তথা গণ-প্রাকসিস্ প্রক্রিয়া বিদ্যমান।

করণীয় কী

এরকম অবস্থায় দেশের প্রগতিশীল তথা বাম মহলের করণীয় কী? আমি চারটি ব্যাপারে বিশেষ জোর দেব:

১. মনের দরজা-জানালা খুলে দেয়া

গত বছরের এপ্রিল মাসে আমি বাম মহলেরই আমন্ত্রণে তাদের ফোরামে *আমাদের খাদ্য সংকট মোকাবিলার পথ* - শীর্ষক একটি বক্তৃতা দিই যাতে এদেশের গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের এবং বর্তমান সময়েরও কয়েকটি অত্যন্ত সৃষ্টিশীল উদ্যোগের কথা এবং তার থেকে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা নেবার কথা বলি। সভায় প্রায় দুশো জন তরুণ বাম ক্যাডার ছিল। আমার বক্তৃতা ও বাম মহলের কিছু ভারী ব্যক্তির আলোচনার শেষে আমি এই তরুণদের আহ্বান করি আমার বক্তব্য আলোচনা/সমালোচনা করতে। এতে কোনোই সাড়া না পেয়ে আমি অত্যন্ত অবাক হই – মনে হয় এরা যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা-আলোচনা করতে তেমন অভ্যস্ত নয় এবং এব্যাপারে যেন তাদের কোনোরকম উৎসাহ দেয়া হয়নি।

এদেশের প্রগতিশীল মহলের লেনিন-স্তালিনিজ্ম্-এর বাইরে অন্যান্য মার্কসীয় দার্শনিক – যেমন রোজা লুক্সেনবার্গ, গ্রামসি, ইত্যাদি, বিশেষ ক'রে রুশ বিপ্লবের পর লেনিন-স্তালিনের সঙ্গে যাদের গভীর দ্বিমত হয়েছিল তাদের চিন্তা-বিশ্লেষণ – গ্রহণ করতে হবে এমন কথা নেই কিন্তু পুনর্বিবেচনা করবার জন্য – পড়া ও তা নিয়ে ব্রেন-স্টর্মিং প্রয়োজন। হো চি মিনের মতো বাস্তব বিপ্লবী নেতা যারা মানুষের জীবনের মধ্যে থেকে বিপ্লবের কাজ করেছেন তাদের চিন্তার সঙ্গেও গভীর পরিচয় এবং তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। অতীতের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শুধু গুণ-গান নয়,

সমালোচনামূলক আলোচনাও করা অত্যন্ত প্রয়োজন আর কিছু না হলেও নিজেদের চেতনা ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা শানিত করবার জন্য; চে গুয়েভারার রুশ সমাজতন্ত্রের সমালোচনা-আলোচনা প্রয়োজন – যে সমালোচনায় তিনি এই সমাজতন্ত্রকে 'স্টটাইজ্ড্ ইমিটেশন অব বুর্জোয়া কনজুমার সোসাইটি' বলেছিলেন (*দি মান্থলি রিভ্যু* মার্চ ১৯৭৪ পৃ ৬০)। পাওলো ফ্রেইরির দর্শনও আলোচনা প্রয়োজন, যার 'শিক্ষায় ব্যাঙ্কিং' প্রত্যয় মুখস্থ মার্কসীয় বুলি শেখানোর ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আর দেশ-বিদেশে 'পার', লাতিন আমেরিকায় অরল্যান্দো ফাল্স্ বর্দার ভাষায় 'লোকালি ইন্সপায়ার্ড সোসালিজম্' আন্দোলনে এর বিন্যাস, দেশের ভিতরে সমাজের অগ্রগতির জন্য উৎপাদন-শক্তির বিকাশ-ধর্মী বিভিন্ন ধরনের কাজের তাৎপর্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা (যা আজকে ইনটারনেটেই পাওয়া যায়) ও আলোচনা প্রয়োজন।

২. বাস্তব জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সঙ্গদান ও প্রাকসিস্

দেশের নানা স্থানে বঞ্চিত মানুষদের যেসব যৌথ উদ্যোগ চল্ছে সেগুলোর সঙ্গে প্রগতিশীল শক্তিবর্গ কেন সম্পৃক্ত হবে না, এক জায়গার এরকম কাজের অভিজ্ঞতা অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে না এরকম কাজের বিস্তার ঘটাতে, এবং নিজেরাও এরকম কাজ উজ্জীবিত করতে ও তাদের সহায়তা দিতে মাঠে নামবে না? বর্তমান যুগে (আপাতত) বিশ্বমঞ্চে সমাজতন্ত্র পরাজিত, কোনো দেশে সমাজতন্ত্র আসবার অথবা আনবার প্রশ্ন বিশ্লেষণে বর্তমানে আর কোনো ছক নেই। রাশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা একথারও হয়তো ইঙ্গিত দিচ্ছে-যে প্রাক-পুঁজিবাদী দেশে 'সমাজতান্ত্রিক' বিপ্লব সেসব দেশে পুঁজিবাদে উত্তরণেরই একটা দ্রুততর সোপান হিসেবে কাজ করতে পারে, সেসব দেশকে স্থায়ী সমাজতন্ত্রে তুলতে না-ও পারতে পারে। এ অবস্থায় প্রগতিশীল শক্তিবর্গের দায়িত্ব সমাজ যেখানে আছে সেখান থেকে শোষিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজ ক'রে যাওয়া। এই কাজ সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে সমাজ পরিবর্তনের কোনো তত্ত্ব আউড়ে নয়, মানুষকে শুধু তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মিছিল-সমাবেশ-ঘেরাও-বন্ধ্ করতে নেতৃত্ব দিয়েও নয়, শোষিতদের বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে গণজীবনকে প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক ক্রিয়ায় মাধ্যমে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে যাবার কাজ। এই প্রক্রিয়ায় শোষিতদের জীবন এরকম সহায়তা ছাড়া যে গতিতে এগোবে তার চেয়ে দ্রুত এগোবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আসবে; এই প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষের সম্মিলিত শক্তিও বাড়তে থাকবে সমস্ত সমাজকে আরো প্রগতিশীল পথে নিয়ে যাবার। আর এই প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীল শক্তিবর্গের এবং শোষিত শ্রেণীর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে থাকবে সেই অভিজ্ঞতা, যদি ইতিহাস কোনোদিন সমাজে বড়ো রকমের পরিবর্তনের সম্ভাবনা এনে দেয় তাহলে সেরকম পরিবর্তনের পর নতুন সমাজ গঠনের জন্যেও তাদের অনেক বেশি দক্ষ ও প্রস্তুত করে তুলবে, যে প্রশ্নে লেনিন রুশ বিপ্লবের পর আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন যে শ্রমিক শ্রেণী নতুন সমাজ

গঠনের জন্য প্রস্তুত নয়। তাছাড়া, যদি কোনোদিন বড়ো রকমের সমাজ পরিবর্তন হয় তারপর নতুন সমাজ গঠনের চ্যালেঞ্জটি এবং এর জন্য শুধু শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের প্রশ্নেই নয়, সহায়ক শক্তি হিসেবে বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবীদেরও যোগ্যতার প্রশ্নেও প্রস্তুতির প্রশ্নটি মনে হয় এযাবৎ বাম মহলে কমই আলোচিত হয়েছে যে প্রশ্নের গুরুত্ব অপরিসীম ।

এদেশের বাম শক্তিবর্গ কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন স্থান বাদ দিয়ে শোষিতদের দৈনন্দিন জীবন উন্নয়নের সংগ্রামে তাদের হাত ধরে নেই একথা বোধ হয় জেনারেল স্টেটমেন্ট হিসেবে বলা যায়। এদেশের শীর্ষস্থানীয় বাম বুদ্ধিজীবীরাও নেই। আমাদেরই পার্শ্ববর্তী দেশের কেরালায় কয়েক যুগ ধরে 'সায়েন্স ফর সোসাল রিভল্যুশন' আন্দোলনে প্রতি বছর দেশের বুদ্ধিজীবী-বৈজ্ঞানিকগণ-ও-ছাত্র-সমাজ বড়ো ছুটিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েন সাধারণ জনগণকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবার জন্য (রহমান ১৯৮৪), এবং কেরালার প্রগতিশীল পথের ওপর দাঁড়াবার পেছনে সেখানকার বুদ্ধিজীবীদের এই অবদান নগণ্য নয়। এরকম একটি 'সায়েন্স ফর সোসাল রিভল্যুশন' কি এদেশে হতে পারে না যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শ্রদ্ধেয় প্রগতিশীল শিক্ষকবর্গ এ-ব্যাপারে উদ্যোগ নেন।

৩. গণগবেষণা

এদেশে 'গণগবেষনা' বা 'পার' নতুন শুরু হয়েছে এবং এর সার্বিক মান আরো অনেক উন্নত এবং প্রগতিশীল করা প্রয়োজন, কিন্তু শুধু এনজিও-দের হাতে থাকলে তা হবার সম্ভাবনা কম। আর এনজিও-দের হাতে গণগবেষণার মাধ্যমে তো বৃহত্তর পটে সমাজ পরিবর্তনে কোনো অবদান রাখবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দেশের শোষিতদের গণগবেষণার মতো প্রগতিশীল প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করবার কাজ কেন দু-একটা এনজিও-র হাতে ছেড়ে দেয়া হবে – একাজ কেন দেশের বাম মহল দখল ক'রে একে আরো প্রগতিশীল পথে নিয়ে যাবে না?

৪. যৌথ কর্মকাণ্ড বিস্তারের জন্য কাজ করা

"আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন – কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।" – শেখ মুজিবর রহমান, ৩০শে জুন ১৯৭২-এ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ।

এদেশে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কারের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলা ও লেখা হচ্ছে। দেশে বাজারের অগ্রগতির জন্য এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক হবার জন্য অনেকে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বলেই আখ্যায়িত করেন, কিন্তু এদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, আজো 'মালিক'দের সঙ্গে বঞ্চিত মানুষদের অধিকাংশের পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক– জমি-জলা-বাজার-প্রযুক্তি-তথ্যের তথা

তাদের সামগ্রিক জীবনের ওপর কন্ট্রোল– বিদ্যমান, এবং দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের নামে সুস্পষ্ট পরিবারতন্ত্রের অধীনে এই 'মালিক'দেরই আধিপত্য একটি 'আধা সামন্তবাদী' সমাজের পরিচয় ধারণ করে। এরকম অবস্থা থেকে সমাজের অগ্রগতির জন্য বড়ো রকমের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক সংস্কার প্রয়োজন যে সংস্কারে ভূমি-জলা পুনর্বণ্টন যতখানি সম্ভব তা সহ সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের আর্থ-সামাজিক সলিডারিটি গ্রুপের আওতায় আনা প্রয়োজন পারস্পরিক সাপোর্ট এবং যৌথ কর্মকাণ্ড নেবার জন্য যাতে তাদের জীবন-সংগ্রামে কোনো 'মালিক' শ্রেণীর ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে না হয়। সমাজে এইদিকে চেতনার বিস্তারের জন্য, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এবং বঞ্চিতদের মনে এই পথের ওপর বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে ভরসা জাগাবার জন্য, তাদের বাস্তব জীবনে এরকম যৌথ কর্মকাণ্ডের বিস্তারে প্রগতিশীল শক্তিবর্গেরই প্রধান ভূমিকা নেয়া উচিত নয় কি? কেবলমাত্র এইভাবেই সমাজকে এই পথে নেবার সম্ভাবনা ও শক্তি বাড়বে, শুধু কথায় ও শ্লোগানে নয়। তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলেও নয়, তারা তাদের যা আছে তাই নিয়েই তাদের যৌথ সৃষ্টিশীলতা দিয়ে বিশ্বকে চম্‌কে দিতে পারে এবং নিজেদেরও শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিয়ে তাদের জীবনে চরিতার্থতা আনতে পারে এই আহবান দিয়ে। আসলে, এই মানুষদের 'দরিদ্র', কিংবা 'বঞ্চিত' এরকম আখ্যা না দিয়ে, যে অপরাধ আমিও ক'রে চলেছি এব্যাপারে চিন্তা না ক'রেই, আর্থ-সামাজিকভাবে 'বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত' এরকম আখ্যা দেয়াই উচিত নয় কি?

মুক্তিযুদ্ধের পর বিশেষ অনুপ্রেরণার জন্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণচাপের জন্য সুবিধাভোগী শ্রেণীরও কিছু অংশ-যে গণমানুষদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যোগ দেয় সেই সামাজিক অবস্থা আজকে নেই বিধায় আজকে 'বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত' মানুষদের আলাদা যৌথ উদ্যোগ প্রয়োজন। সম্প্রতি আবুল বরকত এদেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে কত অসংখ্য রকম যৌথ উদ্যোগ হতে পারে যা গণমানুষকে এবং সমস্ত দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার একটি বিশদ ফিরিস্তি দিয়েছেন (বরকত ২০০৯)। যা এরকম মানুষদের গণগবেষণায় বিবেচনার জন্য পেশ করা যায়। এছাড়া এরকম মানুষদের কাছে দেশের অন্যান্য স্থানের প্রগতিশীল গণউদ্যোগের সংবাদ নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং এরকম উদ্যোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন তাদের থেকে অনুপ্রেরণা ও পদ্ধতিগত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা নিতে। অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল যৌথ উদ্যোগের সংবাদও তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তাদের এপথে এগোতে উদ্বুদ্ধ করতে, চিন্তা করতে এবং পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ করতে। আজকে এসব খবরও ইন্টারনেটেই জানা যায় এবং এই বিরাট বিশ্ব-পাঠাগার আজ সকলের দোরগোড়ায়। আর্থসামাজিকভাবে বিশেষ চ্যালেঞ্জপ্রাপ্ত মানুষদের কাছে সরাসরি এই পাঠাগার নিয়ে আসবার জন্য এদেশে এখন গণগবেষণা-ভিত্তিক কমিউনিটি ই-সেন্টার মডেল-ও পাইলট পর্যায় পার হয়েছে (মাহমুদ ২০০৮) যার প্রসারে প্রগতিশীল মহলের সহযোগিতা মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর

বাংলাদেশের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের ইতিহাসও জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন তাদের নতুন ক'রে এপথে প্রেরণা দেবার জন্য। রংপুরের স্বনির্ভর আন্দোলনের এবং বিশেষ ক'রে তার দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার অসাধারণ দীপ্ত ইতিহাস যে কোনো প্রগতিশীল দেশের জন্য প্রেরণা হতে পারে। প্রতি বছর 'তেভাগা' আন্দোলনকে স্মরণ করবার মতো এদেশে এই আন্দোলনকেও স্মরণ করা প্রয়োজন। এদেশেরই মানুষ তাদের চরম বিপর্যয়ের সময়েও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত না ক'রে মাথা উঁচু রেখে যৌথভাবে কীকরে এরকম দুর্যোগের মোকাবিলা করেছে তার গৌরবময় দৃষ্টান্ত হিসেবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং বারে বারে তাদের এই আন্দোলন থেকে প্রেরণা নিতে ।

দেশের গণমানুষদের যৌথ উদ্যোগের প্রশ্নটির সঙ্গে গ্রাম-বাংলায় ভূমি-জলা সংস্কারের প্রশ্নটিও জড়িত যে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা উপরে বলেছি। বর্তমান ক্ষমতাসীন পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে এই সংস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে সংসদে 'মালিক' শ্রেণীর প্রতিভূরা এপথে এগোতে বাধা দিয়ে যাবে নিশ্চয়। এব্যাপারে দেশে চেতনা বিস্তারের এবং সরকারের ওপর দাবি/চাপ চালিয়ে যাওয়া যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এরকম সংস্কার যদি এবং যখনি হয় তাকে ব্যর্থ করবার প্রচেষ্টা থাকবেই, এবং ভূমি-জলা নতুন ক'রে ভূমি-জলাহীন যাদের হাতে আসবে তাদের অনেকেও দারিদ্র্যের জন্য এই নবলব্ধ সম্পদ ধরে রাখতে পারবে না যদি তারা এই সম্পদ যৌথভাবে ম্যানেজ না করে। এই জন্যেও যৌথ উদ্যোগের বাস্তব অভিজ্ঞতা যত সঞ্চয় করা যায় এবং দেশে ছড়ান যায় ততোই ভূমি-জলা সংস্কার কখনো হলে তার সাফল্য নিশ্চিত করা যায়।

৫. গণশিক্ষা আন্দোলনে নেমে যাওয়া

একটি ব্যাপারে দেশে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সারা দেশে নেমে যাওয়া প্রয়োজন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে আমাদের ভাষা আন্দোলন দিয়ে, কিন্তু আজো দেশের অর্ধাংশেরও বেশি মানুষ লিখতে পড়তে পারে না, ফলে-যে শুধু দলিল না দেখে টিপ্ সই দিয়ে জমি কুচক্রিদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায় তাই নয়, গণশিক্ষাই তো যে কোনো দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। বিশ্বে যেসব দেশ উঠে দাঁড়িয়েছে– পাশ্চাত্যে সতের-আঠার শতাব্দীতে জার্মানি থেকে আমেরিকা এবং গত শতাব্দীতে দক্ষিণ এশিয়ার 'টাইগার' দেশগুলো, এবং সাম্প্রতিক কালের এই অঞ্চলের আরো দেশসমূহ– এই সব দেশেরই উঠে দাঁড়াবার পেছনে দেশব্যাপী গণশিক্ষার প্রসারের মৌলিক অবদান রয়েছে। আর দেশে যদি কোনোদিন বড়ো রকমের সমাজ-পরিবর্তনের সুযোগ আসে তখন সত্যিকারভাবে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীই যেন ক্ষমতায় আসে, তাদের নাম ক'রে কোনো বুদ্ধিজীবী-আমলা শ্রেণী নয়, এই নিশ্চয়তার জন্যেও তো ব্যাপক গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত।

আজ দেশে আধুনিক সাক্ষরতা দানের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে ২০/২৫ জনের একটি গ্রুপকে এক/দেড় মাসের মধ্যেই লিখতে-পড়তে শেখান যায় – অধ্যাপক আহসানুল হকের 'ছবি দিয়ে পড়া শিখি' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ২০০৮ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে দেশের নানান্ স্থানে দেশপ্রেমিক তরুণরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একটি গণশিক্ষা আন্দোলনে নেমেও গিয়েছে (টুটুল ২০০৯)। আনন্দের কথা এই-যে এই আন্দোলনে একটি দেশব্যাপী প্রগতিশীল তরুণ সংগঠনও (বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন) নামছে বলে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বাম পার্টি এখনো নামেনি, দলগতভাবে বাম বুদ্ধিজীবীরাও নয়। কিন্তু কী বিরাট সুযোগ এসেছে আজ দেশের কাছে সমস্ত দেশকে দু-তিনটা বড়ো ছুটির ধাক্কাতেই শিক্ষিত করে তোলবার! এই প্রশ্নেও কি দেশের বাম শক্তিবর্গ আগে 'সমাজ-বিপ্লবটা হোক তারপর দেখা যাবে' বলে বসে থাকবে? তার আগে সমস্ত দেশকে শিক্ষিত করে ফেললে কি দেশে সমাজ-বিপ্লবের সম্ভাবনা কমে যাবে, দেশে গণশিক্ষার বৈপ্লবিক প্রসার কি শোষিতদের হাতে দেশের উৎপাদন শক্তির বিকাশকেও ত্বরান্বিত করবে না? জনগণের পাশে প্রগতিশীল শক্তিবর্গ এভাবে এসে দাঁড়ালে উভয়ের মধ্যে এই বাস্তব ইনটারাক্শনের ফলে সমস্ত সমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠে দাঁড়ালে সমাজের প্রগতিশীল পথে এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা কি অনেক বেড়ে যাবে না?

উপসংহার: নতুন সম্ভাবনা?

আজকে দেশের নতুন তরুণ সম্প্রদায় আবার মুক্তিযুদ্ধ থেকে প্রেরণা নিতে চাইছে এবং এদের একটি বড়ো অংশ মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ নিয়ে এই যুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিক শক্তিকে ভোট দিয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুযায়ী গণমানুষদের যৌথ উদ্যোগ দেখতে আগ্রহী বলে শোনা যায়। 'অগ্নিকন্যা'রও ব্যক্তিগত সমাজ-দর্শন এই দিকে বলে জানা। কিছু 'বাম' মহলও বর্তমান সরকারের মিত্রশক্তি হিসেবে সঙ্গে রয়েছে। অপরদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজে সচেতনতার প্রসার, মিডিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এমনকি কিছু বিদেশি সংস্থারও উদ্বেগ দুর্নীতিপরায়ণ শোষক মহলকে আগের চাইতে দুর্বল করেছে। 'মাইনাস টু'-র পক্ষে ও বিপক্ষের শক্তিদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষমতাসীন মহলকে দুর্বল করেছে। স্থানীয় সরকারের লাভজনক কর্তৃত্ব নিয়েও এই মহল আভ্যন্ত রীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমলাতন্ত্রও দুই প্রধান পার্টির মধ্যে আনুগত্যের প্রশ্নে বিভক্ত। সর্বোপরি, দেশে মৌলবাদী শক্তির ভয়াল আগ্রাসন সরকারি মহলের অনেককে জনগণের ওপর আগের মতো শোষণ করে যাবার চাইতে নিজেদের প্রাণ রক্ষার কাজে বেশি ব্যস্ত রাখছে। অপর দিকে বিশ্ব-একাডেমিক মহলেও আজকে উন্নয়ন বলতে সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টনের– ইকুইটির– ওপর জোর দেয়া হচ্ছে (গ্রেইগ ও অন্যান্য ২০০৭) যেখানে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মূল মন্ত্রই ছিল বৈষম্য নিরসন। গ্লোবাল মেল্টডাউনের ফলে বিধ্বস্ত বিশ্ব-প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একচেটিয়া

নেতৃত্বও শিথিল হয়ে পড়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে জাতিসংঘের মানবাধিকারবাদী দর্শন শক্তি পাচ্ছে। বিশ্ব-পুঁজিবাদ আজকে নিঃসন্দেহে অধোগতির পথে এবং দিশাহারা হয়ে নানারকম জোড়াতালি দিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছে যে চেষ্টায় ওবামার মরিয়া হয়ে নেতৃত্ব মনে হয় যথেষ্ট নয়। এরকম সামগ্রিক অবস্থায় বাংলাদেশের উপরিকাঠামোও আজকে শোষণের পথে আগের মতো অবলীলায় এগোতে পারছে না। এই পরিবেশে প্রয়োজনমতো অধিপতি মহলের ভেতরে ও তাদের সহযোগীদের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারী যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আঁতাত করে দেশের গণ মানুষদের যৌথ কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়ে সমাজে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর করবার আবার সুযোগ এসেছে যেরকম সুযোগ মুক্তিযুদ্ধের পর এসেছিল। দেশের উৎপাদন শক্তিকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে উপরিকাঠামোর দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে যাওয়াই বর্তমান সময়ের কাজ – এতে শোষিত মানুষদের যৌথ আত্মশক্তির ওপর ভিত্তি ক'রে দেশের উৎপাদন শক্তির বিকাশ হবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল উপরিকাঠামোকে পরাজিত করবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকবে ব'লে এটাই বর্তমানে সমাজের দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির পথ। দেশ এভাবেই, ফালস্ বর্দার ভাষায় 'দেশজ প্রেরণাজাত সমাজতন্ত্রের'– দিকে এগোতে পারে, যে সমাজতন্ত্র সত্যিকারের উৎপাদন শক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে টেকসই হবে, উৎপাদন শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বুদ্ধিজীবী-আমলা শ্রেণীর অধীনে থেকে আবার উৎপাদন শক্তি দ্বারাই প্রত্যাখ্যাত হবে না।

সবশেষে এই কথা আবার বলে শেষ করছি, যে শহীদ বুদ্ধিজীবীরা তথা মুক্তিযুদ্ধে দেশের সব শহীদরাই, শুধুমাত্র একটি স্বাধীন দেশ পাবার জন্য আত্মত্যাগ করেননি, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ পাবার জন্য আত্মত্যাগ করেছিলেন, এবং তাঁদের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা দেখানো হবে যদি আমরা এরকম একটি সমাজ গড়বার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টাকে ফিরিয়ে আনি দেশকে এ-পথে নেবার জন্য জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে।

এই সমাজতন্ত্র কোনো বিদেশি ছাঁচে না হয়েও দেশজ প্রেরণাজাত সমাজতন্ত্র' হলে কি কোনো ক্ষতি আছে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা, ...জানুয়ারি ২০১০।

টীকা

১. কয়েকটি স্থানে যেমন চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, রংপুর ও পিরোজপুর জেলার চারটি ইউনিয়নে বিধবা, পরিত্যক্ত ও তালাকপ্রাপ্ত নারী যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তাদের বিশেষ অবস্থার জন্য তীব্ররকম ভয়াবহ, গণগবেষণা প্রক্রিয়ার যোগ দিয়ে নিজেদের বিশেষ *'শ্রেণী'*-অবস্থান সম্বন্ধে – যে 'শ্রেণী'-অবস্থান অর্থনৈতিক সম্পর্কের চাইতে বেশি সামাজিক সম্পর্কজাত – সচেতন হয়ে পারস্পরিক সলিডারিটি গ্রুপ গঠন ক'রে

অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে। এভাবে গণগবেষণার মধ্য দিয়ে একটি টেক্সট বুক বহির্ভূত এযাবৎ পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন একা-একা তীব্রতম জীবনযুদ্ধে লিপ্ত সামাজিক 'ক্লাস ইন্ ইট্সেল্ফ', নিজেদের একটি 'ক্লাস ফর ইট্সেল্ফ' গঠনের দিকে এগোতে শুরু করেছে যেটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাস্তব ও প্রত্যয়-নির্দেশক ঘটনা।

References

আকাশ, এম এম (২০০৯). *বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট ও অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি পুনঃদৃষ্টিপাত। মহান অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী।* সমাজ সমীক্ষা সংঘ। ঢাকা। ১৩ নভেম্বর ২০০৯।

Barkat, Abul *et al*. (2008). *Development as Conscientization. The Case of Nijera Kori in Bangladesh.* Pathak Samabesh. Dhaka.

বারকাত, আবুল (২০০৯). *বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন*। সমবায় অধিদপ্তর।

de Silva, G.V.S., Niranjan Mehta, Md. Anisur Rahman & Ponna Wignaraja. (1979) "Bhoomi Sena: A Struggle for People's Power". *Development Dialogue:* 2.

Fals Borda, Orlando (1988). *Knowledge and People's Power. Lessons with Peasants in Nicaragua, Mexico and Colombia*. Indian Social Institute. New Delhi. 1988.

Fals Borda, Orlando (2001). "Participatory action research in social theory: origins and challenges". in Reason and Bradbury (2001/2006). *Handbook of Action Research Participative Inquiry and Practice.* London: Sage.

Gramsci, Antonio (1971). *Selections from Prison Notebooks.* Lawrence & Wishart. London.

Greig, Alastair, David Hulme & Mark Turner (2007). *Challenging Global Inequality. Development Throry and Practice in the 21st Century.* Palgrave Macmillan New York.

Habib, Wasim Bin (2009).. “Smile, Hope All Over”. *The Daily Star* Oct 29: p 16. Dhaka.

Khan, Md. Shawkat Ali (2009). *কুয়াকাটার মৎস্যজীবীরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা কেন নিয়ন্ত্রিত, তার মূল কারণ নিরূপণ এবং এদের বলয় থেকে বের হয়ে আসার পথ অনুসন্ধান ।* Research Initiatives Bangladesh. Dhaka.

Lenin. V.I. (1918). “What is to be Done?” *Selected Works*. Vol 1. Moscow. Progress Publishers.

মাহমুদ, মানিক (২০০৭). ”গণগবেষণা: দারিদ্র দূরীকরণে হতদরিদ্রদের অনুসন্ধান” । *বাংলাদেশে গণগবেষণা । সেপ্টেম্বর ২০০৭ ।*

Mahmood, Manik (2009). *ইউনিয়ন পরিষদভিত্তিক কমিউনিটি ই-সেন্টার মডেল এবং গণগবেষণা.* UNDP Bangladesh. Dhaka.

Rahman, Md. Anisur
1979. “Bhoomi Sena,: A Struggle for People’s Power”. *Development Dialogue*. No. 2. (with de Silva, Mehta & Wignaraja).

1982. “The Theory and Practice of Participatory Action Research”. Keynote Paper presented at the Tenth Congress of Sociology, Mexico, August.
Reproduced in Fals-Borda (ed): *The Challenge of Social Change.* Sage Publications. London 1985; and in Shadish & Reichard (ed*) The Evaluation Studies Review Annual*. Vol 12. 1988. Sage Publications, London. Also in website: www.anisurrahman.com

1984. “People’s Science Movements. Reflections on “Science for Social Revolution”. *Science as Social Activism, Reports and Papers on The People’s Science Movements in India”.* Kerala Sastra Sahitya Parishad, Trivandrum. Also in website: www.anisurrahman.com

1989. "People's Self-development" (Professor Atwar Hossain Memorial Lecture). *Journal of Asiatic Society of Bangladesh (Hum.).* Vol XXXIV. No. 2. December Also in website: www.anisurrahman.com

১৯৯৭. *যে আগুন জ্বলেছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ,* গণপ্রকাশনী, (সম্পাদনা) ।

2000. *Participation Studies, Vol 1. Participation of the Rural Poor in Development* (republication of *Development, Seeds of Change, from Village to Global Order*, 1981:1, guest-edited by the author). Republished by Pathak Shamabesh, Dhaka.

২০০২. 'অমর একুশে ও জাতীয় আত্মবিকাশ' (অমর একুশে বক্তৃতা) *একুশে ও স্বাধীনতা, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজবাস্তবতা, অমর একুশে বক্তৃতা ১৯৯৪.* এ্যাডর্ন পাবলিকেশন

2007. *Through Moments in History. Memoirs of Two Decades of Intellectual and Social Life* (1970-1990). Pathak Samabesh.

2008."The Praxis of Participatory Action Research". Peter Reason & Hilary Bradbury (eds). *Handbook of Action Research.* 2nd edition. Sage Publication. London.

তাহ্‌মিনা, কুররাতুল আইন ও অন্যান্য (২০০৮). *বঞ্চিতদের সৃজনশীল উদ্যোগ অনুসন্ধান, প্রচার ও প্রসার* । রিসার্চ ইনিসিয়েটিভস্ বাংলাদেশ ।

টুটুল, জহুরুল হাসান (২০০৯). 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বাংলাদেশের তরুণ সমাজ'. *শিক্ষাবার্তা । সেপ্টেম্বর । ঢাকা ।*

.....

একুশ জন কবির একুশটি কবিতা

১.

জী ব না ন ন্দ দা শ

.....

মানুষ সর্বদা যদি

মানুষ সর্বদা যদি নরকের পথ বেছে নিতো–
(স্বর্গে পৌঁছুবার লোভ সিদ্ধার্থও গিয়েছিল ভুলে),
অথবা বিষম মদ স্বতই গেলাসে ঢেলে নিতো,
পরচুলা এঁটে নিতো স্বাভাবিক চুলে,
সর্বদা এ সব কাজ ক'রে যেত যদি
যেমন সে প্রায়শই করে,
পরচুলা তবে কার সন্দেহের বস্তু হ'তো, আহা,
অথবা মুখোশ খুলে খুশি হ'তো কে নিজের মুখের রগড়ে ।

২.

দি লা রা হা ফি জ

.....

অঙ্গার

শীতল আঁধারে কেউ ছুঁড়ে দিল ক্ষুরধার সন্দেহ
আমি ততক্ষণ
জন্মের প্রাচীর টপকে বেরিয়ে পড়েছি জোছনায়...
আমার বেড়ে ওঠার কালে রাজপথে ছিল
অমর কাব্যগাথা
তখনো মিছিলে লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস
১৪৪ ধারা-কারফিউ-কানুন
বুকের ধুকপুকে তবু শুনেছি জীবনের অভয়বাণী...
স্বাধীন ভূখণ্ডের মতো আমার যৌবন কেটেছে
বিপন্ন দ্বিধায়
আত্মপ্রতারণা আর অবিশ্বাস আলিঙ্গন করে;
দুর্ভিক্ষের দারুণ পীড়নে প্রৌঢ়ত্ব কেটেছে আমার
সত্য-মিথ্যের মৌসুমি হাওয়ায়
আমার বার্ধক্য আজ পাপ-পুণ্যের মিলিত উদ্যান
আমার মৃত্যু পৃথিবীর শেষতম
সত্যের অঙ্গার...

৩.

ঝর্না রহমান

.....

তুমি যদি

তুমি যদি একবার মুখ ফুটে বলো–
চলো
আমার রক্তস্রোতে দ্রুত শহীদ মিনার– চলে ভাষার মিছিল
হেঁটে যাই নগ্ন পায়ে জনপদ পার হয়ে শেষ রাতে কুয়াশার নীল
তুমি যদি একবার হাত ধরে টানো
জানো

আমার শরীরে জাগে গন্ধমতি লোমকূপে গোলাপের ঝাড়
চন্দ্রমল্লিকা জুঁই জমে ওঠে আরো সব পুষ্পের মাংস ও হাড়
তুমি যদি একবার সত্য হয়ে ওঠো
একমুঠো
জীবনের ধান নিয়ে খনার বচন খুঁজি বীজতলা খুঁড়ে
আশ্চর্য মিনার ওঠে আমার দেহের মাটি অস্থিমজ্জা ফুঁড়ে ।

২২ জুলাই ২০১০

৪.

আবু হাসান শাহরিয়ার

.....

তখনও মানুষ ছিল পৃথিবীতে কোনও জাতিসংঘ ছিল না

গরুড়ের রথে চ'ড়ে জাতিসংঘ আসে। বিষ্ণুবরে পুষ্ট হয় বহুজাতিকতা। বিত্তমহাশয় যাবে বিবাহবাসরে। পণ্যপৃথিবীর বউ কুলীনের কেতাদুরস্ততা। মানবতা নস্যিমাত্র, নাকে গুঁজে নিদ্রা যেতে পারো। পৃথিবী ও আরাফাত দু'জনাই বুড়ো হয়ে গেছে। 'রাষ্ট্র' কথাটির আজও সুরাহা হল না। জগতে কতক রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বাস করে। আবার এমনও আছে, একই জাতি একাধিক রাষ্ট্র নিয়ে থাকে। তাহলে 'মানবজাতি' কথাটির মানে কী দাঁড়াল? পাখিরা সঙ্গীতপ্রিয়, মান্যবর প্লেটোকে চেনে না। টোডাকন্যাদের নিয়ে নির্বাসিত কবি গেছে মেসোপটিমিয়া। পাঞ্জায় বাঘের ছাপ, তারই পাশে পার্বতীও নাচে। স্তনে কি যৌনতা শুধু, আঁতুড়ের দুধধানও আছে। তুমি যদি টোডাকন্যা, বুকে কেন বসন-প্রহরা? ধরা যাক, আমাদের দ্যাখা হল কোনও ট্যাবু-টোটেমের দেশে। তখনও মানুষ ছিল পৃথিবীতে, কোনও জাতিসংঘ ছিল না। তখনও নিষেধ ছিল পায়ে পায়ে, আরও ছিল পুরুতরাজারা। তোমাকে গুহায় রেখে, ধরো, মৃগয়ায় গেছে শিকারী-পুরুষ। মৃত হরিণের দেহ কাঁধে নিয়ে সে আর ফেরেনি। ফিরে এল জাতিসংঘ বহু বহু বছরের পর। তোমাকে পেল না, পেল গুহার বিবর।

৫.

শফিক আলম মেহেদী

একজন ক্রীতদাস ও একটি গাধার কাহিনী

আজকাল প্রায়শ এমন হয়
আমি আমার মাথা খুঁজে পাই না
মেরুদণ্ড, সে এখন দূর অতীতের স্মৃতি!
সতত প্রশ্ন জাগে, জন্মলগ্নে
আমি কি স্বাভাবিক মানবশিশু ছিলাম
নাকি মাথা ও মেরুদণ্ডহীন
সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী
ক্ষুধা ভিন্ন অন্য কোনো অনুভূতি
যাদের স্পর্শ করে না?

যদ্দূর মনে পড়ে
আমি মানুষ হয়েই জন্মেছিলাম
একদিন হিমালয়ের চূড়া
কাঞ্চনজংঘার সুউচ্চ শৃঙ্গ
অসীম আকাশ অতল সমুদ্রদেশ
এসব আমার নাগালের মধ্যে ছিল
আমি তখন মানুষ ছিলাম!

দারিদ্র দৈন্য বৈরী ভাগ্য
অথবা মধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতা
আমার পিতা-মাতাকে
সন্তান মানুষ করার কঠিন অঙ্গীকার থেকে
একচুল বিচ্যুত করতে পারেনি
তাঁরা তাঁদের সন্তানের জন্য
পা-চাটা গোলামের

রাজসুখ নয়
উদায়াস্ত খেটে খাওয়া
শ্রমিক কৃষক অথবা ধীবরের
অবাধ উন্মুক্ত জীবন চেয়েছিলেন
হায় আমার দুর্ভাগা জনক-জননী
আমি আপনাদের যুগল স্বপ্নের
রূপকার হতে পারলাম না
আমার ব্যর্থতা ক্ষমা করবেন ।
অভিজ্ঞতায় জেনেছি ।
মানুষের ভেতর যুগপৎ বাস করে
একজন চক্ষুষ্মান মানুষ
এবং
একজন অন্ধ অচেতন ক্রীতদাস
একটি সাহসী সিংহ
এবং
একটি ভীরু অসহায় গাধা
আমরা যাকে
আধুনিক শিক্ষা উঁচু পেশা
অথবা সম্ভ্রান্ত জীবনযাপন বলি
তা মানুষের ভেতরের অন্তর্লীন মানুষকে
ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে
গোপনে বেড়ে ওঠে ক্রীতদাস
একমাত্র ও প্রবল
এক সময় সিংহটি হেরে যায় গাধার কাছে
অবিশ্বাস্য অদ্ভুত নিয়মে
আমি এখন একজন
নিপুণ ক্রীতদাস উৎকৃষ্ট গাধা
সরল অর্থে সফল আমলা!

এখন আমার মাথা নেই
মেরুদণ্ড নেই
বুকে ভর করে চলা প্রাণীর মতো
দিনগত পাপক্ষয়ে টিকে আছি
মানুষের মতো বেঁচে নেই!

আমাকে দেখে এখন
পাখিরা মুখ ফেরায়
ফুল ঝরে পড়ে
নদী ভোলে উৎসমুখ
হায়রে জীবন
একটাই জীবন
তুই আমার হাতছাড়া হয়ে গেলি!

৬.

মি তা লী হো সে ন

.....

চোখ মেলো

চারদিকে লোভের অস্ত্র
ট্রিগার হাতে রেখে চকচকে তাকিয়ে আছে
নারীর দুর্বলতার দিকে ।
যদি তুমি বালিকা কিংবা কিশোরী হও
তাহলে তো কথাই নেই; তরুণী বা প্রৌঢ়
তাদের কাছে বয়সের কোনো ভেদাভেদ নেই

প্রয়োজন নেই রূপ কিংবা প্রেমের
শুধু-একজন নারী হলেই যথেষ্ট ।
পুরুষ ব্যবহার করবে,
রাজনীতির নামে যে কোনো অজুহাতে...
হয়তো প্রয়োজন হয় না অজুহাতের ।

ক্ষেতে-খামারে, কারখানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে
অথবা সুখী গৃহকোণে,
সবখানেই ফাঁদ পাতা আর
ওৎ পেতে আছে অপেক্ষারত ঘৃণিত পুরুষ ।

ভীত নারী আর কত পিছনে হাঁটবে
আর কত অপেক্ষা করবে কৃষ্ণের?

এ ঘোর কলিতে কৃষ্ণরা পলাতক
এখন শুধুই দুর্যোধনের কলহাস্য ।

সুতরাং আর দেরি নয় জেগে ওঠো নারী;
যেমন করে জেগে ওঠে
ঘুমন্ত অগ্নিগিরি ।
একদিন যেমন করে জেগে উঠেছিল
৭১-এর বাঙালি জাতি ।

৭.

হা সা ন হা ফি জ

.....

যমজের দ্বন্দ্ব-সখ্য

নতুন মৃত্যুর বীজ বুনে ফেলি চিতার জমিনে
রাতারাতি জন্ম নেয় চারাগাছ
তার নাম জীবন জীবন
মৃত্যু আর জীবনের মধ্যে বাঁধা গোপনীয় গাঁটছড়া
আমি তুমি
আমরা তোমরা
এমনকি পৃথিবীর কেউ
তার সূত্র গভীরতা নির্ণয়ে সক্ষম নয়
মানুষেরা এত অটিস্টিক
ক্ষুদ্র ও সীমিত সত্তা সকলের
মানুষেরা এত ক্লীব, ছোট!
আহা রে জীবন!
আহা রে মরণ!
তোমরা যমজ ভ্রাতা, তোমাদের ক্রিয়াকর্মে সবকিছু তছনছ
পৃথিবী সভ্যতা মুক্তি মোহ-কাম সব
মনুষ্যজন্মের এই বিকাশমানতা
প্রগতির বর্ণিল সরণি
ঢেকে যায় অজ্ঞেয় আঁধারে কোনও
ঈশ্বরের ছক মানতে
কেন যেন বাধ্য হয় তারা!
তোমরা সেই শ্মশানে উলুক নাচো
চরিতার্থ করো তৃষ্ণা নিষ্ঠুর চমকে
আলো ছায়া কালো মুখ রাত্রিদিন আকাশ মেঘের স্তর
সবাই বিমর্ষ কেন
জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব কেন তারা
চেয়ে দেখছে নির্বিকার
ছায়াপথে উল্কার ঘূর্ণন
কিচ্ছু তারা বুঝে উঠতে মোটেও সক্ষম নয় পারঙ্গমও নয়...

খ.

জীবন মরণ তোমরা
ঝগড়াঝাঁটি করে আসছো
সৃষ্টির সূচনা থেকে,
সুস্থিতি ও সমঝোতা
তোমাদের প্রিয় নয়
একসঙ্গে তিষ্ঠোনোর ইতিহাসও
কারুর সঞ্চয়ে নেই
আছে শুধু দ্বন্দ্বমুখরতা ক্লেদ
অনুতাপ ছড়ানো ছিটানো
আছে দীর্ঘ ক্ষতের রুক্ষতা
খরার উলোল নাচ
পতনের দাহ্যশক্তি সুখ
এসবে তোমরা তৃপ্ত
আহা উহু জীবন মরণ!

ঢাকা, ১৬.০৭.১০

৮.

স র কা র মা সু দ

.....

সন্ধ্যা ও রাতের মাঝখানে

আত্মবিজড়িত শূন্যতার মুহূর্তগুলো
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অস্পষ্ট আলোয়
যখন ঝোপঝাড়ের বাইরে আকাশ থেকে
কালো ঘাসের উপর পাখির পতন হয় ।
দুঃখবিজড়িত, বঞ্চিত, মায়া-লেপ্টে-থাকা চোখ আর চিবুক
আরো দীপ্র মনে হয়
যখন সন্ধ্যা ও রাতের মাঝখানে

ঘনশ্যামল নিমঝোপ, শ্যাওড়াঝাড়
এক-একটা চুপচাপ ভাবের ফোয়ারা!
অদূরে নীল আলো ফোটে বেড়ার উপর
এখানে রাস্তার পাশে সাদা দেয়াল কালো
ধূসর প্রান্তর জুড়ে মোটা এক পোঁচ আলকাতরার ব্রাশ
এ মুহূর্তে চুনের রঙ কালো!
মুদিদোকানে ঝোলানো খাঁচার ডিমগুলো কালো,
আত্মগত আবার আত্মগত নয় এরকম ভাবের ভিতর
ক্রমশ জড়ানো মায়াপ্রকৃতির ডালপালা চমকালো
বনপাখিদের ভারে!
বেদনায়, অম্লমধুর সব স্মৃতিভাবনায়
ঘন সবুজ আরো নুয়ে পড়েছে ঘন অন্ধকারের ওপর ।

৯.

কা জী ক ন ক সি দ্দি কা

শূন্য ভিটে

শ্যাওলা-পরা ভিটেটায় দু'একটা শালিক
পিছলে পড়ার ভয় ওদের নেই
অবাধে বিচরণের হাঁটি-হাঁটি, পা-পা,
নভোচারীর চাঁদে হাঁটার মতোই
বন্ধ দরজার তালাটা জং-পড়ে বিকল প্রায়
হঠাৎ বৃষ্টির দু'একটা ফোঁটা
পাখিগুলোর সুখ-সুখ খেলায় বাধা
সবুজ শ্যাওলায় আবার পিচ্ছিলতা
কোনো পাখি আর হাঁটছে না

সোঁদা-সোঁদা গন্ধে উঠোনটা
বহু চেনার মাঝেও অচেনা এক ভূতল
পায়ের প্রতিটি চিহ্ন আজ নিমজ্জিত
বহুদিনের পড়ে থাকা শ্যাওলার তলে
দু'ফোঁটা অশ্রু দিয়ে ধুয়ে ফেলার
বৃথা চেষ্টাটুকু স্থগিত রাখাই শ্রেয়,
ভিটেটার উত্তরসূরি দাঁড়িয়ে আছে
খুশিতে আত্মহারা বা আতঙ্কিত হবার মতো
আশপাশে এখন আর কেউ নেই
তবুও কেন পিচ্ছিলতার ভয়ে আতঙ্কিত,
ওই তো সেই গাবগাছটা
সেখানে কেদারায় বসে একদা বাড়ির
বড় কত্তা সবাইকে পরিচালনা করতো
গাবগাছটার বয়েস হয়েছে
আধা-মৃত শরীরে দণ্ডায়মানতা
বড়ই কষ্টের,
কিন্তু কী করা,
আবর্জনা মনে করে উপড়ে ফেলার
উত্তরসূরি যে একটিও নেই ।

১০.

টো ক ন ঠা কু র

.....

মা

মা ঘুমিয়ে পড়েছেন!
আর, আমি তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি
মুঠোভর্তি কবিতা নিয়ে;
আলোর ছোবল এসে, ভোরবেলা মুছে দেবে
রাত্রি থেকে বিচ্ছুরিত অনাথ কাহিনী ।
নিরাকার ভস্ম হয়ে পুড়ে যাবে সকল কবিতা

কিন্তু এই রাত্রিবেলা, বোস্তামিকে মনে করে
আমি যদি দাঁড়িয়ে থাকি,
এভাবে কি জানা হবে– পিপাসায় আমার মা
কী চেয়েছেন?
আমি কেন কবিতাই মুঠো ভরে আনতে পেরেছি?

তবে একথা সত্যি, আমি হয়তো অভাবিত কাটিয়েছি দিন;
পিপাসায় পানি আর কবিতাকে সদর্থক ভেবে
দ্বিতীয় ভুলের দিকে কবিময় সফলতা কুড়োতে গিয়েছি ।
এছাড়া স্বীকার করছি– প্রথম ভুলের জন্যে
ভূমিষ্ঠকে দায়ী করে আমার মামলাগুলো
এখনও খারিজ হয়ে যায়নি!
ফলে, আমার যে-বোন পালিয়ে গেছে
তার জন্যে আধোগুপ্ত কান্নাজাগা রাতে

দেখেছি, অনেক কবিতাই চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়;
যদিও, কবিতাজন্মের প্রথম শর্ত 'শব্দ'... সেই শব্দই এড়িয়ে
নিঃশব্দ আমার মা; আমি তার পিপাসাকে
বুঝতে পারিনি বলে
বাৎসল্যের চোখ থেকে ঝরে পড়া কবিতাও পড়তে পারিনি

মা এখন ঘুমোচ্ছেন।
আর, আমি তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছি
মেঘলিপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে:
রাতের যে-কোনও প্রান্তে, ঘুম ভাঙলে,
আমার বিনিদ্র হাতের মুঠো খুলে, তাকে এই
জলমর্ম কিভাবে জানাব?
যদিও সংশয় থাকে, মেঘমর্মে কবিতা না-কবিতার
প্রবণতা জল হয়ে থাকে?

উল্লেখ্য আমার পিতা সন্ধে থেকে ঘরেই ফেরেননি; তিনি
গার্হস্থ্য-বনের দিকে, হাঁটতে হাঁটতে হাত নেড়ে ডাকছেন–
জোনাকি... ও জোনাকি, ফিরে আয়

সেই যে আগুন আমাকে শিখিয়ে গ্যাছে, ছোটরা পালিয়ে গেলে

রোদের ছোবলে পুড়ে
সন্ধ্যার অদূরে একা পৃথিবীর জোনাকি হয়ে যায়!

তাই, অন্ধকারে অঙ্কুরিত উড্ডীন যন্ত্রণা
যা আমাকে ভালোবেসে উপচে দেয় বাক্য উপহার

আজ মা'র শিয়রে দাঁড়িয়ে, এই যে দেখছি ঘুম, আবার দেখব আলোয়
ভোরবেলা নিরাকার ভস্ম হয়ে পুড়ে যাচ্ছে
মুঠোভর্তি আমার কবিতা

১১.
রহমান হেনরী
.....
সম্পাদক

ইহারা উহারা বাবা, যাহারা পণ্ডিত ।
সমস্বরে গেয়ে ওঠে গড্ডালিকা গীত ॥
তারা চান পুরস্কার, নাম, খ্যাতি যশ ।
রকমারি সংখ্যারও বাহারি তৈজস!!
অমুকের নামে সংখ্যা, তমুকের নামে!
শক্তির পূজারি তারা ভক্তিতে-প্রণামে!!
গোষ্ঠীবদ্ধ পণ্ডিতেরা 'পাপিচুস' খোলে ।
ঘুমে-জাগরণে শোয় বিভ্রান্তির কোলে॥
এরা বলে ওরা মূর্খ, ওরা বলে এরা ।
কী ভেদ, বোঝে না বাবা, এই অধমেরা॥
উক্ত প্রতিভারা ভাবে জগতের মেধা ।
তাদের দলেই এসে ভিড়ে গেছে সিধা॥

মহাকবি, মহাশিল্পী, মহাদার্শনিক ।
তাদের দলেই জন্ম নিতেছে দৈনিক॥
এইমতো ভাবে আর ভাবে থাকে খুব ।
উল্লাসে লাফায়, দেয় তমসায় ডুব॥
কতক আছেন ফের ধুয়ে লজ্জা-হ্রী ।
তোষামোদে খুঁজে নেন আস্মানের সিঁড়ি॥
নামে-কামে তাহাদের যত ভ্রান্ত মিল ।
চার পদে প্রদর্শিত, কষ্ট-প্রান্তমিল॥
ইহারা বড়ই গুণী, বড় ধড়িবাজ ।
তর্জন গর্জন আর তত্ত্ব-আওয়াজ॥
উহাদের তত্ত্বকথা, কবিতা-করাত ।
কেটে ফেলে, পাঠকের ষোলো জোড়া দাঁত॥
ভিনদেশী কবি পেলে তাহাদের জামা ।
উপলক্ষ করে রচে বঙ্গ-শাহনামা॥
বাজায় ঢোলক, শাঁখ, বাজায় দামামা ।
স্বর্ণজ্ঞানে কণ্ঠে পরে পরদেশী তামা॥
ফুলসংখ্যা মেঘসংখ্যা তেলাপোকা আর
সংখ্যা প্রকাশিত হয়, কামু-কাফকার॥
অভিনব তত্ত্ব-ফত্ত্ব, কী যে তার মানে!
আমি তো নাচার গুরু, তারাও না জানে!!
টরেন্টো চত্বর খোলে, নর্থব্যাঙ্ক কেউ ।
স্বঘোষিত তত্ত্বজ্ঞানী বৈদেশিক ফেউ॥
মিডিয়ার পসারিণী খুঁজে এনে শেষে ।
লিটল, লিটিলস্টার ঋদ্ধ করে দেশে!!
তারা তো মহান বাবা, সঙ-সম্পাদক!
বেজায় কেতাবি ঢঙে দেখান চমক!!
চমকে গমক খেয়ে লোকে কুপোকাত ।
ঘাড় কেন ত্যাড়া? গুরু, সে-ও এক জাত!!
আর যত স্বঘোষিত রথী মহারথী ।
পদ্যছন্দ, অলঙ্কার, শাস্ত্রজ্ঞানপতি॥
প্রদর্শন করিতেছে ভুল সুরে গান ।
মাঝখানে আমি সাধু, ওষ্ঠাগত প্রাণ!!

এ দেশ তাজ্জব গুরু, তাজ্জব এ দেশ!
কবি শিরস্ত্রাণ বটে! অভিনব বেশ!!
আর যত আলোচক, স্তাবকপ্রবর ।
গড়িতেছে মহাশূন্যে মহা কবিঘর॥
যে যার আপন বৃত্তে কবি পাঁচ-ছয় ।

তারা ভিন্ন আর কেহ পদবাক্য নয়॥
বৃত্তবাদী মহাশয়, প্রতিভা অদ্ভুত!
মেধানির্বাচনে যেন ঈশ্বরের দূত॥

১২.
রো ক সা না আ ফ রি ন

.....

সিজোফ্রেনিয়া

২৯ নভেম্বরের আমি'টাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না
নিজের ভিতরে
যে আমি'টা হেঁটে যাচ্ছি কাঁচপুর ব্রিজের দিকে
তার নাম হু-হতাশ নয়
তার নাম আদিগন্ত ভোর,

সিদ্ধার্থ যা যা জানত তার কিছুই জানি না
তবু বলতে ইচ্ছে করে 'লোভ থেকেই দুঃখের জন্ম'

আর বাতি নিভে গেলে মানুষের মুখ যেমন অচেনা হয়
একদিকে গ্রহণ-লাগা দিন তো অন্যদিকে
পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাওয়া নিশিন্দার বন
আসলে সিজোফ্রেনিয়া এসে ভর করে যদি
জলের নৌকায় পা ফেলে পা ফেলে
ক্রন্দন করি আমি আর জালালুদ্দিন রুমি ...

১৩.

আ শি ক আ ক ব র

.....

বাংলাদেশ গর্ভবতী হচ্ছে

দু'টো কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার
দু'টো 'কী করতে হবে'
একটা মার্কেজ
দুইটা চে গুয়েভারার ডাইরি
লেনিনের রাষ্ট্র, স্টালিনের ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ
সে তো আছেই
আছে ঠাণ্ডাগুনের লিটলম্যাগ
মাওবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদী ঘোষণা
রণকৌশল, রণনীতি...
ঘরে ঘরে লালাগুন জ্বালানোর ঘাস বিচুলি
আরো আরো অনেক আগুন, অনেক কবিতা নিয়ে
বসছি ছবির হাটে
ছবির হাটে বইয়ের হাট হচ্ছে
সৃজনশীলদের
বিপ্লবীদের
টেবিল আলোকিত করে
লালাগুন ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশে
বাংলাদেশ গর্ভবতী হচ্ছে ।

১৪.

মা সু দ প থি ক

.....

শব্দ অথবা বাক্য

এই যে বাক্য 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'
কোমল অথবা সত্য ভেবে বাক্যের ভেতর কী মুগ্ধ হয়ে থাকব, সারাজীবন
অথবা ধীরে ধীরে ভেতরে অনেক প্রহর, হাজার বছর নীরব ক্রীতদাস হব!

যে যাই বলুক শিরদাঁড়া নুইয়ে বিস্ময় চিহ্নসহ
ঢুকে যাব তোমার অন্ধঘরে... লুকাব চোখ
তোমার শুদ্ধ বাক্যের শরীরে, কত কত বাঁদর কিচমিচ করে
এই ভেবে হৃদয় ব্লকে
মুগ্ধ হয়ে রাঙাবো না কি মনন
সময়ের শব্দ-বাক্য কলরব

মিথ্যের আলপনা আঁকা শব্দের বর্ণের মোহমায়ায়
আর কতদিন ভুলাবে, পরাধীনতা ভুলে একদিন–

রিক্ত শব্দ অথবা বাক্যের জীবনে প্রেম হয়েছিল,
বিবাহ হলে হয়তো কথার মতো ফুটফুটে সন্তান হত

আমি তো জেনেছি যতই আঁকো নাকো ওদের
বিশ্বস্ত না হলে মন, কথারা করে না আনন্দরমণ

১৫.

অনন্ত সুজন

.....

দ্বন্দ্ব

শেখাও সে ভাষা, যতটা স্বাভাবিক তরঙ্গনাচ
মনোভূমে যা দ্বিখণ্ডিত– উতলা সংহার
এইতো বাতাস কাউকে না বলে ছুটে গেল
বনের দিকে। হরিণীর শখের মাচায় ছুঁড়ে
দিয়ে বসন্তশীষ। জানা গেল– ঋতুবেদনা নিয়ে
এতকাল বাঘও ছিল বধির। অশেষ আয়তন
জুড়ে জেগেছে কাহিনী। এতকাল ধরে বিভ্রমে
করমচাকে ভেবেছে ফল। বিবাদে জড়িয়ে
টের পায় বাঘ ও হরিণ।

১৬.

মিজানুর রহমান বেলাল

.....

হলুদ প্রেতছায়া

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকে টের পাচ্ছি–
আশে-পাশের চিরচেনা মানুষেরা ধীরে-ধীরে অচেনা হয়ে পড়ছে।
কেউ কেউ দূর থেকে দয়ালু কথার বেহুলা বাজায়–
মানুষ তো চিরদিন বেঁচে থাকে না;
সবার মরতে হবে একদিন
আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয় হেঁকে হেঁকে।

সবার চোখে শোক দেখছি– শূন্যতা খুঁজে পাইনি
যাদের প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে এসেছি যুগযুগ
তারা আমাকে সহজে বিদায় দিতে প্রস্তুত
কফিন সাজিয়ে রেখেছে যত্ন করে ।

হায় ঈশ্বর! মানুষের ভেতর ছিমছাম হলুদ প্রেতছায়া
অবিকল মানুষের মতো নৈঃশব্দের ক্রুশবিদ্ধ
জীবনের শেষ দিনে এসে বুঝেছি– হলুদ প্রেতছায়া'রা
আমার ঘুমপাড়ানির গুরুদায়িত্ব নেবে ।

১৭.

শা মী ম মে হে দী

.....

বৃষ্টিবন্দনা অথবা তার চোখে জল

আমাদের শহরে একদিন বৃষ্টি এসেছিল
বন্যা এসেছিল
হৃদয়ের দোর কোণায় সে হাত
বৃষ্টির মৃদুলায় ভিজেছিল

শহরের শেষ বিকেলের সবুজ ঘাস
পাখি কথার মতো গেয়েছিল
তখন কি তার চোখ কেঁদেছিল

অথবা
বৃষ্টির ফোঁটা চোখের জল মুছেছিল?

১৮.

তুহিন তৌহিদ

.....

এটিএম বুথ

গলির প্রায় প্রত্যেক মোড়ে সেজে গুজে দাঁড়িয়ে আছেন
কেমন রূপসী তিনি, রঙ-চঙ আলোঝলমলে
আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে
ঘষলেই ফুটে ওঠে কাঙ্ক্ষিত মুকুল ।
অবগুণ্ঠনে ঢেকে দিলে তিনিও লাজুক
অপেক্ষায়
অতঃপর অন্য কেউ
ঘোমটা সরিয়ে ছুঁয়ে দিলে ভুলে যান অতীতের স্মৃতি
কারো কোনো স্পর্শে তার অসম্মতি নেই, কী নির্মোহ...
তিনি এক নাচের পুতুল–
সুতা যার হাতে তাকে দেখি না কখনো;
স্পর্শে হয়তো দেন অনেক, তবে মুখ চিনে-চিনে
আর সুতার অদৃশ্য মালিক সবার সবকিছু নিয়ে নেন

১৯.

সু দী প্ত সা ই দ

.....

পাঠ

পাঠ কর তোমার নামে, প্রকৃতি পুস্তক
পাঠশেষে ঘুম যাও– পাঠ কর স্বপ্নান্ধ
হৃদয় । অতঃপর পাঠকেও পাঠ কর ।
আরেকটি পাঠ । পাঠের ভেতরে পাঠ ।

সমস্ত পাঠ শেষে হয়ে যাও একজন ঈশ্বর–
বল – আয়নাল হক । আমাদের পৃথিবীতে
একজন মনসুর হাল্লাজের বড্ড বেশি
প্রয়োজন ।

২০.

আ ন্দা লী ব

.....

ডেন্টিস্টের চেম্বারে

ওইখানে একটা বাস্কেট রাখা আছে, বসে থাকবার টুল থেকে
দূরে । কিছু আগে কাগজের একটা স্লাইস তোবড়ানো হয়েছিল,
মেয়েটা যখন একাগ্র নখ কাটছিল দাঁতে । ভ্রু'তে উন্নাসিকতা এঁকে
অন্যকেউ ঢুকে পড়তেই বিপন্ন বোধ করেছিল কালো কাক ।
আমি জানি যার যার ডাক পড়েছিল, কেউ তারা আসেনি এখনো ।

আমি, কালো কাক আর নার্ভাস মেয়েটা শুধু। তোবড়ানো কাগজটা
শূন্যে ছোঁড়া হলে বাস্কেটে পৌঁছোবার সম্ভাবনা কতটা– তা এখন
ধারণা করা যাচ্ছে খানিকটা, পার্সেন্ট হিসেবে। এরকম ভেবে
শূন্যতায় সাধারণ একটি প্যারাবোলা আঁকা হল।

২১.
আ ফ রো জা সো মা

.....

বঙ্গোপসাগরের প্রতি

শত শত বাঁও জলের গহীনে
পলি জমে হাজার বছর
সাগরে জেগেছে যে দুবলার চর– তার তো জননী তুমি–
কিন্তু মা, আমার আশ্রয় কই?
সুলেমানি তরবারি হতে চাইনি কখনো
তোমার অতল তল থেকে জেগে ওঠা
নিঃশব্দ 'আলোর কোল' চর হতে চেয়েছি কেবল
চেয়েছি বারবার সুন্দরবনে বেড়ে ওঠা
একটা বেনামী গাছ হতে– ঘুঘু হতে–

কেষ্ট নামের যে মাঝি ছেলেটা
বিজন দ্বীপে নৌকা সারাতে সারাতে
ভরদুপুরে গেয়ে ওঠে
'হরি নামে সুর বেঁধে দাও দেহ একতারায়'
তার মতো বেভুল হতে চেয়েছি–

শাঁখারিবাজারে ব্যবসায়ীদের ভিড়ের ভেতর

গোপাল নামে যে দোকানি লোকটার গায়ে
কেমন যেন নদী নদী গন্ধ–
তার মতো একটা খুব গোপাল হতে চেয়েছি;
প্রবল বিজয়ী হতে তো চাইনি কোনো দিন–
চেয়েছি সহাবস্থান–
চোখে চোখে প্রাণের ইশারা–
তবু কেন স্লেজ-টানা কুকুর হয়ে উঠছি
ক্ষেপে উঠছি পরস্পরের বিপরীতে–
নিজেদেরই রক্তে কেন রাঙিয়ে তুলছি বরফ?

এখন তো ফুরোবার সময় নয়–
জীবন জীবন করে–
কাঙালিপনার সময় নয় জীবনের পিছু পিছু;
এখন আমরা গাছ হব
রোদ এসে জিরোবে তার পত্র-পল্লবে
সমুদ্র হব– রহস্য তৈরি হবে সাগর ঘিরে
সাগরের প্রাণী শঙ্খকে ঘিরে তৈরি হবে
শাঁখা ও সধবার মিথ–

কিন্তু এমন কেন হচ্ছে মা?
প্রাণ কেন পড়ে যাচ্ছে মুঠো উছলে!

প্রকাশিত কবিতার দু'টি আলোচনা

.....

আ ল ম খো র শে দ: **এক/** মু জি ব মে হ দী: **দুই**

[এ সংখ্যায়ও প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম কবি আলম খোরশেদ ও কবি মুজিব মেহদীকে। সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যে এঁরা আলোচনা সমাপ্ত করে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন। এঁদের কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় আলোচকদ্বয় কবির নাম উল্লেখ না-করে শুধু কবিতার নাম উল্লেখ করে আলোচনা দু'টি সম্পন্ন করেছেন। এতে আলোচনা দু'টি কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। কবিতাগুলো কেমন হয়েছে এবং এর ওপর আলোচনা দু'টি কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায়।]

কবিতার আলোচনা: এক/ আলম খোরশেদ

১.

'মানুষ সর্বদা যদি' কবিতাটি পাঠ করতে করতে হঠাৎ করে মনে একটা ভয় ধরে গেল! আমাদের কবিরা সর্বদা যদি এরকম বিদঘুটে বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতে প্রবৃত্ত হন তাহলে আমাদের মতো পাঠকদের কী গতি হবে, যারা এখনো কবিতার নির্ভার, নিরাভরণ, স্বতস্ফূর্ত সৌন্দর্যের অনুরাগী? যারা কবিতার কাছে কষ্টকল্পিত দর্শন নয়, উচ্চকিত ভাষণ নয়, ভাষার কসরত কিংবা ভঙ্গির প্রদর্শনী নয়, স্রেফ একটি নিটোল ছবি কি একটি কোনো সহজ ভাবের বিস্তার কিংবা কোনো-এক আটপৌরে আখ্যানের ইঙ্গিত প্রত্যাশা করে। অবশ্য এই কবিতার রচয়িতাকে একটি ব্যাপারে বাহবা দিতে হয়, সেটি তাঁর ছন্দজ্ঞানের জন্য। তিনি কবিতার অন্তত একটি আবশ্যক কলাকে রপ্ত করতে পেরেছেন, সেটিই-বা কম কী!

২.

'অঙ্গার' কবিতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভেতর দিয়ে কবি তাঁর স্বদেশের দ্বন্দ্বদীর্ণ ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত সালতামামি তুলে ধরেন আর তার সঙ্গে যুক্ত করে নেন নিজস্ব স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, আশা ও হতাশার সত্যনিষ্ঠ, অকপট বয়ান। কবিতাটির ভাবে বা বক্তব্যে তেমন কোনো মৌলিক মাত্রা লক্ষ করা না গেলেও সুচিন্তিত শব্দচয়ন আর ভাবপ্রকাশের সাবলীলতায় এটি পাঠকচিত্ত স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে। 'আমার বার্ধক্য আজ পাপ-পুণ্যের মিলিত উদ্যান/ আমার মৃত্যু পৃথিবীর শেষতম/ সত্যের অঙ্গার...', গভীর দার্শনিকতায় উত্তীর্ণ কবিতার এই শেষ উচ্চারণটুকু পাঠক হিসাবে আমাদের পরম পাওয়া।

৩.

এতক্ষণ কবিতা নামধারী এই রচনাসমূহ পাঠ করতে করতে মনের মধ্যে এক ধরনের আক্ষেপ ও শূন্যতাবোধ তৈরি হচ্ছিল, কবিতার একটি মৌল অনুষঙ্গ ছন্দপ্রকরণের নিপাট অনুপস্থিতি দেখে। মনে হচ্ছিল এই সময়ের কবিরা বুঝি ছন্দ ব্যাপারটিকে একেবারেই বাতিল ও ব্রাত্য করে দিয়েছেন। সেই আক্ষেপ দূর হল 'তুমি যদি' পাঠ করে। নিটোল, নিবিড় ছন্দ-মিল সমন্বয়ে রচিত এই কবিতাখানি পাঠ করে একদিকে যেমন তৃপ্ত হল মন, অন্যদিকে কবির প্রতি কৃতজ্ঞতাও জাগল, সহজে বাজিমাত করার এই যুগে অভিনিবেশ সহকারে ছন্দ ব্যাপারটিকে আয়ত্ত ও যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য। কবির ছন্দের হাত যে খুবই পোক্ত সেটা বোঝা যায় মূলত অক্ষরবৃত্তে রচিত এই কবিতার দুটো শব্দে, 'রক্তস্রোতে' ও 'চন্দ্রমল্লিকা'-য়, সুকৌশলে মাত্রাবৃত্তের সুবিধাটুকু আদায় করে নেবার মুন্সিয়ানা দেখে। সবশেষে বলি, 'ওঠো'র সঙ্গে 'মুঠো'র অন্ত্যমিলটার কারণে এক ধরণের একটা খুঁতখুঁতুনি কিন্তু রয়েই গেল মনে।

৪.

অনুজপ্রতিম হালখাতা-সম্পাদকের অনুরোধে এই একুশটি কবিতা পাঠ ও তার আলোচনা লেখার পরিশ্রম ও ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়ে গেল 'তখনও মানুষ ছিল পৃথিবীতে কোনও জাতিসংঘ ছিল না' কবিতাটি পড়ার পর। সত্যি বলতে কি, এই এককুড়ি একটি কবিতার মধ্যে একমাত্র এই কবিতাটিকেই একটি সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন কবিতা বলে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যেতে পারে। আজকের কবিতায় আমরা যে ইতিহাস ও রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও প্রতিবেশের বহুমাত্রিক ও শৈল্পিক উপস্থাপনা প্রত্যাশা করি তার সবক'টি শর্ত অত্যন্ত পরিপাটিভাবে রক্ষিত হয় এই কবিতায়। এই কবিতা আমাদেরকে শুধু স্পৃষ্ট করে না, একই সঙ্গে শিক্ষিত, সচেতন ও সমৃদ্ধ করে। টানা গদ্যের ভঙ্গিতে, প্রবহমান পয়ারের করণকৌ শলের নিখুঁত প্রয়োগে রচিত গোটা কবিতাটিই স্মৃতিতে ধারণ ও উদ্ধৃতিযোগ্য। দুটো পঙ্‌ক্তি তো একেবারে

বাঁধিয়ে রাখার মতো। আপাতত সেই দুটো লাইন উদ্ধৃত করে, 'স্তনে কি যৌনতা শুধু,/ আঁতুড়ের দুধধানও আছে।'' তুমি যদি টোডাকন্যা, বুকে কেন বসন-প্রহরা?' এবং এই কবিতার ত্রিকালদর্শী স্রষ্টাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানিয়ে আলোচনার ইতি টানছি।

৫.

'একজন ক্রীতদাস ও একটি গাধার কাহিনী' কবিতাটি সম্ভবত একজন কবি কাম সফল আমলার আত্মজৈবনিক ভাষ্য, যেখানে তিনি খুব সরল ও সরাসরিভাবে, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের চাপেই হোক আর উন্নত জীবনের প্রলোভনেই হোক, কবিতাদেবীকে উপেক্ষা করার জন্য আহাজারি করেন। কিন্তু মুশকিল হল এর জন্য তিনি যে ভাষা বেছে নেন সেটা আদতে কোনো কবিতার ভাষাই নয়। এ-ভাষা সংবাদপত্রের কলামধর্মী রচনায় চললেও চলতে পারে কিন্তু কবিতায় নৈব নৈব চ! সত্যি বলতে কি, এই কবিতার একেবারে শেষ তিনটি লাইনকেই কেবল কবিতার কাছাকাছি বলে মনে হয়েছে কিছুটা। প্রায় দুই পৃষ্ঠা জুড়ে ক্লান্তিকর বাগবিস্তার না করে তিনি স্রেফ এই তিনটি লাইন, 'হায়রে জীবন/ একটাই জীবন/ তুই আমার হাতছাড়া হয়ে গেলি!' লিখলেও বোধহয় সেটি অনেক বেশি কবিতা-পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারত।

৬.

'চোখ মেলো'-কে কবিতা না বলে একটা ছোটখাটো নারীবাদী, রাজনৈতিক বক্তৃতা বললেই বরং ঠিক বলা হয়। আর এর ভাষাকে কবিতার ভাষা বলার দুর্মতি যেন না হয় আমাদের কোনোদিন, কেননা এই ভাষায় যা লেখা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় পোস্টার কিংবা প্রচারপুস্তিকা। বলাইবাহুল্য, 'চোখ মেলো'-ও এর বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। এ-উক্তির সমর্থনে রচনাটির সর্বশেষ স্তবক, 'সুতরাং আর দেরি নয় জেগে ওঠো নারী;/ যেমন করে জেগে ওঠে/ ঘুমন্ত অগ্নিগিরি। / একদিন যেমন করে জেগে উঠেছিল/ ৭১-এর বাঙালি জাতি।' উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট। নয় কি?

৭.

'যমজের দ্বন্দ্ব-সখ্য' কবিতায় কবি জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-দ্বৈরথ নিয়ে এক ধরনের দার্শনিক বাহাসে রত হন, কিন্তু তার সঠিক মাজেজাটুকু কখনোই পরিষ্কার হয় না পাঠকের কাছে। কী উদ্দেশ্যে এবং কোন গূঢ় প্রণোদনায় কবি এমন একটি অকাব্যিক বিষয় নিয়ে কাব্যরচনায় উদ্বুদ্ধ হন সেটা বুঝে ওঠা মুশকিল। শুধু বিষয় নয়, কবিতার শিরোনাম, ভাষা, ভঙ্গি কোনো কিছুতেই কবিতার সেই অনির্বচনীয় মায়াবী স্পর্শটুকু খুঁজে পাওয়া ভার। 'মানুষেরা এত অটিস্টিক/ ক্ষুদ্র ও সীমিত সত্তা সকলের/ মানুষেরা এত ক্লীব, ছোট!

আহা রে জীবন!/ আহা রে মরণ!/ তোমরা যমজ ভ্রাতা, তোমাদের ক্রিয়াকর্মে সবকিছু তছনছ/ পৃথিবী সভ্যতা মুক্তি মোহ-কাম সব/ মনুষ্যজন্মের এই বিকাশমানতা/ প্রগতির বর্ণিল সরণি/ ঢেকে যায় অজ্ঞেয় আঁধারে কোনোও/ ঈশ্বরের ছক মানতে/ কেন যেন বাধ্য হয় তারা!' নির্দ্বিধায় কবুল করছি, এমন শিল্পসুষমাবর্জিত বাক্যরাজির সৃষ্টির রসায়ন বুঝতে অপারগ এই আলোচক! ক্ষমা করবেন কবি ।

৮.

'সন্ধ্যা ও রাতের মাঝখানে' মূলত প্রকৃতি ও প্রাণীপ্রেমের কবিতা। যদিও কবিতানির্মাণের শর্তসমূহ এক্ষেত্রে যথাযথভাবে পালিত হয়েছে সে-কথা বলা যাবে না। 'যখন ঝোপঝাড়ের বাইরে আকাশ থেকে কালো ঘাসের উপর পাখির পতন হয়।' কিংবা 'আত্মগত আবার আত্মগত নয় এরকম ভাবের ভিতর' জাতীয় পঙ্‌ক্তিগুলোকে কবিতা বলে মেনে নিতে কষ্ট হয়। তবে 'ঘনশ্যামল নিমঝোপ, শ্যাওড়াঝাড়/ এক-একটা চুপচাপ ভাবের ফোয়ারা!' উপমাটিতে কিঞ্চিত নতুনত্ব ও ভাবনার খোরাক পাওয়া যায়। এই কবিতাটি থেকে আমাদের প্রাপ্তিযোগ আপাতত এটুকুই ।

৯.

সামন্ত অতীতের প্রতি স্মৃতিকাতরতা নিয়ে রচিত 'শূন্য ভিটে' কবিতাটি ভাবনার দিক থেকে যেমন অগভীর, তেমনই ভাষা ও প্রকরণের ক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ। 'খুশিতে আত্মহারা বা আতঙ্কিত হবার মতো/ আশপাশে এখন আর কেউ নেই / তবুও কেনো পিচ্ছিলতার ভয়ে আতঙ্কিত,/ ওই তো সেই গাবগাছটা/ সেখানে কেদারায় বসে একদা বাড়ির / বড় কত্তা সবাইকে পরিচালনা করতো'– জাতীয় কথাবার্তাকে এই একবিংশ শতাব্দীতে কবিতা বলে দাবি করার জন্য বুকের পাটা দরকার। অলমতি বিস্তারেণ!

১০.

জগতে মা-কে নিয়ে অগণিত কবিতা রচিত হয়েছে। এর প্রায় প্রতিটিই কোনো না কোনোভাবে আমাদের আবেগকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। এই কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সে কি কেবল বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত যুগপৎ ব্যক্তিক ও বৈশ্বিক আবেগের সর্বজনীন মাত্রাটুকুর জন্যই? এটি একটি বড় কারণ সন্দেহ নেই, তবে একমাত্র কারণ নয়। এর পেছনে কবির দক্ষতা- যোগ্যতার প্রশ্নটিও সমান ক্রিয়াশীল। অন্তত 'মা' নামের এই কবিতাটিও যে সামগ্রিকভাবে আমাদের বোধকে নাড়া দিতে এবং চেতনায় এক ধরনের ইতিবাচক আলোড়ণ তুলতে সক্ষম হয় তার পেছনে কবির ভাষাক্ষমতা ও প্রকরণদক্ষতার ভূমিকাও কম নয়।

অস্বীকার করব না, দুয়েকটি ক্ষেত্রে কবির শব্দপ্রয়োগকে ('তাই, অন্ধকারে অঙ্কুরিত উড্ডীন যন্ত্রণা/ যা আমাকে ভালবেসে উপচে দেয় বাক্য উপহার': এর একটি নমুনা) অমোঘ বলে মনে হয় নি, কিন্তু মোটের ওপর গোটা কবিতাটিই যে নিজপায়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে সেই শক্তিকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই আমাদের ।

১১.

'সম্পাদক' কবিতাটি নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান কবির রচনা যিনি স্রেফ কবিমাত্র নন, বঙ্গসাহিত্যের একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক ও প্রাজ্ঞ সমাজ-ভাষ্যকার । তিনি নির্ভুল ছন্দ-মিল, লাগসই শব্দ-উপমা-চিত্রকল্প, সুতীব্র ব্যঙ্গোক্তি আর মর্মভেদী, বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যভাষা প্রয়োগে আমাদের সাহিত্যঅঙ্গনের যে নিখুঁত পোস্টমর্টেম করেন সে-বিষয়ে বুঝদার ও বিবেচক কারোরই কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয় । তবে কবিতার বিষয় হিসাবে তা কতটা আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে সেটা দেখার বিষয় । কেউ কেউ যে একে কবির ব্যক্তিগত অভিমান ও অসূয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ধরে নেবেন না সেটাও হলফ করে বলা যায় না । কবিকে তাই এই আলোচকের বিনীত পরামর্শ, এ-জাতীয় সমালোচনামূলক বিষয় নিয়ে তিনি যেন প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করার কথা ভাবেন যা আমাদের সাহিত্যের স্বরূপদর্শনের জন্য খুবই জরুরি । পাশাপাশি ভাষা, ভঙ্গি, ছন্দ, শব্দ বিষয়ে তাঁর এই ঈর্ষণীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি আরো বেশি করে গহন-গভীর, শিল্পিত কবিতা উপহার দেবেন, এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা । শেষ কথা এই যে, আলোচ্য কবিতাটি পাঠ করে বিমলানন্দ অনুভব করেছি । কবিকে অভিনন্দন ।

১২.

'সিজোফ্রেনিয়া'-কে বলা যেতে পারে একটি হতে-পারত সফল কবিতা, কেননা কবিতাটি শুরু হয়েছিল খুবই শিল্পিত কিছু চিত্রকল্প, ইঙ্গিতধর্মী বাক্যবন্ধের সুষম বিন্যাসের মধ্য দিয়ে, কিন্তু একেবারে শেষ স্তবকে এসে কবিতার নামকরণের সার্থকতা প্রমাণে প্রবৃত্ত হয়ে কবি সর্বনাশ করে বসেন এমন অপার সম্ভাবনাময় সুঠাম, সুনির্মিত কবিতাটির । তবুও বলি, 'যে আমি'টা হেঁটে যাচ্ছি কাঁচপুর ব্রিজের দিকে/ তার নাম হু-হতাশ নয় / তার নাম আদিগন্ত ভোর,' কিংবা 'একদিকে গ্রহণ লাগা দিন তো অন্যদিকে/ পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাওয়া নিশিন্দার বন'-এর মতো পঙ্‌ক্তি যে-কবি রচনা করতে পারেন তাঁর কাছ থেকে অদূর ভবিষ্যতে মহত্তর কবিতার প্রত্যাশা তো আমরা করতেই পারি ।

১৩.
'বাংলাদেশ গর্ভবতী হচ্ছে' একটি উচ্চকিত, ঘোষণাধর্মী, প্রতিবেদনমূলক কবিতা, যার মূল সুরটি রাজনৈতিক, কিন্তু সে-রাজনীতির, আরো খোলাসা করে বললে, বাম রাজনীতির, ভিত্তিহীন কিংবা অমূলক না হলেও কবিতার এই স্বল্প পরিসরে তা স্বরূপে উদ্ভাসিত না হয়ে বরং বিভ্রমের সৃষ্টি করে।

১৪.
'শব্দ অথবা বাক্য' কবিতাটিকে বলা যেতে পারে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' উচ্চারণটির একটি কাব্যিক ময়নাতদন্ত, যদিও তা সংঘটিত হয় মূলত অকাব্যিক ভাষায়, ফলত একদিকে যেমন কবিতার মতো একটি মোহন, মায়াবী সাহিত্যপ্রকরণের প্রতি অবিচার করা হয়, তেমনি অবিচার করা হয় ভালোবাসার মতো একটি শাশ্বত-সুন্দর অনুভূতির প্রতিও। বর্তমান আলোচকের আত্মপক্ষ সমর্থনে দুটো উদ্ধৃতি দেয়া যাক: 'আর কতোদিন ভুলাবে, পরাধীনতা ভুলে একদিন–/ রিক্ত শব্দ অথবা বাক্যের জীবনে প্রেম হয়েছিল', 'আমি তো জেনেছি যতই আঁকো নাকো ওদের/ বিশ্বস্ত না হলে মন, কথারা করে না আনন্দরমণ।' এবার পাঠকই বলুন, কী পেলেন আপনি এইসব 'শব্দ অথবা বাক্য'-র সুবিন্যস্ত সমাবেশ থেকে!

১৫.
'দ্বন্দ্ব' কবিতাটি শুরু হয় এমন একটি সরল প্রার্থনা দিয়ে 'শেখাও সে ভাষা, যতটা স্বাভাবিক তরঙ্গনাচ', কিন্তু এর অব্যবহিত পরের লাইনেই তিনি লেখেন 'মনোভূমে যা দ্বিখণ্ডিত– উতলা সংহার' যা তাঁর প্রার্থনার ঠিক বিপরীত! অবশ্য পরবর্তী পঙ্‌ক্তিসমূহ ভাষা ও ভঙ্গিতে অতটা জটিলতা ধারণ করে না যদিও কবির ভাবনাসূত্রে কোথায় যেন অস্পষ্টতার ধোঁয়াশা উঁকি মারে। 'বাঘের ঋতুবেদনা' (নাকি বাঘিনীর?) আর 'করমচা'-কে ফল ভাবার (আমরা তো একে ফল হিসেবেই জানি।) আরোপিত বিভ্রমের মধ্যে কবির বৌদ্ধিক অমনোযোগই ধরা পড়ে বেশি। কিন্তু এহ বাহ্য, এই কবিতার অন্তত দুটি পঙ্‌ক্তি, 'এইতো বাতাস কাউকে না বলে ছুটে গেলো/ বনের দিকে। হরিনীর শখের মাচায় ছুঁড়ে দিয়ে বসন্তশীষ।' স্মরণীয়তার যোগ্যতা রাখে।

১৬.
'হলুদ প্রেতছায়া' কবিতাটি জনৈক প্রবীণের সরল, সাদামাটা স্বীকারোক্তিবিশেষ। মৃত্যুচিন্তা এবং স্বজন-বান্ধব বিষয়ে কবির ভিন্নতর, নেতিময় উপলব্ধিই এই কবিতার সারকথা। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে কবি উপলব্ধি করছেন তাঁর এতদিনের চেনাজানা স্বজনেরা বস্তুত তাঁর আসন্ন বিদায়কে যে শুধু সহজে মেনে নিচ্ছেন তাই-ই নয় তাঁরা বুঝি-বা সেটা সংগোপনে কামনাও করছেন, যা তাঁকে প্রবলভাবে পীড়িত করে এবং

তিনি তাঁদের 'হলুদ প্রেতছায়া' (এর ব্যাকরণসিদ্ধ বানান অবশ্য প্রেতচ্ছায়া) বলে আখ্যায়িত করেন। কবির এই অনুভূতি যতই আন্তরিক হোক না কেন পাঠক নিশ্চয়ই এই আলোচকের সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন যে এই ভাবনাটি তেমন নতুন কিছু নয়। শুধু তাই নয় এর প্রকাশেও তিনি সেরকম কোনো নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন নি, না ভাষায়, না ভঙ্গিতে। ফলত আমাদের হৃদয়ে তা কোনোপ্রকার করুণার আলোড়ন তুলতে ব্যর্থ হয়।

১৭.

'বৃষ্টি বন্দনা অথবা তার চোখে জল' কবিতা-টি (?) সম্পর্কে শুধু 'বৃষ্টির ফোঁটা চোখের জল মুছে ছিল– এই পঙ্‌ক্তিটির কথা উল্লেখ করা ছাড়া আর কোনো ইতিবাচক মন্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না বর্তমান আলোচকের পক্ষে। দুঃখিত।

১৮.

এটিএম বুথ-এর মতো একটি নিত্যদিনের নাগরিক অনুষঙ্গও যে কবিতার বিষয় হতে পারে সেটিই আমাদের জানিয়ে দেন 'এটিএম বুথ'-এর রচয়িতা। তবে আক্ষেপের ব্যাপার, এটি শুধু কবিতার বিষয় হিসেবেই থেকে গেছে, কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। উপসংহারে কবিকে হঠাৎ করেই অন্ত্যমিলমনস্ক হয়ে উঠতে দেখি, কিন্তু 'চিনে'-র সঙ্গে তিনি যে 'ছিনে' শব্দটির মিল দেন তার সঠিক অর্থটি উদ্ধার করতে না পারার কারণে এই মিলনসুখটুকু তেমন উপভোগ করা গেল না!

১৯.

'পাঠ' কবিতাটিকে বলা যেতে পারে এক ধরনের মনসুর হাল্লাজ বন্দনা, যদিও তা উপস্থাপিত হয়েছে খুবই সরলীকৃতভাবে। 'পাঠ' কবিতার এই হচ্ছে বর্তমান আলোচককৃত পাঠ। এই কবিতায় কবি অবশ্য আমাদেরকে একক পাঠে তৃপ্ত হতে বারণ করছেন, বলছেন, 'অতঃপর পাঠকেও পাঠ কর। / আরেকটি পাঠ। পাঠের ভেতরে পাঠ।' কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, 'পাঠ'-এর ভেতরে আর কোনো পাঠকেই খুঁজে পাওয়া গেল না!

২০.

'ডেন্টিস্টের চেম্বারে' একটি ভঙ্গিসর্বস্ব কবিতা। আপাতদৃষ্টিতে এর গায়ে বেশ চৌকস একটা ভাব লক্ষ করা গেলেও সেটি উপরিতলেই সীমাবদ্ধ, ভেতরে তার তেমন সারপদার্থ নেই। এ-কথা সত্য, যে-কোনো অপেক্ষাঘরেই প্রতীক্ষারত সময়টুকুতে আমাদের মনোজগতে নানা অসংলগ্ন এমনকি অসংগত ভাবনার আনাগোনা চলে। কবি সম্ভবত এই ব্যাপারটিকেই ধরতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়, কিন্তু তা স্রেফ বর্ণনার

মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ থেকে যায়, গভীরতর কোনো বোধের দিকে নিয়ে যায় না আমাদের। কেননা এই কবিতায় কবি আমাদের ভোলাতে চেয়েছেন ভাব দিয়ে নয়, ভঙ্গি দিয়ে; যার পরিণাম এমনটিই হতে বাধ্য।

২১.

'বঙ্গোপসাগরের প্রতি' কবিতাটিকে দেখা যেতে পারে মানবিক মূল্যবোধের জয়গান এবং সহজ, সরল জীবনের প্রতি কবির অকৃত্রিম আকুতি হিসাবে। বিষয় হিসেবে এটিও অবশ্য বহুচর্চিত। এ-কবির কাব্যভাষায়ও আমরা সেইসব পূর্বতন কবি ও কবিতার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই বেশি। এটা সত্য যে তাঁর নিজস্ব কাব্যকণ্ঠ এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি, তবে 'এখন আমরা গাছ হব / রোদ এসে জিরোবে তার পত্র-পল্লবে/ সমুদ্র হব– রহস্য তৈরি হবে সাগর ঘিরে/ সাগরের প্রাণী শঙ্খকে ঘিরে তৈরি হবে/ শাঁখা ও সধবার মিথ–' পড়ে আমাদের আশা জাগে যে হয়তো এর জন্য আমাদের প্রতীক্ষা তেমন প্রলম্বিত না-ও হতে পারে।

কবিতার আলোচনা: দুই/ মুজিব মেহদী

একযাত্রা একুশ বন্দরে

একুশজন কবির একুশটি কবিতা পড়ে, কবিনামহীন, রীতিমতো ফাঁপরে পড়ে গেছি যেন। আমরা সাধারণত কপালে কবিনামের তিলক পরেই কবিতা পড়ে অভ্যস্ত। সে অভ্যস্ততাটা একটু ঝাঁকি খায় নাম জানা না-থাকলে। অবশ্য এটা না-মেনে উপায় নেই যে, নামপ্রভাবটা পাঠ ও মূল্যায়নের ওপরে যে শাসন জারি রাখে, এ প্রক্রিয়ায় সেটা কাটিয়ে উঠবার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। চিন্তাটা যে আমার কাছে পুরোপুরি নতুন, তা নয়। আমরা কজন একবার এরকম করে ভেবেছিলাম, ছিয়ানব্বইয়ে। শতাব্দী কাদেরের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 'বিবিধ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিনাম ব্যতিরেকে বেশ কয়েকজনের কবিতা ছাপা হয়েছিল, সম্পাদকীয় আভাসসহ। ভাবা ও বলা হয়েছিল যে, পত্রালাপের মাধ্যমে লেখাগুলো সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাবে তা কবিনামসহ পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে। যাতে নামপ্রভাবের ঊর্ধ্বে খাঁটি মতটুকু, প্রতিটি লেখার, হাজির করা যায়। কিন্তু প্রকল্পটা উৎসাহ ও প্রশ্রয় যতটা পেয়েছিল, নিরুৎসাহ ও নিন্দা পেয়েছিল তার চেয়ে ঢের বেশি। তীব্র আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়েছিল, মুদ্রিত বর্ষীয়ানদের দ্বারা। তাছাড়া, চিঠিপত্রের ওপরে যতটা ভরসা করা গিয়েছিল, ততটা আশ্বস্ত করেনি তা। জেলাপর্যায়েও ততদিনে পত্রপ্রথায় ভাটা

পড়তে লেগেছে। কাজেই 'বিবিধ'-এর ওই উদ্যোগেও তখনই ভাটা পড়ে। ওর শেষকৃত্যও আর সম্পন্ন করা যায়নি। 'গোলাঘর'-এর এ-সংক্রান্ত আয়োজন সে বিবেচনায় অনেক পরিণত ও স্বস্তিদায়ক। অনিশ্চিত আশ্বাস না-দিয়ে নগদানগদি একটা সংগঠিত মত কবিতাগুলোর সঙ্গে হাজির করবার চেষ্টা আছে এখানে। তদুপরি, আলোচক হিসেবে আমার এই কবিতাগুলো নামহীন পড়তে হলেও পাঠক ও লেখকগণ এখানে নামসহই লেখাগুলো পড়তে পারবেন। তত্ত্বীয়ভাবে তাই ব্যাপারটা আমার কাছে মোটের ওপর মন-সহনীয়।

কিন্তু ব্যবহারিকভাবে দেখলে এ আয়োজনের মন্দ দিকও শনাক্ত করা যায়। প্রথমত, কবিতাগুলো সম্পর্কে এতে মাত্র একজন পাঠকের বিবেচনারই প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে, যা হাজির করা হবে একটা প্রতিনিধিত্বশীল মত হিসেবে, সম্ভাব্য মতের মেধাগত খামতিটুকুসহ। এক অর্থে এটা উন্মুক্তভাবে কবিতাগুলো উপভোগে বৃহত্তর পাঠকের সামনে একটা বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে; এমনকি কারো কারো বিরক্তিও উৎপাদন করতে পারে। অন্য অর্থে, এটা মোটেই কোনো সমস্যা নয়, বরং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখাগুলোর মেরিট যাচাই করবার ব্যাপারে পাঠকদের এটি প্রণোদিতও করতে পারে। সেটা কবিতাগুলোর জন্যেই ভালো। তাছাড়া, শিল্পমত বস্তুতপক্ষে ব্যক্তিকই হয়। নির্দ্বিধায় এরকম ব্যক্তিক মতপ্রকাশের পক্ষে দাঁড়ানো যায়। কেবল এ কিস্তির আয়োজনে আমার যা একটু সংশয় থেকে যাচ্ছে, সেটা নিজে মতপ্রদানকারীর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বলে। দুজন হলে কী হত, তিনজন? দেখা যেত যে, মতগুলো বদলে যাচ্ছে, জনে জনে। এর চেয়ে বেশি সংখ্যক হলেও বদলাত নিশ্চিত। এই বদলটাই সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যের। প্রতি ক্ষেত্রেই মতপ্রদানকারীর জানাবোঝা, বিষয় সম্পর্কে দখল, শিল্পবস্তু আস্বাদনের (এখানে কবিতা পড়বার) পূর্ব অভিজ্ঞতা, দেখবার ও বলবার দক্ষতা, প্রকাশকৌশল ইত্যাদি একটা বিশেষ মতের জন্ম দিতে পারত, যেটা অতি অবশ্যই হত অন্যটি থেকে আলাদা। ব্যাপারটা বেশ উত্তেজনাকর, সন্দেহ নেই। পাশাপাশি আমার পক্ষ থেকে উদ্বেগটা এখানে যে, যতই আমাকে কবিতাগুলো কবিনামহীন করে পড়তে দেয়া হোক না কেন, মতপ্রদানকারী হিসেবে আমার বেনামে কথা বলবার কোনো সুযোগ এখানে নেই! বেনামি আলোচকের মতগ্রহণ করবার মতো ঔদার্য্য শিল্পীমাত্রের না-ও থাকতে পারে। কাজেই, বক্তব্যের দায়টা মতপ্রদানকারী হিসেবে পুরোপুরি আমার কাঁধেই বর্তাবে। এটা একটা নিয়ন্ত্রণ-কাঠি, নৈরাজ্য ঠেকাবার। যা খুশি বলবার কোনো সুযোগ এখানে নেই, বলবার দরকারও নেই অবশ্য।

তবু, এ ধরনের বিবেচনার অনেকেই বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন, শিল্পকর্মের সঙ্গে শিল্পীকে (এখানে কবিতার সঙ্গে কবিকে) মিলিয়ে দেখলেই কেবল শিল্পবস্তুর প্রকৃত উৎকর্ষ/অপকর্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। শিল্পীবিহীন শিল্পকর্ম যেহেতু অসম্ভব, কাজেই শিল্পীসম্পর্ক বিচ্যুত করে করা শিল্পালোচনাও সম্পূর্ণাঙ্গ নয়।

লোকশিল্পকর্ম বিষয়ক আলোচনায় এ বিষয়ক অনুরক্তি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ধরা যাক কোনো একটা লোকগানের কথা, যার একক স্রষ্টার কথা জানা যায় না। এক্ষেত্রে গোটা একটা জনপদকে, তথা ওই নির্দিষ্ট জনপদের সকল মানুষকেই গানটির প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ স্রষ্টা হিসেবে ভাবা হয়। এ মতের মোটকথা হল স্রষ্টা একজন লাগবে, কাল্পনিক হলেও! নামপ্রভাবের সীমাবদ্ধতাসহই এ মত শিল্পকর্মকে দেখতে চায়। সেরকম করে দেখা অবশ্য মোটেই রহিত হচ্ছে না, একবার নামহীন করে দেখলেও। মুদ্রিত হবার পরে সে সুযোগটা অবারিতই থাকছে। তখনকার প্রেক্ষিতে, প্রথমবার মতপ্রদানকারী হিসেবে আমার বিবেচনাকে যাঁরা পুনর্বিবেচনা করবেন, তাঁদের ও আমার মধ্যকার সুবিধা-অসুবিধার পার্থক্যটা আমলে নেবার মতো। কারণ পরবর্তী বিবেচকগণ এটিসহ সকল লেখাকেই নামযুক্ত অবস্থায় পাবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মতের সাথে যুক্ত হবে লেখকদের নামের ওজন ও তাঁর তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক; নিদেনপক্ষে তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত অর্জিত ধারণা ও মিথ। ফলে তৈরি হবে প্রচুর ভিন্নমত। যদিও প্রতিবারই তা হবে ব্যক্তিরই মত। কিছু মত কিয়দংশে অন্যমতের কাছাকাছি হলেও তা সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরই মত। শিল্পবস্তুর গুণপনা মাপবার বাটখারা হিসেবে সংখ্যাগুরুর মতকে বিবেচনা করবার রেওয়াজ কোথাও নেই বলেই জানি। এটা মাপকাঠি হতে পারে মাত্র জনপ্রিয়তা মাপবার।

এইসব ভেবে তাকিয়ে আছি সাদা স্ক্রিনের দিকে। এরকম পরিসরে, কী আমার লিখবার আছে কবিতাগুলো নিয়ে, যা পাঠযোগ্য! আমি কি মিশে যেতে পেরেছি এখানকার সব উচ্চারণের সাথে? আমি কি চিনেছি আলোচ্য কবিতাসমূহে অঙ্কিত সব পথঘাট? চিনি নি। আরো বারকয় হেঁটে এলেও ওপথ ধরে, হয়তো ঠিক পুরোটা চেনা হবে না, বলাই বাহুল্য। এজন্যেও উদাস এই দৃষ্টিক্ষেপ, সম্ভবত। আবার এ-ও তো ঠিক যে, প্রথম যাত্রায়ই এখানকার কোনো কোনো পঙক্তির পাখসাটে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ভেতর থেকে জেগে উঠেছে এক অসংজ্ঞায়িত ভালোলাগাবোধ। অচেনা সুন্দরীর প্রতি কি মুগ্ধতা জাগতে নেই? খুবই আছে। কিন্তু মুশকিল হল, মুগ্ধতা মুগ্ধতাই, মুগ্ধতার প্রকাশ কখনো সমালোচনা নামধেয় নয়। এ খুবই যুক্তিনিরপেক্ষ। সমালোচনাকে হতে হয় যুক্তিপূর্ণ (এবং কমবেশি সর্বজনীন!)। তাছাড়া আমি মুগ্ধতা প্রকাশে নয়, সমালোচনার জন্যেই অনুরোধ্য। 'ভালো লাগল', 'অসাধারণ', 'চমৎকার'– এগুলো মুগ্ধতার ভাষা, সমালোচনার নয়। সমালোচনার প্রশ্নে ভালোলাগা-মন্দলাগাকে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, যথাযথভাবে। অন্তত মুগ্ধতা কিংবা বিরক্তি কর্তৃক উৎপাদিত অনুভূতির দিকে তাক করা একটা 'কেন?' প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হয়। সন্দেহ নেই, কাজটা বিশেষভাবে কঠিন। পাশাপাশি এক্ষেত্রে নিজের অযোগ্যতাটাও একটা বড়ো বাধা। এটা লুকোবার কোনো সুযোগ নেই, কেননা এ স্বয়ম্প্রকাশিত। কাজেই নির্মোহ ভঙ্গিতে কবিতার সত্য খুঁজে, নিজের জানাবোঝা যদি কিছু থাকে তার সাপেক্ষে কবিতাগুলোর রঙরেখাবলি ও ইঙ্গিতের বোধসঞ্চারণ শক্তির মাত্রা নির্ণয় করে বোধগম্য ছবি আঁকবার প্রয়াস করাই

মূল কাজ, এখানে। এ লক্ষ্যে কবিতাগুলোর ভিতর দিয়ে সংজ্ঞা-সন্ধানার্থে সংঘটিতব্য আমার পরবর্তী প্রব্রজ্যাগুলোর গুণ-মানই ঠিক করে দেবে আমার দেখন-লেখন-অঙ্কনের ভালোমন্দ। পাঠক ও লেখকদের মধ্যকার যাঁরা আখেরে আমার এই ইন্টারপ্রিটেশনকে নিতেই পারবেন না, তাঁদের কাছে দশাসই একটা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কবিতাগুলোর চোখে চোখ রেখে বরং শুরুই করা যাক আমার **ভাবনাচিন্তাকথার সংক্ষেপনঃ**

১.

নৈমিত্তিক ঘটনাবলি নিয়ে মানুষের মধ্যে সাধারণত বিশেষ কোনো সন্দেহ, সংশয়, প্রশ্ন ইত্যাদি থাকে না। কিন্তু যা দৈবাৎ, মাঝেমধ্যে, কখনোসখনো সংঘটিত হয়, তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল সহজাত। **মানুষ সর্বদা যদি** এই প্রশ্নটিকেই সামনে এনেছে যে, যা অনিয়মিতভাবে ঘটে, তাই-ই যদি নিয়মিত ঘটত তবে কি মানুষ তাকে সন্দেহ করত? আসলে প্রশ্নে থেমে থাকে নি লেখাটিতে। জিজ্ঞাসাহীন জোড়াপ্রশ্নে একটা চোরা জবাবের অস্তিত্বও পাঞ্চ করা আছে যে, 'করত না'। সেক্ষেত্রে এখন যা পাপ বলে চিহ্নিত, তাকে কেউ পাপ বলে মনে করত না, কিংবা পুণ্যকে পুণ্য। এই সত্যটি প্রতিষ্ঠার অধিক এ লেখায় আর কোনো ব্যঞ্জনা সহজলভ্য নয় মনে হল। মুক্তক অক্ষরবৃত্তে রচিত এ লেখার আভাসাত্মক অলংকারের প্রয়োগ দৃষ্টি কাড়ে।

২.

একটি ক্ষুরধার সন্দেহকে মিথ্যা করে দিয়ে জন্মপ্রাপ্ত একটি দেশের (এখানে বাংলাদেশ) ইতিহাসের নানা আলো-আঁধারি, উত্থান-পতনের সঙ্গে মিলেমিশে একজন মানুষের জন্ম থেকে শৈশব-কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য যাপনের ক্রমবর্ণনার মাধ্যমে পরিণতি পেয়েছে **অঙ্গার**। যার মাধ্যমে মানুষটি হয়ে উঠেছে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার দ্রষ্টা, ইতিহাসের সাক্ষী। এই একজন মানুষের বিলয় মানে যেন ইতিহাসেরই এক ধরনের প্রয়াণ। এই বোধটিরই দারুণ কাব্যিক উপস্থাপন দিয়ে শেষ হয়েছে কবিতাটি– 'আমার মৃত্যু পৃথিবীর শেষতম/সত্যের অঙ্গার...'। এই সরল ও বাহ্য অর্থের পাশাপাশি লেখাটির এই নিহিতার্থ সরবরাহ করবার ক্ষমতাও মনে আসে যে, এখানে উপস্থিত 'আমি'টি আসলে একজন কোনো মানুষ নয়, বরং দেশই স্বয়ং। এই ব্যঞ্জনা লেখাটির কবিতাত্ব প্রগাঢ় করেছে বলে মনে হয়।

৩.

একটা সমর্পিত ঢঙে ছন্দ ও আঙ্গিক সচেতনতার সুফল নিয়ে বিকশিত হয়েছে **তুমি যদি**। দেশ, জাতীয় চেতনা, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, প্রেম-কাম একাকার হয়ে গেছে ছোট্ট এ লেখাটিতে। এ লেখার 'তুমি' কাজেই কোনো গৎ-এর পাল্লায় পড়েনি, বরং তা ধারণ

করেছে বিবিধ ব্যঞ্জনা, যদিও নামটি প্রথমে সে আশঙ্কাই জাগায়। চিত্রময়তা নয়, বরং চিত্রকল্পে ঋদ্ধ এ কবিতাটির সৃজনসৌন্দর্য ও সুমিতি মনোযোগ কাড়ে।

৪.

বলার ধরনে মনে হয় যে, **তখনও মানুষ ছিল পৃথিবীতে কোনও জাতিসংঘ ছিল না** নামক রচনায় একটা গল্প থেকে গেলেও যেতে পারে; কিন্তু না, থকথকে কোনো গল্প এখানে নেই, আছে কিছু ছিন্নসূত্র মাত্র, মহা থেকে সমকালের। বিষয়গতভাবে লেখাটির বৃহৎ বিস্তার, ভূগোলে ও চিন্তায়। ভিড় করে আছে চূর্ণ চূর্ণ অজস্র চোখ, পুরাণ থেকে সাম্প্রত বেদনা পর্যন্ত। সব মিলিয়ে লেখাটি বিশ্বায়ন, পণ্যায়ন, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে চায়। ব্যাজস্তুতি বা সূক্ষ্মব্যঙ্গচ্ছলে কবি বলেন যদিও যে, 'মানবতা নস্যিমাত্র, নাকে গুঁজে নিদ্রা যেতে পার'। আসলে তিনি উলটোটাই বোঝাতে চান, তা নইলে এই লেখনপ্রয়াস দরকারিই হত না। অক্ষরবৃত্ত চালে এগিয়েছে কবিতাটি, আরো সুনির্দিষ্টভাবে এটির যতি নির্দিষ্ট চৌদ্দ ও আঠার মাত্রার পয়ারে, কিন্তু পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের ঝোঁক মহা-মহাপয়ারের দিকে। এখানে 'টোডাকন্যা'দের পোশাক প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 'বসন-প্রহরা' শব্দবন্ধটা অব্যর্থ, কিন্তু তথ্য হিসেবে দেখলে একটু বিভ্রান্ত হতে হয়। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরির বাসিন্দা টোডা নারীরা বরাবরই তাদের শরীর ঢেকে রাখে, এক কাপড়ে যদিও। অবশ্য স্বীকার্য যে, কবিতা বস্তুটা মোটেই তথ্যের জন্যে নয়।

৫.

ভাবছন্দে জীবনাভিজ্ঞতার একটা সরল বয়ানে **একজন ক্রীতদাস ও একটি গাধার কাহিনী**তে জীবনের তাৎপর্য সন্ধানের প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অর্থ, কীর্তি, যশ, সচ্ছলতার অধিক রক্তের ভিতরে যে আরো এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করার কথা বলেছিলেন একদা জীবনানন্দ দাশ, এখানেও যেন সেই আর্তিটি একভাবে ধ্বনিত-রণিত। এ লেখার নায়ক (!) সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে সফল হবার পরও মানসিকভাবে ব্যর্থ হিসেবে চিত্রিত, যা নিয়ে মূর্ত হয়েছে হাহাকার। অতিশয়োক্তির অধিক অলংকারহীন, প্রায়-নিরাভরণ ঢঙে অনেকটা লোকজ্ঞানের স্ফূর্তি নিয়ে অভিজ্ঞতারা উপস্থিত হয়েছে এখানে। জীবনের অনেকটা পথ পেরোবার পর স্বমূল্যায়ন ছলে পেছন ফিরে দেখার এক শিল্পিত দুঃসাহস এটি; যার ভিতর দিয়ে জীবনদর্শনটা স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। কবিতাটি একটি অবশ্যম্ভাবী বিষণ্নতার জন্ম দেয়, যা ধারণ করে আছে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাও।

৬.

চোখ মেলো নামক লেখাটি সামাজিক-লৈঙ্গিক রাজনীতি বিষয়ে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর মধ্যকার বাঘ-হরিণমার্কা বিষম সম্পর্কটিই এতে চিত্রিত হয়ে উঠেছে। ভোগলিপ্সায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত পুরুষসমাজ যাপন-পরিসরের সর্বত্র থাবা বিস্তার করে আছে। ভোগপ্রশ্নে তারা সদাই প্রস্তুত। এ এমনই এক প্রস্তুতি যেখানে শিকার ধরায় কোনো বাছবিচার নেই। প্রচলিত সমাজের এ এক ব্যাধি, সকলেই জানে। এখানে দাঁড়িয়ে লেখক নারীসমাজকে 'ভীতু নারী' বলে সম্বোধন করে আগের বিবৃতিকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। ভয় পাইয়ে দেবার সব আয়োজন সম্পন্ন করে রেখে, যাকে ঘিরে এ ভয়ংকর আয়োজন তাকে 'ভীত' ভাবা সত্যের অপলাপ মাত্র। লেখাটি শেষ হয় বক্তৃতামঞ্চের উপদেশের মতো– 'সুতরাং আর দেরি নয় জেগে উঠো নারী' বলে, যার সঙ্গে যুক্ত আছে 'ঘুমন্ত অগ্নিগিরির মতো' ক্লিশে উপমা। অবশ্য '৭১-এর বাঙালি জাতি'র জেগে ওঠাকে এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখাকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও যথাযথ বলে মনে হয়। লেখাটিতে পুরাণের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে।

৭.

যমজের দ্বন্দ্ব-সখ্য নামক দ্বিধাময় এই রচনায় জীবন ও মরণ এবং এ দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কবির ভাবনা বিকশিত হয়েছে। রচনাটিতে এ উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে যে, মানুষ খুবই সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ; কারণ তারা আজঅবধি মৃত্যুর গভীর রহস্যটা উন্মোচন করতে পারেনি। এমনকি প্রকৃতিজগতের আর সব বিস্ময়ও এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। লেখাটির 'খ' অংশে এরূপ দার্শনিকতা মূর্ত হয়েছে যে, এই দুই সত্য পরস্পরের মধ্যে একটা সংঘাতপূর্ণ অবস্থানেই টিকে রইল, সমঝোতার দিকে না-এগিয়ে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, জীবন ও মরণের 'একসঙ্গে তিষ্ঠনোর ইতিহাস'টিই একটি উৎকৃষ্ট সমঝোতা। কিন্তু এ প্রশ্নে একের প্রভাবের কাছে অন্যের পরাভূত হয়ে যাবার মতো ভারসাম্যহীন একটা অবস্থার প্রতিই যেন এ লেখার সমর্থন। সমঝোতা মানে কি এই-ই হওয়া উচিত, কখনো, অন্তত জীবন-মরণ প্রশ্নে? লেখাটি পড়ে প্রসঙ্গত এসব ভাবনা জাগে মনে। লেখাটির বাক্যবিন্যাসে পরীক্ষানিরীক্ষার ছাপ স্পষ্ট, যদিও এর প্রাসঙ্গিকতা মোটমাট অপ্রতীয়মানই থাকে।

৮.

সন্ধ্যা ও রাতের মাঝখানে কী আর এমন ফারাক, সময়ের? বিকেল ও সন্ধ্যার মাঝখানটাকে আমরা গোধূলি বলে চিনি, কিন্তু সন্ধ্যা ও রাতের মাঝখানটা এতই অবিশেষ যে, একে আলাদাভাবে নামায়িত পর্যন্ত করা হয়নি বাংলা ভাষায়। তবে আরবি ভাষায় 'এশা' নামক একটা ক্ষণ আছে, যা দিয়ে রাত্রির প্রথমভাগকে বোঝায়। অর্থাৎ এশা হল সন্ধ্যা ও রাতের মাঝখানকার সেই অসংজ্ঞায়িত ক্ষণ, যাকে এ লেখায়

বিশেষায়িত করে তোলা হয়েছে। স্বল্পকাল ব্যাপ্ত এক একাকী বেদনার অনুভূতি গভীর মগ্নতার আশ্রয়ে ডালপালা মেলে শোক-শোক একটা বিস্তার আদায় করে নিয়েছে এখানে। এ লেখার মুখ শোকভারাতুর হয়েও অতিশয় দীপ্র, উজ্জ্বল। প্রায়ই চোখ কেড়ে নেয় ক্যামেরার উপযোগী অতি পরিচিত বস্তুগত উপাদান। তৎসত্ত্বেও, এখানে শাসন যদি কোনো কিছুর থেকে থাকে তো তা মনের, চোখের নয়। চোখ এখানে জন্ম দিয়ে গেছে কেবলই ভ্রম, যা কিনা প্রার্থিতই, কবিতায়। আর এ ভ্রমকে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে শব্দ ও বাক্যে রচিত পরিবেশ, তার আনুকূল্য।

৯.

একদা প্রাণচঞ্চল অধুনা উজাড় হয়ে যাওয়া একটা বসতবাড়ির এক/দুই পুরুষ দীর্ঘ একটি গল্পের আনুপূর্বিক বয়ান ধৃত হয়েছে **শূন্য ভিটেয়**। খাঁ-খাঁ সেই শূন্যতাকে যে ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা ক্লিশে ও গাদ্যিক। শব্দের অমিতব্যয়-প্রবণতাকে এখানে মাঝেমধ্যেই দাঁত বের করে হাসতে দেখা যায়! এ লেখা না-বলা দিয়ে প্রায় কিছুই বোঝাতে চায় না, যে কারণে শব্দের অধিক কোনো শব্দহীনতা কিংবা নৈঃশব্দ্য এর ভিতরবাড়ি তো দূর অস্ত বাহির বাড়িতেও স্থান পায়নি। কষ্ট বলে কষ্ট বোঝানো যে কবিতা নির্মাণের জন্য কোনো উৎকৃষ্ট পন্থা নয়, এ জানাবোঝার একটা বেআমল এ লেখায় উৎকটভাবে বাঙ্ময়।

১০.

উত্তীর্ণ কবিতাগুলো প্রায়ই জন্মায় বিষণ্নতার বাড়িতে– প্রচলিত এই ধারণার দিকে আবারও সমীহের সাথে ফিরে তাকাতে হয় **মা** কবিতাটি পড়ে। যেরকম ঘোরে গ্রস্ত হলে একটি লেখাকে মগ্নতার শিলালিপি নামে ডাকা যায়, যে বিস্তৃত রহস্য সৃজিত হলে তাকে আবিষ্কারে সে লেখার দিকে বারেবারে ফিরে আসতে হয়, এ লেখা যেন সেরকমই এক শাসন কায়েম করে রেখেছে তার শরীরে। অথচ বিষয়ে এ মৃত্যুবার্তাবাহী, হারানোর মর্মধারী। বিষাদ-লাগোয়া কবিতাপাগল এক স্বজনের নিতান্ত কবিতাগ্রস্ততার প্রমাণ লভ্য এখানে, যে গ্রস্ততার বলে এখানে পানীয় জল, অশ্রু এমনকি প্রয়াত মা স্বয়ং কবিতারই অন্য নাম হয়ে উঠেছে। লেখাটিতে ব্যবহৃত 'আলোর ছোবল', 'মেঘলিপ্ত সম্ভাবনা', 'জলমর্ম', 'গার্হস্থ্য-বন' শব্দবন্ধগুলোর প্রতিটিই যথাযথ ও প্রয়োগসফল। বায়েজিদ বোস্তামির মিথটিও এখানে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। আগাগোড়াই কবিতাটির গতি স্বচ্ছন্দ, কেবল 'এছাড়া স্বীকার করছি... এখানে খারিজ হয়ে যায়নি' অংশ বাদে। স্রেফ শব্দবিন্যাসগত কারণে এ অংশের গতি শ্লথ, গদ্যের দিকে ঈষৎ হেলানো।

১১.

সম্পাদক-এ ব্যঙ্গচ্ছলে শিল্পসাহিত্য জগতে বিদ্যমান গোষ্ঠীবাদী কূট/অপ-রাজনীতির আনুপূর্ব তুলে আনা হয়েছে। ক্ষমতার আসন কব্জা করে চাটুকার পরিবৃত হয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ব্যাঙকে সাপ ও বেড়ালকে বাঘ করে দেখানো, অতি উচ্চম্মন্যতা, এজেন্সি বিক্রি, সম্মান ও খেতাব আদায় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দেবার যে সংস্কৃতি সাহিত্যের আড়তদারদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তার একটা ভাষিক ডকুমেন্টেশন এই রচনা। পুরো লেখাটি ১৪ মাত্রার পয়ারে রচিত, তবে দ্বাত্রিংশতিতম লাইনের 'কী যে'র ২ মাত্রা নিতান্তই অনর্থক ব্যতিক্রম। পুথির সুরে পড়া যায় লেখাটি। যমক অলংকারের একটা অসামান্য ব্যবহার লক্ষণীয় এখানে (এইমতো *ভাবে* আর *ভাবে* থাকে খুব)। একাধটা (হ্রী ও সিঁড়ি) বাদ দিয়ে কবিতাটির অন্তঃমিলগুলোর প্রায় সবই উৎরে গেছে।

১২.

আত্মসত্তার একটা বিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে শুরু হওয়া **সিজোফ্রেনিয়া** জানান দেয় যে, তা নতুন সম্ভাবনার দিকেই ধাবিত। ওই ধাবনপর্যায়ে সঠিক পথ নির্বাচনের যোগ্যতা ও চেতনাও রহিত হয় না পথিকের। উল্লিখনের মাধ্যমে যে দার্শনিক সত্যকে হাজির করা হয় এখানে, তা ওই সচেতনতারই পরিচায়ক। এতদসত্ত্বেও, একটা গ্রহণান্ধকার আর দহনছাইয়ের মুখোমুখি হতে হয় তাকে; আর শেষ পরিণতিতে সমীপবর্তী হতে হয় সুফিসুলভ আধ্যাত্মিকতার। এভাবে, একটা অ্যাম্বিগিউয়িটি বা কূটব্যঞ্জনা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এতে, যা রহস্য সৃজন করে লেখাটিকে কবিতার দিকে নিয়ে গেছে আর পাঠকের জন্য রেখে গেছে ছেঁড়া ছেঁড়া ধাঁধার জোগান।

১৩.

বিপরবাসনারঞ্জিত **বাংলাদেশ গর্ভবতী হচ্ছে**-তে মানুষের চেয়ে মানুষের চুরচুর স্বপ্ন ও সম্ভাবনাই বড়ো হয়ে ওঠে। কবি স্বয়ং একজন অপ্রাতিষ্ঠানিক বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হয়ে সশরীরে উপস্থিত এখানে, যিনি মানুষকে কমিউনিকেট করেন বিপ্লব উসকে দেবার মন্ত্র সরবরাহ করার মাধ্যমে; যে বিপ্লব, ধারণা করা হয়েছে, দুদিন আগে-পরে নিশ্চিত করবে কথিত সমাজবদল! বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতিদৃষ্টে বাস্তবত এটাকে যত দূরভাষই মনে হোক, অতিশয় নিচুস্বরে লেখাটির শরীর জুড়ে একটা আস্থা রোপণ করে রাখা আছে দেখা যায়। এই সরল আস্থাটি আলোচ্য কবিতার একটা শক্তি হিসেবেই উপস্থিত, যেন।

১৪.

শব্দ অথবা বাক্য নামক রচনাটি কবিতাযজ্ঞ ও তার যজ্ঞাস্ত্র বা উপচার নিয়ে। যজ্ঞাস্ত্র হলেই-যে যজ্ঞ হয় না, বরং তার জন্য যে লাগে বিস্তৃত প্রয়োগধারণা ও শাসন, এসব নিয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী এ রচনার সংসার। কবিতায় মিথ্যার (কল্পনার) চিরপ্রবেশাধিকার স্বীকৃত, কিন্তু ওরও মাত্রাগত ব্যাপারস্যাপার নিয়ে কবিকে ভাবিত হতে হয়। ওই ভাবনার একটা রূপরেখাও এ লেখায় ধৃত হয়ে আছে, সতর্কভাবে। একটা চিরক্লিশে দিয়ে শুরু হয়ে ক্রমশ কবিতাটি কবির কাছ থেকে নিজস্ব রূপরং আদায় করে নিয়ে আনন্দপ্রসাদ বিতরণে মেতেছে, দেখা যায়।

১৫.

আপাতসরল, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এক বন্ধুর পথে যাত্রা করতে হয় 'দ্বন্দ্ব'-এর পাঠককে। বাঘ ও হরিণের চিরবৈরী একটা সম্পর্কের ফাঁদ পাতা এ ভুবনে ক্ষণে ক্ষণেই বড়ো বড়ো খাদের সামনে গিয়ে দুশ্চিন্তিত হয়ে দাঁড়াতে হয়, যে খাদগুলো হয়তো প্রাকৃতিক (স্বতঃস্ফূর্ত) নয়, বানানো। একটা বিভ্রমে ঠেলে দেবার আনন্দ থেকে উৎসারিত কূটস্পৃহাজাত। প্রথমে মনে হয় লক্ষযোগ্য নৈকট্য আছে, কিন্তু পরক্ষণে বোঝা যায় যে, তা নয়। অথচ লক্ষণীয় যে, একটি খাদ থেকে অন্য খাদের দূরত্ব ঘিরে রচিত যে পথ (বাক্য), তার প্রায় প্রতিটিই সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুমিত স্বভাব। যেজন্য এই প্রায়অবোধ্য ভ্রমণাভিজ্ঞতা নিয়েও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এর দিকে কাতর অভিব্যক্তিসহ তাকিয়ে থাকাতেও যেন একটা সুখ-সুখ অনুভূতি হয়।

১৬.

কবিতার বিষয় হিসেবে মৃত্যু, মৃত্যুসম্ভাবনা, মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যুশোক প্রভৃতি যুগপৎ ক্লিশে ও চিরপ্রাসঙ্গিক। এই দোলাচলের মধ্যেও যুগে যুগে দেশে দেশে এই রঙে রেঙেছে সহস্র কবিতা, রাঙবে আরোও। প্রচুর সম্ভাবনা যুক্ত হয়েও প্রতিবারই এ বিষয়ক কবিতাকে হাঁটতে হয়েছে ও হয় ঝুঁকিসীমায় পা ফেলে-ফেলে। প্রতিদিন প্রাসঙ্গিক বলে প্রতিবারই তাকে গৎ-এর বাইরে নতুনভাবে মূর্ত হতে হয়, বলনকেতা ও শৈলীসৌকর্যে। **হলুদ প্রেতছায়া**কে এসব বিবেচনায় ঝুঁকি-সন্নিহিত কেবল হা-হুতাশই মনে হতে পারত, যদি-না মৃত্যুসন্ধিক্ষণে চিরপথিকের প্রতি জীবিতদের নিষ্ঠুর আচরণের চিরন্তনতাটা এখানে অঙ্কিত হত। এই বিশেষ কারণে রচনাটি কিছু স্পর্শকাতরতা ধরলেও সামগ্রিক কথাবস্ত্রের মলিনতা একে উজ্জ্বল রচনা হয়ে উঠবার অবকাশ দেয়নি।

১৭.

বৃষ্টি বন্দনা অথবা তার চোখে জল রচনাটিকে একটি প্রেমের কবিতা লিখবার প্রয়াস হিসেবে পাঠ করা যায়। একটা বিশেষ বৃষ্টির বর্ণনা আছে লেখাটিতে, যা নির্দিষ্ট প্রেমিকার হাত ভিজিয়ে দিয়েছে। লেখাসূত্রে প্রকাশ পায় যে, সে বৃষ্টি এমনকি শহরে বান পর্যন্ত ডেকে এনেছে। এটিকে শেষপর্যন্ত একটি অতিবয়ান হিসেবেই পাঠ করতে হয়, যেহেতু শেষ বিকেলের সবুজ ঘাস আনন্দেরই কারণ হয়েছে। এখানে হাত ভিজানোর কাজটি কি অশ্রুর, নাকি প্রকৃতই বৃষ্টির, আর বৃষ্টির হলে ওই বৃষ্টি প্রেমিকার চোখের জল মুছে দিয়েছিল কি না– এই অবিশেষ প্রশ্নরহস্য সৃজন পর্যন্ত এ লেখার দৌড়, যা বিশেষ কোনো সম্পন্ন বোধের সামনে নিয়ে পাঠককে দাঁড় করায় না। খুব ছোট আয়তনের এ লেখায় ছয়-ছয়টি বাক্যের শেষে 'ছিল' ক্রিয়ার বিশেষত্বহীন সাধারণ প্রয়োগ লেখাটির একটি উল্লেখযোগ্যরকম দুর্বল দিক।

১৮.

বাংলাদেশে **এটিএম বুথ** ব্যাপারটা একটা সাম্প্রতিক প্রপঞ্চ। তবে ইতোমধ্যে এটিএম কার্ডকে স্ট্যাটাস সিম্বল বা আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে চিনে নিয়েছে সবাই, অন্তত শিক্ষিত শহুরেজন। লেখাটিতে এটিএম বুথকে বহুগামী বারবণিতার মতো করে আঁকা হয়েছে, যাতে বস্তুতে সঞ্চারিত হয়েছে উচ্ছল এক প্রাণ। যার সক্ষমতা আছে (এখানে সক্ষমতা মানে কার্ড থাকা, আর কার্ড থাকা মানে অর্থের নিশ্চয়তা থাকা), এটিএম বুথ বাছবিচারহীনভাবে তার সাথেই শোয়! কাজেই 'কারো কোনো স্পর্শে তার নেই অসম্মতি' খুবই যথার্থ চিত্রায়ণ। কিন্তু একই লেখায় একই বস্তুকে লেখক উলটো চরিত্রটিও দিয়েছেন : 'স্পর্শে হয়তো দেন অনেক তবে মুখ চিনে-চিনে'। স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধিতা এটি। কবি কি এখানে 'মুখ থাকে না ছিনে...'র মতো অন্তঃমিলের প্ররোচনার শিকার হয়েছেন? হবেনও-বা।

১৯.

পাঠ-এর অনুজ্ঞাজ্ঞাপক বাক্যশাসন যে পাঠপ্রবর্তনের কথা বলে, তা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসমূহের বিবেচনায় ধর্মদ্রোহ, যা মারেফাত বা ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে প্রসারিত। সুনির্দিষ্টভাবে 'আয়নাল হক' বা 'আমিই সত্য' ধারণাটি মরমি সুফি মতাদর্শ এবং ভারতবর্ষীয় সহজিয়া ও বাউল মতবাদ দ্বারা চর্চিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ মতাদর্শের বিশেষ কদর আছে। লেখাটি স্বচেষ্টায়, প্রকৃতিপাঠের মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট ভাবনা-বিশ্বাসের দিকে যাত্রায় প্রণোদিত করতে চায়। এটি বলতে চায় যে, প্রকৃতিকে উপর্যুপরি পাঠের ভিতর দিয়ে মানুষের পক্ষে এমন ধারণায় উন্নীত হওয়া সম্ভব, যেদিকে

গেলে 'মানুষ থুইয়া খোদা ভজনা' করার দরকারই হয় না। বর্তমান সময়ে মনসুর হাল্লাজের মতো শরিয়তবিরোধী বিপ্লবী সুফির উপস্থিতির প্রাসঙ্গিকতা দেখানো হয়েছে লেখাটিতে, যখন শরিয়তী ভুলব্যাখ্যা ইসলামকে আত্মসত্তা বিকাশের পন্থা হিসেবে দেখবার পরিবর্তে আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে পরিণত করে তুলবার দিকে মনোযোগী হয়ে উঠেছে। লেখাটির বিষয়গত অভিপ্রায় স্পষ্ট; পাশাপাশি কবিতার দাবি যে এখানে খানিকটা উপেক্ষণীয় থেকেছে তা-ও কমবেশি স্পষ্ট।

২০.

খুব নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, তোবড়ানো কাগজটির মধ্যে কী এমন বস্তু ছিল, যাকে **ডেন্টিস্টের চেম্বারে** নামক রচনার মূলরহস্য হিসেবে দানাবাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। সে কি একটি বিকল আধভাঙা দাঁত? একটি ভুল প্রেসক্রিপশন? কিন্তু যা কিছুই হোক, তার সঙ্গে মেয়েটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। কারণ মেয়েটি এখানে নার্ভাস, যে নোখে দাঁত খুটছে (দাঁতের ডাক্তারের সামনে দাঁতের এহেন অপব্যবহারটা কৌতূহলোদ্দীপক; যদিও এটা স্পষ্ট যে, ছবিটা ব্যবহৃত হয়েছে উদ্বেগ বোঝাতে)। কিন্তু এ দুটো সম্ভাবনার কোনোটির ক্ষেত্রেই মেয়েটির নার্ভাস হবার কথা নয়। কিংবা কালো কাকেরও এজন্য বিপন্ন হবার কোনো কারণ নেই, যদি কালো কাককে ডেন্টিস্টের প্রতীক ভেবে নেই। এসব আলামত শেষপর্যন্ত 'আমি' প্রতীকে উপস্থিত সামাজিক মানুষটির দৃষ্টিতে ওখানে একটি অপকর্ম (!) সংঘটনেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যে রহস্য তোবড়ানো কাগজটিতে একটি ব্যবহৃত '...'-এর অস্তিত্ব কল্পনা করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু কবিতার রহস্যোদ্ঘাটনের প্রশ্নে একজন যাকে স্পষ্ট সমাধান ভাবেন, অন্যজনের তা ভাবা মোটেই বাধ্যতামূলক কিছু নয়। এই যে নিরাময়হীন একটি জটিল সমস্যা তৈরি হয়েছে কবিতাটিতে, সেটি এর অন্যতম শক্তি। অবশ্য এ শক্তি কতটা মানবসহায়, কল্যাণবোধ-উসকানিয়া, শিল্পবোধ-জাগরুক; সে বিবেচনা বাকিই থেকে যায়।

২১.

উত্তম পুরুষে বর্ণিত **বঙ্গোপসাগরের প্রতি** রচনার কথক আত্মসমালোচনামুখর ও সমর্পিত, তবে এ সমর্পণ সম্ভবত ঈশ্বরের প্রতি নয়। একটা সরল, নির্বিরোধ, স্বাধীন জীবনের প্রত্যাশা মার খাওয়ায় মায়ের প্রতীক সমুদ্রকে সাক্ষী মেনে মৃত স্বপ্নবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে এতে। একটা শান্ত, নম্র ও বিষাদাত্মক স্বর দখল করে আছে গোটা লেখাটিকে। উল্লিখন (লোকগান থেকে– হরি নামে সুর বেঁধে দাও হে একতারায়; পুরাণ থেকে– সুলেমানি তরবারি, শাঁখা ও সধবার মিথ), ব্যক্তিত্বারোপণ (রোদ এসে জিরোবে তার পত্রপল্লবে), চিত্রকল্প (প্রাণ কেন পড়ে যাচ্ছে মুঠো উছলে), রূপক (তবু কেন স্লেজ-টানা কুকুর হয়ে উঠছি) অলংকারের সফল ব্যবহার দেখা যায় কবিতাটিতে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, আমার এই আলোকপাত, এখানে, একদমই ভাসা ভাসা। বোকামির নমুনায় ভরা হাস্যকর প্রচেষ্টাও হয়তো বলা যাবে একে। সেক্ষেত্রে একে ওরকমভাবেই গ্রহণ করে সক্ষমতা-উজ্জ্বল আরো এক বা একাধিক ভাষ্য এর পাশে তৈরি হোক। সব মিলিয়ে তখন কবিতাগুলো সম্পর্কে একটা পরিণত পাঠ প্রস্তুত হবার অবকাশই তৈরি হবে। তাই হোক, বরং তাই হোক।

র ম্য / প্র ব ন্ধ

আ ব দু শ শা কু র

.....

প্রসঙ্গ: রম্য রচনা

বাংলা 'নন্‌ফিকশনাল প্রোজ' কিংবা নকাল্পনিক গদ্যসাহিত্যের যে genre বা সংরূপটিকে 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বলা হয়, সেটি ব্যক্তিগত বটে তবে প্রবন্ধ নয়; রচনা। ওই ফর্ম অথবা রকমটিকে ব্যক্তিগত রচনা বলারও দরকার হয় না, ওটা শুধুই রচনা। লেখকের নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে অনির্দিষ্ট বিষয়ে মনোহরণ স্বগতকথনের জন্যই

treatise কিংবা প্রবন্ধ থেকে সৃষ্ট হয়েছে essay অথবা রচনা-নামক সম্মোহনী গদ্যরীতিটি। এটি সৃষ্টি করেছেন ফ্রান্সের মিশেল মঁতেইন (১৫৩৩-৯২) এবং নাম দিয়েছেন essai এসে– প্রয়াস অর্থে, প্রতিপাদ্য-নয় অর্থে। শব্দটির সমার্থ বাংলা প্রতিশব্দ রচনা।

যে-অর্থে রমণী করেন নিত্য তাঁর কবরীরচনা, পদ্যকার করেন কাল্পনিক তাঁর কাব্যরচনা– সে-অর্থেই গদ্যকার করেন নকাল্পনিক তাঁর সাহিত্যরচনা। সে-সাহিত্য যখন বিশেষ একটি সৃষ্টি কিংবা নির্মিতির রূপ পায়– তখনই তা হয়ে ওঠে রচনাসাহিত্য। গদ্যশিল্পের এ এক স্বতন্ত্র ঘরানা। প্রকারটিতে সৃজনধর্মী গদ্যশিল্পীর চিত্তবৃত্তি বিকাশের প্রয়াস থাকে– নানা ভাবের পরিসাজে, চিত্রবিচিত্র মেজাজে। লেখকের ব্যক্তিতাব্যঞ্জিত এই সব সাজ-মেজাজই রচনার অন্তরঙ্গে সৌকুমার্যের একটা ফল্গুধারা বইয়ে চলে।

ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে ঊনবিংশ শতক জুড়ে একদিকে হ্যাজলিট-আর্নল্ড-গোতিয়ে-ফ্রঁসদের প্রভাবে সাহিত্যিক সমীক্ষা, পুস্তক পর্যালোচনা ইত্যাদি ভারী উপজীব্য নিয়ে ব্যস্ত এসে ফের ট্রিটিজ কিংবা প্রবন্ধধর্মী তথ্য ও দৈর্ঘ্য নিয়ে ক্লান্তিকর হয়ে উঠলে, আরেকদিকে সাংবাদিক স্তম্ভকারের বস্তুধর্মী বয়ানের তারল্যে নিতান্ত পানসে হয়ে পড়লে– রচনাসাহিত্যের নানারকম শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটে, বিশেষ করে গত শতকের শেষ দশকে। এই প্রক্রিয়ায় familiar essay বা 'অন্তরঙ্গ রচনা'-নামক 'দিভের্তিস্‌মঁও' বা বিনোদনধর্মী একটি রচনারীতি জনপ্রিয় হয়। স্যাঁৎ-ব্যভ্ (১৮০৪-৬৯)-এর 'কোজ্‌রি' কিংবা 'বিশ্রম্ভালাপ' Causeries du lundi (Monday Chat) অনুসরণে এমিল্ ওগ্যুস্ত্ শাতিয়ে (১৮৬৮-১৯৫১) তাঁর Propos অথবা 'আলাপ' 'প্রপো দ্য লিতেরাত্যুর' প্রকাশ করেন। সমসময়ে হ্যারল্ড নিকলসন লেখেন মঁতেইনীয় আমেজের 'স্মল টক', ম্যাক্স বিয়ারবম লেখেন 'অ্যান্ড ইভেন নাউ', ইলেয়ার বেলক লেখেন 'অন নাথিং'।

ইঙ্গ-ফরাসি এই অন্তরঙ্গ আমেজের রচনারীতিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বঙ্গদেশে শিকড় গেড়েছিল অসাধারণ রচনাসাহিত্যিক, 'সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' মুজতবা আলীর উর্বর উদ্যানে। এ-ও এক জাতের সুরভিত গোলাপই ছিল যদিও সে আজ নিরস্তিত্ব, জংলী গোলাপের উৎপাতে– যোগ্য উত্তরসূরির লালনের অভাবে। তিনি, মতান্তরে দিলীপকুমার রায়, নাকি এটাকে 'মঞ্জুভাষণ' বলতেন। ভাষণ ঠিকই, তবে মঞ্জু-বিশেষণটি বেঠিক; যেহেতু মঞ্জিমা রচনাসাহিত্যের অন্তর্জাত গুণ।

একই কারণে রচনার বিশেষণরূপে রম্য-শব্দটিও হবে অতিশয়োক্তি। এ ধরনের রচনার নামটাকেও তাই 'রম্য রচনা' না-রেখে 'ফ্যামিলিয়ার এসে'র ভাবার্থব্যঞ্জক 'অন্ত রঙ্গ রচনা' রাখাই সমীচীন হত। তবে রম্যতা গল্পের সহজাত গুণ নয় বলে, গল্পের বিশেষণরূপে রম্য-শব্দটি চলতেই পারে এবং 'রম্যগল্প'-নামক প্রশংসনীয় একটি উপসংরূপ বাংলা সাহিত্যে আছেও। সরসগল্পও বলা হয় ওটাকে। তবে না-বলাই

ভালো, যেহেতু অন্য গল্পকে নীরস ভাবা যায় না। এই রম্যগল্পসহ মন্ময়রচনা এবং অন্ত রঙ্গ রচনাকে 'রম্য রচনা' বলে ঢালাও একটি অসঙ্গত নামে বর্গীকরণ সংজ্ঞাবিভ্রম সৃষ্টি করেছে বিধায় অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

বলা হয়, 'রম্য রচনা' নাকি 'বেল্-লেত্র'র বাংলা। অথচ প্রামাণিক অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ 'লারুস্ গ্র্যান্ড ডিকশনারি' belles-lettres শব্দবন্ধটির অর্থ লেখে great literature। প্রামাণ্য অ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ অভিধান ক্যাসেল্'স্ লেখে– ওটির ইংরেজি অর্থ 'পোলাইট লিটারেচার' এবং চারুচন্দ্র গুহের প্রামাণিক অ্যাংলো-বেঙ্গলি ডিকশনারি লেখে– শব্দবন্ধটির বাংলা অর্থ 'সুকুমার সাহিত্য'। এরই একটি জঁর বা সংরূপ রচনাসাহিত্য। আবার তারই একটি উপসংরূপ 'অন্তরঙ্গ রচনা'। এবার শব্দ-দুটির অর্থ আলাদা করে দেখা যাক। বহুবচন belles শব্দটি বহুবচন beaux শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ, যার অর্থ সুকুমার। যেমন beaux-arts, যার অর্থ ফাইন আর্টস বা সুকুমার শিল্প। তাই belles শব্দটির নিকটতম প্রতিশব্দগুলো হবে– ইংরেজিতে পোলাইট অথবা এলিগ্যান্ট আর বাংলায় সুকুমার অথবা রোচিষ্ণু। lettres শব্দটিও বহুবচন, যার অর্থ হিউম্যানিটিজ কিংবা লিটারেচার– রচনা নয়। সুতরাং belles-lettres শব্দবন্ধের বাংলা পরিভাষা হবে রোচিষ্ণু কিংবা সুকুমার সাহিত্য– রম্য রচনা হবার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ নেই। অতএব ব্যঞ্জনা-ইঙ্গিতের বিচারে belles শব্দটির প্রতিশব্দরূপে 'রম্য' শব্দটি শুধু অশুদ্ধই নয়, বিভ্রান্তিকরও।

'রম্য রচনা'-নামক অমনিবাস শব্দবন্ধটির অন্তর্নিহিত ভ্রান্ত সংজ্ঞার প্ররোচনাতেই, যতসম্ভব মুখরোচক করে তোলার জন্যে, নামটির রসাপ্লুত চাঁদোয়াতলে বর্তমানে সর্ব রকমের রগুড়ে-খেলুড়ে-ইতর-চতুর আমুদে 'রচনা'র আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন চলে। তবে প্রসঙ্গত এ-ও স্মর্তব্য যে সাধারণভাবেই বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমবিশ্বে রচনাসাহিত্যের যেন পুনর্জন্মই হয়েছে চটুলসাহিত্যরূপে। অন্তত জেমস থার্বার, ডরথি পার্কারদের পড়লে তেমনি মনে হয়। তবু ভুললে চলবে না যে সমসাময়িক রেনার ব্যানাম (১৯২২-৮৮), জন আপডাইক (১৯৩২-), যোসেফ এপস্টিন (১৯৩৭) প্রমুখ চটুল নয়, রুচিসম্মত অন্তরঙ্গ রচনাই লিখেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত রামতনু অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি প্রকাশিত, তাঁর 'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক [রচনা-সাহিত্য]' (প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৪, ষষ্ঠ সং, ১৯৯৩)-নামক গ্রন্থে বলেন :

Essay 'অর্থে আমরা বাঙলায় রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ প্রভৃতি কতকগুলি নাম তাহাদের নিজস্ব অর্থবৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু নাম ব্যবহারের এই অসতর্কতা আমাদের অনেক ভুল ধারণার মূলীভূত কারণ। পাশ্চাত্য দার্শনিক বেকন আমাদের এই ভাষা ব্যবহারের শিথিলতাকে Idol of the Market বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জগতের বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভ্রান্তির মূলে রহিয়াছে ভাষা প্রয়োগের ভুল।' (পৃ ১৬-১৭)।

'বাংলায় ইংরেজি Essay শব্দের প্রতিশব্দরূপে যে কয়েকটি শব্দ প্রচলিত আছে তাহার ভিতর রচনা শব্দের প্রয়োগকেই আমরা সুষ্ঠুতম বলিয়া বিবেচনা করি। এইজন্যই আমরা আমাদের আলোচনায় ইচ্ছাপূর্বক রচনা কথাটি ব্যবহার করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি যে, নাটক, গল্প, উপন্যাস ব্যতীত সকল গদ্য লেখাই সাহিত্য নহে,– সাহিত্য একরূপ বিশেষ লেখা– সেই বিশেষত্বমণ্ডিত গদ্য লেখাকেই রচনা নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের রচনা শব্দটিকে বাছিয়া লইবার কারণ এই,– সাহিত্য– সে যে প্রকারেরই হোক না কেন– একটা সৃষ্টি বা নির্মিতি; কোনো সৃষ্ট-ব্যাপার না হইলে কোনো লেখাই কখনও সাহিত্য-পদবাচ্য হইতে পারে না। রচনা শব্দটির ভিতরে একটা সৃষ্টির কথা অনুস্যূত হইয়া আছে; রচনা বলিয়া সাহিত্যের শ্রেণীটির ভিতরেও যে একটা অসাধারণ চমৎকারিণী নির্মিতি রহিয়াছে, ঐ শব্দটির ভিতরেই তাহার বেশ একটা ইঙ্গিত আছে।

এইখানেই আমরা প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং রচনা-সাহিত্যের ভিতরে একটা ভেদরেখা টানিতে চাই। প্রবন্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টি নহে, রচনা সাহিত্যিক সৃষ্টি। ইংরেজি Essay এবং Treatise, Discourse, Dissertation শব্দের ভিতরে যে তফাত, রচনা এবং প্রবন্ধের ভিতরে আমরা সেই তফাত কল্পনা করিতে পারি। অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রবন্ধ এবং রচনা আমাদের সাহিত্যে প্রায় সমার্থক শব্দরূপেই প্রচলিত, সুতরাং তাহাদের ভিতরে যে পার্থক্যের কথা এখানে বলিতেছি তাহা ঐতিহাসিক নহে,– তাহা অনেকখানিই অর্থগত। তবে এই অর্থগত ভেদকে অবলম্বন করিয়া আমরা প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরকার এই প্রভেদকে যদি এখন হইতে মানিয়া লই, তাহা হইলে একটি সাহিত্যিক শ্রেণী হিসাবে রচনা-সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং পরিধি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে'। (পৃ ২৪-২৫)।

ট্রিটিজ এবং এসে'র মতো প্রবন্ধ এবং রচনার ভিতরকার শ্রীদাশগুপ্ত ব্যাখ্যাত প্রভেদটি মানা হচ্ছে না আজ এতটি বছর পরেও। প্রমাণ : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'সাহিত্যের শব্দার্থকোষ'(১৯৯৯)-এ লেখা আছে সন্দর্ভ অর্থ essay (পৃ ১০৭)। বস্তুত সমস্যাটা কী ? essay-কে রচনা বললে, কারো 'রচনাবলী'তে সবই 'essay'র সমাহার বোঝাবে ? ওগুলোকে না-হয় গ্রন্থাবলীই বললাম– রচনাবলীর অনেকখানি তো এমনিতেও গ্রন্থনাবলী। ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্যে তো বিরাট-বিশাল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গ্রন্থাবলীর নামও ছিল essay (যেমন Blaise Pascal-এর Essai pour les coniques (1640) কিংবা John Locke-এর Essay Concerning Human Understanding (1689)– সম্ভবত এই বিনীত অর্থে যে, তাঁদের এই এসে বিশাল একটি বিষয়ে প্রবেশের একটা প্রয়াস বা উদ্যোগমাত্র।

ঢাউস সেইসব প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলীর পাশ কাটিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য সংবলিত চিত্তাকর্ষক এই এসে-শীর্ষক নির্মিতিটির, 'ননফিকশনাল প্রোজ'-এর নতুন জঁর হিসেবে, নিজের সুনির্দিষ্ট স্থানটুকু করে নিতে কোনো অসুবিধে তো হয়নি। আসলে যথাযথ হবার

প্রবণতাই আমাদের নেই– যা উন্নত ভাষাভাষীর থাকে। তার প্রমাণ হাতের কাছেই আছে। ইংরেজদের ভাষায়, উদ্ভূত প্রয়োজনহেতু Treatise কিংবা প্রবন্ধ-শব্দটি প্রচলনে এসেছে ১৩০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে (র‍্যান্ডমহাউস আন্‌অ্যাব্রিজ্‌ড ডিকশনারি)।

১৫৯৭ সালে নকাল্পনিক গদ্যে essay-নামক আরেকটি ধরনের সৃষ্টি হতেই সেটি প্রচলনে চলে আসে ১৬০০ থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে। প্রচলিত ট্রিটিজ-শব্দটি দিয়ে নবাগত এসেকে একটি দশকও চালাতে চেষ্টা করল না সে-ভাষার কোনো লেখক– আমরা যা সকলে মিলে করে যাচ্ছি আমাদের গদ্যের জন্ম থেকে অদ্য পর্যন্তও। অর্থাৎ রচনাকে প্রবন্ধই বলে বেড়াচ্ছি।

আবার নতুন প্রয়োজন উদ্ভূত হতেই, সন্দর্ভ বোঝানোর জন্য, সমধর্মী আরেকটি ইংরেজি শব্দ Dissertation প্রচলনে চলে এল ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ সালে, যার মধ্যে 'সংগ্রহে'র ভাবটা Treatise থেকে বেশি। প্রতিপক্ষে আমাদের অভিধানগুলো আজো পর্যন্ত– প্রবন্ধ, রচনা, সন্দর্ভ– এই তিনটি পরিভাষাকেই পরস্পরে বিনিময়ে বলে বিধান দিয়ে যাচ্ছে এবং তাতেই বিভ্রান্তিটি মান্যতাও পাচ্ছে সর্বসম্মত।

ঠিক কী প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছে রচনা ? প্রথমত অবদ্ধ থাকার জন্য, যেহেতু প্রবন্ধ সংজ্ঞামতেই বদ্ধ; দ্বিতীয়ত লঘুপক্ষ হবার জন্য, যেহেতু প্রবন্ধ গুরুভার; তৃতীয়ত অপূর্ণ থাকার স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য, যেহেতু যত ক্ষীণই হোক প্রবন্ধকে তার সম্পূর্ণ রূপটি পেতেই হবে। পূর্বাপরসঙ্গতিসম্পন্ন যুক্তি, তর্ক, বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত দ্বারা বদ্ধ রচনার প্রতিশ্রুতিই দেয় প্রবন্ধ– যা প্রকৃতই পরম্পরান্বিতরূপে সুসংবদ্ধ। উদাহরণ : আবু সায়ীদ আইয়ুব, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের প্রবন্ধনিচয়।

প্রতিপক্ষে, রচনা ধারণা জাগায় বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করার। এমনকি ফিরে আসার সুপথ খুঁজে নেবার প্রতিভা থাকলে, অবান্তরবিষয়গামী হয়ে রোমাঞ্চকর পুলকও উপহার দিতে পারে সে পাঠককে– যেমন চার্লস ল্যামের এলিয়া-নামে লেখা এসেগুলো, প্রমথ চৌধুরীর বীরবলীয় এবং রবীন্দ্রনাথের পাঞ্চভৌতিক রচনাসমূহ।

কোনো অধিশ্রয়িত বিষয়ে রচিত প্রসারিত-প্রবন্ধকে ট্রিটিজ না বলে ডিসার্টেশন অথবা সন্দর্ভ বলে– যেটা তত্ত্বালোচনামূলক গবেষণাঋদ্ধ ও সংগ্রহসমৃদ্ধ, যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প'। এছাড়াও আছে ডিসকর্স অর্থাৎ বক্তৃতা বা ভাষণ, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'হিবার্ট' বক্তৃতামালা।

সাধারণত বাংলাভাষার বেশির ভাগ শব্দকোষেই দেখা যায়– অর্থের সূক্ষ্ম ভেদবিচার করে সঠিক ব্যঞ্জনাপ্রকাশক যথার্থ প্রতিশব্দটি তল্লাস করার বদলে তার মহল্লার সকল শব্দকেই ধরে এনে জড়ো করা হয়। সম্যক রোগনিদান করার বদলে প্রশস্ত-পরিধির বীজাণুপ্রতিরোধকের বিধান দান করার সস্তা ব্যবস্থা আর কি। ফলে বাংলা শব্দকোষে বিদেশি শব্দটির ভাবানুবাদ মিললেও, প্রতিশব্দ মেলে না। তার জন্য বাংলাভাষা ব্যবহর্তার অভিব্যক্তি, ব্যাহত তো বটেই, বিকৃতও হয়। অভিপ্রায়ের ভাষাও হয়ে যায় ঝাপসা। অভিধানগুলোতে ইংরেজি ট্রিটিজ, ডিসার্টেশন এবং এসে, এই তিনটি শব্দের

প্রত্যেকটির বিপরীতে অর্থরূপে বাঙলা তিনটি শব্দই দান করে দেন আত্যন্তিক উদারচেতা আভিধানিকগণ– রচনা, প্রবন্ধ, সন্দর্ভ।

অথচ আমরা দেখেছি ট্রিটিজ শুধু গবেষণামূলকও হতে পারে, ডিসার্টেশনকে হতে হয় বর্ধিত কলেবরে তত্ত্বালোচনাসমর্থিত এবং সংগ্রহসমৃদ্ধ। প্রতিপক্ষে এসে গবেষণার দায়িত্বভারাক্রান্তই নয় এবং এসেয়িস্টও গবেষণার অঙ্গীকারবদ্ধ নন বিলকুল। তিনি সাধারণত সমাজদর্শনের স্বল্পপরিসরের টীকাকার, ভাষ্যকার, সমালোচক এবং মানুষের আচার-ব্যবহার-পরিবেশ-পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষক রূপকার।

যে-কোনো সাহিত্যিক রেওয়াজ থেকে রচনাকার এতই মুক্ত যে, ব্যক্তি-কি-ঘটনাবিশেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি মজার সংলাপ জুড়ে দিতে পারেন, চুটকি গল্পও ফাঁদতে পারেন। এমনকি গল্প-উপন্যাসকারের মতো সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্রও সৃষ্টি করতে পারেন তিনি– যেমন অ্যাডিসনের স্পেক্টেটার-পেপার্সের অমর চরিত্র স্যার রজার ডি কাভার্লি। স্বাধীনতা আর সৌকুমার্যের মাত্রা যুক্ত হওয়াতে এসে বা রচনাসাহিত্যকে আমি বরং 'কল্পনাগৌণ' বলব– প্রবন্ধকে 'নকাল্পনিক' কিংবা নন্‌ফিকশনাল আর গল্প-উপন্যাসকে 'কল্পনাপ্রধান' বা ফিকশনাল বলার মতো।

মঁতেইন প্রবর্তিত genre 'এসে'র শাব্দিক অর্থই হল পূর্ণতার প্রতিশ্রুতিহীন উদ্যোগ– যা লেখার মুহূর্তে বক্ষ্যমাণ বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত লেখকের মনের ছবি আঁকার প্রয়াসমাত্র। এই নৃ-কেন্দ্রিক রচনার প্রেরণা জাগাল চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালিতে অভ্যুদিত ইউরোপীয় রেনেসাঁস– দেব-কেন্দ্রিক মধ্যযুগীয় লেখালেখির ইতি ঘটিয়ে। পুনরুজ্জীবিত হল গ্রেকো-রোমান উৎসের সঙ্গে প্রতীচ্য সংস্কৃতির পুরাতন সম্পর্কটি। সে-কারণেই পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় মানবতাবাদী লেওনার্দো ব্রুনি বলেছিলেন– সদ্যগত ষাট বছর আগের কালটি থেকেও আমার নিকটতর মনে হয় গ্রিক বাগ্মী ডেমস্থিনিস (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) এবং ল্যাটিন বাগ্মী কিকেরো বা চিচেরোর (খি. পূ. ১০৬-৪৩) সুদূরের সময়গুলো।

রেনেসাঁস ফ্রান্সে এসে পৌঁছাল ষোড়শ শতকে এবং মানবতাবাদী মঁতেইনের ব্যক্তিতাব্যঞ্জিত প্রসাদগুণ নিয়ে তাঁর essai প্রকাশিত হল ১৫৮০ সালে, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিতরূপে ১৫৮৮ সালে এবং আরো পরিমার্জনার ছাপ নিয়ে ১৫৯৫ সালে। রচনা বা 'এসে'-নামক নবসৃষ্ট এই ফর্মটির কালজয়ী আদৃতির কারণ হল এ রচনা সাবজেক্টিভ, অমর্ত্য সেনের পরিভাষায়, বক্তাসাপেক্ষ– লেখকের মনের রঙে রঞ্জিত এবং মোহন মেজাজে মণ্ডিত।

১৫৮০ সালে প্রকাশিত প্রথম দু'খণ্ডের চুরানব্বইটি রচনার মধ্যে ঘটেছিল মঁতেইনের তখনকার মানসিক আদলটির প্রকাশ ও মানবিক রূপটির বিকাশ, যথোপযোগী বর্ণে মুক্তছন্দের শাব্দিক অঙ্কনে– যেমন 'অফ প্র্যাকটিস', 'অফ ড্রাঙ্কেন্‌নিস'। এ-সবেতে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর স্টোইক্ ভাবধারা। ১৫৮৮ সালে প্রকাশিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রচনাগুলোতে তাঁর মানসমঞ্চ দখল করেছে

হিউম্যানিজম ('অ্যাপলজি ফর রেমন্ড সিবুন্ড'-শীর্ষক রচনাটি দ্রষ্টব্য)। স্বভাবতই ধর্মীয় হানাহানির স্বকাল তাঁর এ-জাতীয় সেকুলার রচনা পছন্দ করেনি– যদিও পরবর্তী চার শ বছর বিশ্বকে বিমুগ্ধ রেখেছে একমাত্র তাঁর এ-জাতের রচনাগুলোই।

জাতটির মূলমন্ত্রটি ছিল : আমার অধ্যয়ন এবং রচনার বিষয় একমাত্র আমিই। এ কারণেই স্বপ্রকাশে আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত হতে হবে। তা তিনি হতে পেরেছিলেন বলেই রচনায় তাঁর আত্মানুকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবজাতিরই অনুকৃতি। জেম্‌স লি হান্ট (১৭৮৪-১৮৫৯) বলেন : মঁতেইনই প্রথম সাহসী ব্যক্তি যিনি মানুষ হিসেবে যা অনুভব করেছেন, লেখক হিসেবে তা-ই প্রকাশ করেছেন। এই জীবনবাদী গদ্যশিল্পীর 'এসে'-পুস্তকটির শেষপৃষ্ঠাগুলো যেন একটি মানবজীবনের অধিকারী হতে পারার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক স্তবগানবিশেষ। অশেষ আনন্দের উৎস ফরাসি ভাষার অন্যতম প্রিয়তম এই পুস্তকটি সম্পর্কে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বলে– বারবার পড়ে রেখে দেবার পরেও, অবসরে বইটিকে আবার হাতে তুলে নিতে হবে।

মঁতেইনের পূর্বে সাধারণত গুরুগম্ভীর প্রবন্ধেরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল সত্য, তবে ভাষণে-ব্যাখ্যানে হেথাহোথা আজকের রচনাসাহিত্যের প্রাচীন কিছু নমুনাও প্রাপ্তব্য ছিল– যেমন বার্ধক্যের মাধুর্যের সপক্ষে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শিল্পচাতুর্য সম্পর্কে ল্যাটিন কিকেরোর বাগ্মিতা, ক্রোধ ও অনুকম্পা বিষয়ে সেনেকার লেখা কিংবা, আরো লঘু পর্যায়ে, দৈববাণী বিষয়ে প্লুতার্কের বর্ণনা। এজন্যেই বেকন বলেছিলেন যে এসে বা রচনা নামটা একালের হলেও বস্তুটি সেকালেরই।

তাহলে মঁতেইন নতুন করলেন কী ? প্রাচীন ভাষ্যটিকে তিনি, স্বল্প পরিসরে স্বচ্ছন্দ ও মনোহর ভঙ্গিতে, লেখকের স্ব-কে প্রকাশ করার একটি নতুন শিল্পসংরূপে পরিণত করলেন। রূপটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণটি, বেকনের নিজের এসে সম্পর্কে-করা, একটি উক্তিতেই মূর্ত হয়ে ওঠে : রচনা হল লবণের দানা, যা ভোগে উদ্বুদ্ধ করবে; ভোগক্লান্তির সৃষ্টি করবে না।

মিশেল মঁতেইনের কাছ থেকে essai পরিভাষাটি ধার করে ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) তাঁর essay প্রকাশ করলেন ১৫৯৭ সালে। তবে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বেকন গুরুর কাছ থেকে 'মন্ময় রচনা'র আদর্শটুকু ধার করেননি। মঁতেইনের প্রশ্ন এ ছিল না যে– আমার কী জানা উচিত। তাঁর প্রশ্নটি ছিল– আমি কী জানি। উত্তরটি ছিল : 'কিছুই না'। কেননা মানুষ অ-স্থির প্রকৃতির প্রাণী বিধায় সে কিছুই জানার অধিকারী নয়– একমাত্র নিজেকে ছাড়া। অতএব তিনি তাঁর এসে-তে মুদ্রিত হরফে কেবল নিজেকেই অনূদিত করলেন, নিষ্কম্প বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

পক্ষান্তরে বেকন মডেল করলেন সেনেকার পত্রাবলীকে এবং তাঁর এসে'তে বক্তানিরপেক্ষ দৃক্‌কোণ থেকে দেখালেন : 'মানুষ কী করে', আর 'কী তার করা উচিত'। ফলে তাঁর এসে চলে গেল মঁতেইনের ব্যক্তিতাব্যঞ্জিত এসে'র বিপরীত মেরুতে এবং রূপ নিল সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক– অর্থাৎ ধ্যানমগ্ন এক আনমনা দার্শনিকের

'তন্ময় রচনা'র। যথার্থ রচনাকারকে পাঠকের উদ্দেশে নিজের মনপ্রাণ উজাড় করে দিতে হয়। তাই জন ফ্রিম্যান বলেন– রচনাকার হিসাবে বেকন নেহাতই মাইজার, বখিল। এজন্যেই ইংলিশ এসে'র পিতা হয়েও তিনি রয়ে গেলেন নিঃসন্তান, তাঁর এসে'র কোনো উত্তরপুরুষ মিলল না– তবে রইলেন অনতিক্রান্তই।

ওদিকে ফরাসি সাহিত্যে মঁতেইনও সন্ততিহীন রইলেন স্বদেশে। তেওফিল গোতিয়ে, আনাতোল ফ্রঁস্ প্রমুখ অত্যুজ্জ্বল রচকগণও বস্তুত প্রধানত বিষয়মুখী, তেমন বিষয়ীমুখী কিংবা বক্তাসাপেক্ষ নন। আঁদ্রে জিদ্ ও জঁ কক্তোই কেবল কিছু কম বক্তানিরপেক্ষ অর্থাৎ অধিক অন্তর্মুখী। তবে প্রায় শত বর্ষের প্রস্তুতিশেষে মঁতেইনের বংশ বাড়ল ইংরেজিসাহিত্যে এবং এর প্রভাববলয়ে, যেমন বাংলাসাহিত্যে। তিনি ইংরেজিতে অনূদিত হন ১৬০৩ সালে জন ফ্লোরিও কর্তৃক। এ-অনুবাদের প্রভাবে আজকের ইংলিশ এসে'র অনুকূলে ক্ষেত্র তৈরি করেছেন যোসেফ হল (১৫৭৪-১৬৫৬), টমাস ওভারবুরি (১৫৮১-১৬১৩), জন আর্ল (১৬০১-৬৩), বিশেষত টমাস ফুলার (১৬০৮-৬১) ও টমাস ব্রাউন (১৬০৫-৮২) প্রমুখ চরিত্রচিত্রীগণ– সপ্তদশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত।

অতঃপর মঁতেইন তাঁর প্রথম উত্তরসূরিরূপে পেয়ে গেলেন এব্রাহাম কাউলিকে (১৬১৮-১৬৬৭) যাঁর 'এসেজ ইন ভার্স অ্যান্ড প্রোজ' প্রকাশিত হল ১৬৬৮ সালে। সুসংস্কৃত অবসরজীবনের আদর্শ নিয়ে লেখা কাউলির গদ্য রচনাগুলো ছিল যথার্থই মঁতেইনীয় ঘরানার 'পার্সনাল এসে' বা 'মন্ময় রচনা'। অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে সাময়িকী প্রকাশের হিড়িকে ব্যাপক পাঠকের সৃষ্টি হলে, এসে লেখার চর্চাও তুঙ্গে উঠল– এমনকি ট্যাটলার-স্পেক্টেটার-নামক বেশি জনপ্রিয় পেরিয়ডিক্যালগুলোর ফিমেল ভার্শানও বেরুল। এমনি অনুকূল পরিবেশে ইংরেজি সাহিত্য পেয়ে গেল তার প্রকৃত 'ফাদার অফ ইংলিশ এসে'– যোসেফ অ্যাডিসনকে (১৬৭২-১৭১৯)।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদই পেয়ে গেল ইংরেজি সাহিত্যে মঁতেইনীয় ঘরানার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি চার্লস ল্যাম্‌কে (১৭৭৫-১৮৩৪)। শতকটির প্রায় প্রথমার্ধ জুড়ে তাঁর এবং উইলিয়াম হ্যাজলিট (১৭৭৮-১৮৩০), জেম্‌স লি হান্ট (১৭৮৪-১৮৫৯), টমাস ডি কুইন্সি (১৭৮৫-১৮৫৯) প্রমুখ রচনাকারদের প্রাধান্য ছিল গল্প-উপন্যাসকারের চেয়েও লক্ষণীয়রকম বেশি।

ইংলিশ এসেয়িস্টদের ওই ঝলমলে দলটির প্রভাবে বাংলা গদ্য তার যাত্রাশুরুতেই পেয়ে গেল রচনাসাহিত্য। দেবেন্দ্রনাথ (১৮১৭-১৯০৫), রাজনারায়ণ (১৮২৬-৯৯), সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-৮৯), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) প্রমুখের মুগ্ধ মনোযোগে পুষ্ট হয়ে সমৃদ্ধিও অর্জন করল অপ্রত্যাশিত। একই শতকের শেষ পাদে ইংরেজি রচনাসাহিত্যে একটা পরিবর্তন সূচিত হল রবার্ট স্টিভেন্সন (১৮৫০-৯৪), ইলেয়ার বেলক (১৮৭০-১৯৫৪), ম্যাক্স বিয়ারবোম (১৮৭২-১৯৫৬),

জি. কে. চেস্টার্টন (১৮৭৪-১৯৩৬), রবার্ট লিন্ড (১৮৭৯-১৯৪৯) প্রমুখের কলমে– বিষয় থেকে ঝোঁকটা গেল রীতির দিকে।

পরিবর্তনটি বাংলা রচনাতেও বিংশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই লক্ষ করা যায়– বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এবং প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) রচনায়। অতঃপর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই এগিয়ে চলে আমাদের রচনাসাহিত্য– মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-৫৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইন্দ্রজিৎ, ১৯০৩-৯৫), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-৭৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), আসহাব উদ্দীন আহমদ (১৯১৪-৮৪), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-৭০), আবদুল হক (১৯১৮-৯৭), দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্ন্যাল (১৯২৪-৬৬) এবং মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-৭১) মতো প্রতিভাধর গদ্যশিল্পীগণের সৌজন্যে।

তবে বিংশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও সাবজেক্টিভ কিংবা মন্ময় রচনাকার আর অবজেক্টিভ অথবা তন্ময় রচনাকারকে আলাদা করা মুশকিল এজন্যে যে তাঁদের অনেকে দুই দলেই থাকেন। বস্তুত এসে বা রচনা-নামক কল্পনাগৌণ এই অভিনব ফর্মটি গদ্যভাষায় উপাদেয় ও চমকপ্রদরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রায় সকল বিষয়কেই তার আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে– এমনকি উপন্যাসের একটা অধ্যায় অথবা আস্ত একটা ছোটগল্পকেও।

রচনাসাহিত্যের অন্যতম মৌলিক যে-লক্ষণটি বোঝাতে মঁতেইন বলেন I speak unto paper as unto the first man এবং 'অক্সফোর্ড এসেজ'-এর নির্বাচক ও সম্পাদক জন গ্রস্ চার্লস ল্যাম্ সম্পর্কে বলেন master of the art of talking on paper– সে-লক্ষণটির শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ মঁতেইনের 'এসে', ল্যামের 'এসে অফ এলিয়া' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-নামক গ্রন্থের অন্তর্গত রচনাগুলো।

উল্লিখিত কাগজের সঙ্গে 'কথা বলা' বা কাগজের পাতায় 'কথা বলা' রচনাসাহিত্যের পরিচয়সূচক কিংবা লাক্ষণিক বিধায় শুদ্ধতম কথাসাহিত্য বস্তুত রচনাসাহিত্যকেই বলা যায়। বর্ণিত লেখকগণের প্রত্যেকটি রচনা এক ফোঁটা মুক্তা বা এক খণ্ড হীরার মতোই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ-'রচনাকে টেনে 'প্রবন্ধ' বানানো যাবে না। কেবল এই একক শ্রেণীর রচনাগুলোই গণ্য হবে essays par excellence বা চরমোৎকর্ষহেতুক রচনারূপে– যা রচনাসাহিত্য-নামক স্বতন্ত্র একটি সাহিত্যরীতির অন্তর্ভুক্ত।

এ-ছাড়া আরেক শ্রেণীর লেখা রচনা-নাম পেয়েছে কেবল রেওয়াজের কাছে– নেহাত আকারে ছোট এবং প্রকারে টুকরো বলে। বিবিধ কারণে অসম্পূর্ণ থেকে-যাওয়া এ-জাতের কিছু রচনাকে টেনে 'প্রবন্ধ' বানানো না-ও যেতে পারে। তবু এগুলো পরিভাষাভুক্ত 'রচনাসাহিত্য' বলে গ্রাহ্য হবে না– 'এসেজ পার এক্সেলাঁস'-শ্রেণীর নয় বলে। যদি প্রশ্ন ওঠে : রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থটির নামকরণ 'বিচিত্র রচনা' হল না কেন। তবে উত্তর হবে : সৃজিতের বর্গীকরণ আমাদের মতো 'পনেরো আনা'র কাজ, তাঁর

মতো 'এক আনা'র প্রধান কাজ সৃজন। তবু তিনি 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বলে বোঝাতে চেয়েছেন– গ্রন্থটির অন্তর্গত রচনাগুলো যথা অর্থে প্রবন্ধ নয়, অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুকেই বর্গীকরণ-বিশারদগণ বলছেন এসে, মানে রচনা।

প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু অধ্যাপক, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) বাংলাভাষায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের মূলসূত্র, মূল উৎস, প্রথম প্রকাশ প্রভৃতি উল্লেখ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সম্পর্কে বলেন : 'তাঁহার রচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের খাঁচায় আবদ্ধ প্রবন্ধ-পাখী যেন ব্যক্তিমনের খোলা জানালা দিয়া মুক্তিলাভ করিয়া অসীম নভোবিহারের পথে উধাও হইয়াছে। তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে (১৮৮৯) যুক্তিধর্মী, তথ্যভারবাহী প্রবন্ধ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের, মন্ময় অন্তরঙ্গতার একটি নূতন সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই সুরটি পরবর্তী যুগে তাঁহার পুত্র রবীন্দ্রনাথে আরো প্রসারিত ও বিচিত্র গ্রামে ধ্বনিত হইয়া প্রবন্ধের নূতন রূপবিধান করিয়াছে'। (পৃ ১২৩, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, আধুনিক যুগ, সং, ১৪০০)। আমি বলি : প্রবন্ধের এই নূতন রূপটিই কল্পনাগৌণ গদ্যের রচনা-নামক নতুন জঁর অথবা সংরূপ ।

অতঃপর শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর ভাষায়, 'প্রবন্ধ-সাহিত্যের অবিসংবাদিত সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্র-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে বলেন– 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে জীবন-রসিকতার গভীরতর অনুরণন শ্রুত হয়। এইগুলিতে শুধু রচয়িতার ব্যক্তিমানস নহে, তাঁহার আবেগ অনুভূতি-কল্পনাস্বপ্ন-জীবনবোধ প্রভৃতি বৃত্তির সূক্ষ্ম তন্তুজালে রচিত, নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তা এক অবর্ণনীয় আবেদন লইয়া পাঠকের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নাই, কোনো 'প্রকৃষ্ট বন্ধনে' গ্রথিত চিরন্তন পারম্পর্য, প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত কোনো অচ্ছেদ্য যুক্তি শৃঙ্খলা নাই। প্রবন্ধের সমস্ত আঙ্গিক-বিন্যাস এখানে ছিন্ন হইয়া ইহা এক মুক্ত মানবাত্মার এক সর্ববন্ধনাতীত মানস অনুভূতির লীলাবিহারক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে'। (প্রাগুক্ত, পৃ ১২৬-১২৭)। আমি বলি : প্রবন্ধের 'আঙ্গিক-বিন্যাস' ছিন্ন-হওয়া 'সর্ববন্ধনাতীত মানস অনুভূতির লীলাবিহারক্ষেত্র'টি রচনা-নামী নতুন সাহিত্যরীতির।

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' সম্পর্কে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর সঙ্গে এক দিক দিয়া এই প্রবন্ধগুলি তুলনীয়– একটি অপূর্ব সংবেদনশীল ব্যক্তিমনকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের সুকুমার ভাবমুকুলগুলি উন্মেষিত ও পূর্ণবিকশিত হইয়াছে'। (পৃ ৬, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড)। 'পঞ্চভূত'-এ (১৮৯৭) রবীন্দ্রমনীষা ও তাঁহার গদ্যরচনারীতি একটি মৌলিক দীপ্তি ও স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।...এ যেন গদ্যরচনায় এক অভিনব ফর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। (পৃ. ২৭০, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, প্রথম খণ্ড)। আমি বলি : প্রবন্ধ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে-ওঠা এই অভিনব ফর্মটাই রচনার ফর্ম।...'পঞ্চভূত'-এ রবীন্দ্রগদ্যশিল্প, তথা সমগ্র বাংলাগদ্যের

ক্রমবিকাশ এক পরম সৌন্দর্যময় পরিণতির শিখরদেশে পৌঁছিয়াছে।' (পৃ ২৯৩, প্রাগুক্ত)। গ্রন্থটিতে 'মন' ও 'পল্লীগ্রাম' এই দুইটি রচনা সম্পূর্ণরূপে প্রবন্ধধর্মী...ইহারা 'পঞ্চভূত'-এর প্রচলিত রীতি হইতে ভিন্ন।' (পৃ ২৯২, প্রাগুক্ত)। আমি বলি : পঞ্চভূত-এ প্রচলিত রীতিটিই রচনাসাহিত্যরীতি।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে বলেন : 'তিনি প্রবন্ধের মধ্যে মজলিশী আলাপের সুর, খেয়াল-খেলার লীলায়িত ছন্দ, ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দ মননের লঘু-বিসর্পিত সঞ্চরণ প্রবর্তন করিয়াছেন'। (পৃ ১৩৬, বা.সা.বি.ধা, দ্বিতীয় খণ্ড)।...তাঁর প্রবন্ধের 'গঠনগত প্রধানবৈশিষ্ট্য– যদৃচ্ছাচরণ' উল্লেখ করে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন 'তাঁহার প্রবন্ধ গঠনের দিক দিয়া ঢিলে-ঢালা, বিষয়ের শাসন-না-মানা স্বচ্ছন্দ মানস বিচরণের আঁকাবাঁকা-রেখা-চিহ্নিত, নির্দিষ্টরূপহীন মানচিত্র, খেয়ালি মনের খাপছাড়া অঙ্গাবরণ'। (প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭)। আমি বলি : যদৃচ্ছাচারী এই খেয়ালি লেখাটাই রচনা-সাহিত্য।

'বাঙলা-সাহিত্যের একদিক [রচনা-সাহিত্য]'-গ্রন্থে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর

সবিস্তার ব্যাখ্যানে বাংলা ভাষায় রচনা-সাহিত্যের পটভূমি, উদ্ভব, উন্নতি এবং পরিণতি স্বচ্ছ আলোকে তুলে ধরেছেন। এখানে আমি তাঁর বক্তব্যের শুধু মূলকথাটুকু বলছি। মধ্য ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত 'প্রবন্ধ' ছিল

'প্রস্তাব', যেমন বিদ্যাসাগরের দুটি 'প্রস্তাব' 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহ'। বাংলার প্রবন্ধসম্রাট হয়ে ওঠা পর্যন্ত বঙ্কিমও ভূদেবের মতো 'প্রস্তাব'-পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন।

'রচনা'-শব্দটি উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে উদ্ভূত হলেও রচনা-সাহিত্যের উদ্ভব হয় শতাব্দীর চতুর্থ পাদের শুরুতে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য'-এর কিছু কিছু অংশ এবং সম্পূর্ণ 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) বিশুদ্ধ রচনাসাহিত্য (পৃ ৮৪, প্রাগুক্ত), যার লক্ষণ হল 'সাহিত্যসৃষ্টির ভিতর দিয়া সাহিত্যস্রষ্টার গভীর স্পর্শ' (পৃ ৯০)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'-কে (১৮৯৮) কেবল দীর্ঘ বলেই রচনা-সাহিত্যনামক ফর্মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যেহেতু হ্রস্ব হওয়াটা রচনার জন্য জরুরি (পৃ ৭০)। তবে 'আত্মজীবনী'র অন্তর্গত 'টুকরা টুকরা' ভ্রমণকাহিনীগুলোকে চমৎকার রচনা-সাহিত্যই বলতে হবে (পৃ ৭২)।

বঙ্কিমের নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনাও রচনা-সাহিত্য হয়ে উঠেছে (পৃ ৮৮)। তাঁর 'পঞ্চভূত' অভিনব কৌশলে রচিত রচনাসাহিত্য (পৃ ১৫১)। তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' রচনা-সাহিত্যের সার্থক নিদর্শন (পৃ ১৭৬)। অধ্যাপক দাশগুপ্ত প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বলেন : 'রচনাকার হিসাবে 'বীরবল' পুরাপুরি মনটেইন্-পন্থী; আজকাল ইউরোপীয় সাহিত্যে বিশুদ্ধ রচনারূপে যে রচনাগুলিকে স্বীকার করা হয় বীরবলের রচনাগুলি অনেকখানি তাহার সমজাতীয়।...তিনি তাঁহার রচনার নাম দিয়াছেন 'খেয়াল খাতা'...। বীরবলের রচনা মুখ্যত এই খেয়াল-খুশিতে 'বাজে কথার

ফুলের চাষ' (পৃ ২০০-২০১)। শ্রীচৌধুরী বলেছেন : 'কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই– তার উপর চকচকে হ'লে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে ...সে ভাব এ খেয়াল খাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পুরনো চিন্তা, পুরনো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে– আর্টিকেল লেখা'। (পৃ ২২, 'বীরবলের হালখাতা', প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ ১৩৯৪)। 'আর্টিকেল'-শব্দটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধেরই দ্যোতক, মুক্তপক্ষ রচনার নয়।

প্রফেসর ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'প্রমথ চৌধুরী মূলত 'এসেয়িস্ট'– এ কথাটি আমাদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন।' অতঃপর শ্রীমুখার্জি শ্রীচৌধুরীর 'শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'সংস্কৃত সাহিত্যে essay নেই, ইউরোপীয় সাহিত্যেও ছিল না; Rennaissance-এর সময় এ-সাহিত্য জন্মলাভ করে।...সে যাই হোক, *essay* বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। জনৈক ইংরাজ লেখক বলেছেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায়– প্রথমে ছিল কবিতা, তারপর হল Treatise, তারপর আবির্ভূত হল essay'। (পৃ ৮০, বীরবল ও বাংলাসাহিত্য')। অতঃপর অধ্যাপক মুখার্জি প্রশ্ন তোলেন– প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধরীতির আদর্শ কী এবং উত্তর দেন যে, তিনি 'একাধিকবার এ বিষয়ে তাঁর আদর্শরূপে স্বীকার করেছেন মঁতেনের প্রবন্ধাবলী'। (পৃ ৮৩, প্রাগুক্ত)।

অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর 'প্রমথ চৌধুরী'-শীর্ষক গ্রন্থে (চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫) বলেন : বুদ্ধিপ্রধান প্রমথ চৌধুরীর 'হৃদয়সংবাদ'হীন প্রবন্ধসাহিত্যকে সামগ্রিকভাবে রচনা-সাহিত্য বলা যায় না। তবে তিনি যে সার্থক রচনাসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন (পৃ ১৩৭)। 'রূপের কথা', 'ভারতবর্ষের ঐক্য' প্রভৃতিকে পুরোপুরি প্রবন্ধ; 'ইতিমধ্যে' ও 'বইয়ের ব্যবসা'কে রচনা-সাহিত্যের আমেজী; 'আমরা ও তোমরা', 'নোবেল প্রাইজ', 'সবুজ-পত্র', 'বর্ষার কথা' ও 'ফাল্গুন'-কে উৎকৃষ্ট রচনা-সাহিত্যের উদাহরণ বলে ব্যাখ্যা সহকারেই উল্লেখ করেন শ্রীরায় (পৃ. ১৩৬, প্রাগুক্ত)।

কিন্তু কৌতুকপ্রদ ব্যাপারটি হল : উৎকৃষ্ট রচনাসাহিত্য হিসেবে উভয়ে একমত হবার পরেও প্রমথ চৌধুরীর সংশ্লিষ্ট লেখাগুলোকে অধ্যাপকদ্বয় সারাক্ষণ 'প্রবন্ধ'ই বলে গেলেন। এটা কি রক্ষণশীলতা ? না কি ইনার্শিয়া ? এক কালে 'প্রবন্ধ' বলা হত সঙ্গীতকে তো বটেই– কাব্যকেও, এমনকি মহাকাব্যকেও (পৃ ১৭ ও ২০, শশিভূষণ)। এখন বলা হয় কী ? না, কারণ ওরা স্বনামেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তো 'রচনা' আজো স্বনামে চলছে না কেন ? বাংলাভাষায় নতুন এই শব্দটার বয়স দেড়শো বছর হয়ে যাবার পরেও ?

খদ্দরের মতো পৃথুল প্রবন্ধের তলে চাপা পড়ে থাকলে রেশমের মতো মসৃণ রচনার অস্তিত্ব তো বিপন্ন হবারই কথা। তাই ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তকেও তাঁর 'রচনা-সাহিত্য'-উপনামক পুস্তকটি শেষ করতে হয়েছে আক্ষেপের সঙ্গে : 'মোটের উপর মনে

হয়, আধুনিককালে আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য দিক যেভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, রচনা-সাহিত্য সেরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না।...অন্যদিকে গুরুগম্ভীর পল্লবগ্রাহিতায় সাময়িক-পত্রের পত্রগুলি প্রবন্ধকণ্টকে আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আশাপ্রদ ব্যতিক্রম একেবারে নাই তাহা বলিতে পারি না– কিন্তু বড় বিরল'। (পৃ ২০৩-২০৪, প্রাগুক্ত)।

সুকুমার সাহিত্যের এই সূক্ষ্ম রংরূপটিকে সম্যক চিনে নিয়ে এর কাঙ্ক্ষিত লালনে কোনো জটিলতা তো দেখি না। প্রবন্ধ-সন্দর্ভকারের গবেষণা বা তত্ত্বালোচনা নয়, কৌতুকপ্রিয় লেখকের রঙ্গরসিকতাও নয়– এসে বা রচনার প্রধান লক্ষণ হল সৃজন, উদ্ভাসন, আলোকন, স্বপ্রকাশন। এক কথায় এ হল চমৎকৃতিমণ্ডিত এক সাহিত্যিক সৃষ্টি। রচনায় উচ্ছ্বাসেরও প্রশ্রয় আছে, যেটার কোনো আশ্রয়ই প্রবন্ধ অথবা সন্দর্ভে নেই। সেজন্যেই ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠতম কোষকার ডক্টর স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-৮৪) যখন এসেকে 'আ লুজ স্যালি অফ মাইন্ড' বলেন তখন তিনি গদ্যসাহিত্যের রচনা-নামক সংরূপটিকে ওই একটি শব্দবন্ধেই একেবারে খুলে তুলে ধরেন। কারণ, প্রবন্ধ-সন্দর্ভে শৈথিল্য অথবা আকস্মিক উচ্ছ্বাসের কোনো অবকাশই নেই। আসলে এসে'র তো অর্থই হল চেষ্টা– যেটা হতেই পারে আদিহীন, অন্তহীন। প্রবন্ধ-সন্দর্ভের যেহেতু সিদ্ধান্তসংবলিত শেষটা থাকতেই হবে– সেহেতু ওদের আদি-অন্ত তো বটেই, দৈর্ঘ্য-প্রস্থও নির্দিষ্ট; নির্ধারিত।

সংগীতের পরিভাষায় ধরা যাক, সন্দর্ভ-প্রবন্ধ হল ধ্রুবপদ। ধ্রুবপদের নিয়মাবলী লঙ্ঘনপূর্বক নানারূপের অলঙ্কারযোগে যথেচ্ছাচারী গায়নকে যেমন খেয়াল বলা হয়– তেমনি প্রবন্ধের রীতিনীতি ভঙ্গকারী যথেচ্ছাচারী লিখনকে রচনা বলা হয়। তবে লক্ষণীয় যে, রচনা-নামক খেয়ালি লেখার যথেচ্ছাচারের সীমা আছে। টপ্পার ভুবনে ঘুরপাক খেয়ে জমজমা-গিটকিরির কারুকাজ দেখিয়ে– এমনকি গানের পদের প্রত্যেকটি শব্দকে অলঙ্কারে মুড়িয়েও দিতে পারে স্বেচ্ছাচারী খেয়াল।

কিন্তু তারও নিচে নেমে আখড়াই-হাফআখড়াই-আসরের খেমটাওয়ালি সাজার খামখেয়ালি করতে গেলেই খেয়ালি-লেখাটা রচনাসাহিত্যের আসর থেকে ছিটকে, পড়ে যাবে হাস্যরসাত্মক রচনার এলাকায়। অন্য কথায় বর্ণিক মঁতেইনের বংশধর হয়ে যাবে রসিক রাব্‌লের সাগরেদ। মোট কথা, রচনাসাহিত্যকে লঘুশাস্ত্রীয় থাকতেই হবে। লিটারারি এসে বা সাহিত্যিক রচনাকে 'খেয়ালি লেখা' নাম দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেন 'খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস ... আমি খেয়াল-বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী– যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়'। (পৃ ২৩-২৪, বীরবলের হালখাতা)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে বীরবল এই ধ্রুবসত্যটি উচ্চারণ করেছেন : 'হালে বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কারণ থাকত না, যদি না সাহিত্যে

রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার সম্ভাবনা এসে পড়ত। কদলীবৃক্ষের অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গসাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কন নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলীভক্ষণই লেখা আছে'। ('বাংলার ভবিষ্যৎ', সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৪)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'রম্য রচনা'-নামক মনগড়া এক থসথসে কেয়ারির ওপর, প্রমথ-কথিত, অসার সরস এই কদলীবৃক্ষের চাষেরই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে আজ অনেক দশক ধরে।

রচনাসাহিত্যের ওপর আমার-পড়া শ্রেষ্ঠতম রচনাটি হল মরিস হিউলিট (১৮৬১-১৯২৩) লিখিত 'দ্য মে-পোল্ অ্যান্ড দ্য কলাম'। সম্প্রসারিত একটা উপমা দিয়ে এসে-নামক গদ্যশিল্পের খান্দানটিকে তিনি সাক্ষাত পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। উপমিত রচনার উপমান মে-পোল্। উজ্জ্বল গ্রীষ্মের উদ্দামে যুবকযুবতীর দল প্রথমে সবুজ মাঠের বুকে সৃষ্টিমুখর মৌসুমটির একটি প্রতীকী খুঁটি গাড়ে, মৌসুমি পত্রপল্লব ও রঙবেরঙের পুষ্পের আসল-নকল নানান সাজের সরঞ্জাম খুঁটিটির গায়ে সাঁটে– তারপরে সকলে মিলে তারা ওটাকে ঘিরে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে নাচে।

রচনাকারও তাঁর নির্বাচিত বিষয়বস্তুটি মে-মাস্তুলরূপে প্রথমে শূন্য মাঠে পুঁতবেন, তারপর ওটিকে বারবার ঘোরাতে থাকবেন– ডুগডুগি বাজানোর কাজে নয়, খুঁটিটির অঙ্গসৌষ্ঠব এবং সুষম সাজাই সকল দিক থেকে সুদক্ষ আলোকসম্পাতে দেখাবার জন্য। এমনকি বখিল বেকনও পুঁতেছেন তাঁর বিষয়ের খুঁটিটি, সাজানোর বদলে ছুলে-ছুলে তরুমজ্জা পর্যন্ত দেখানোর জন্যে হলেও। হিউলিটের মতে এই মে-পোল গাড়া এবং ওটাকে নজর-কাড়া করাই ছিল রচনাকারের মোট কাজ।

মে-মাস্তুলটি হতে পারত রচনাকারের মুডবিশেষও। উদাহরণ : চার্ল্স্ ল্যাম, যিনি রচনার মুডটিতে নিজের মেজাজ চারিয়ে দিতে গিয়ে জানাজায়ও জোক করতে পিছপা হন না। তাঁর সে-মশকরাকেও বস্তুত মনুষ্যের চিরবিদায় উপলক্ষে মরজগতের প্রতি অবিক্ষুব্ধ একটি সমাপনী স্তুতি জ্ঞান করা যায়– রাব্‌লে যেমন বলেছেন : টু লাফ্ অ্যাট ফেট্ থ্রু লাইফ্'স্ শর্ট স্প্যান/ ইজ দ্য প্রেরগেটিভ্ অফ ম্যান।

কিন্তু রচনাকার আজ মে-পোল-নামক প্রাকৃতিক মাস্তুলটি ছেড়ে কলাম-নামক সাংবাদিক স্তম্ভটি ধরেছেন। তিনি তাঁর নির্বাচিত মাস্তুলটিকে আর মন দিয়ে সাজিয়ে তোলেন না, বদলে তাঁর নির্ধারিত কলামটিকেই ভরিয়ে ফেলেন কোনোমতে– হাবিজাবি রাবিশ দিয়ে হলেও। এভাবে সাহিত্যিক রচনা সাংবাদিক রচনায় অবনমিত হয়ে চলেছে এই তথ্যভোজী যুগে।

সাহিত্যিকতার সঙ্গে সাংবাদিকতার মৌলিক প্রভেদ হল : প্রথমের দূরবিনে খুব কাছের জিনিসের স্বরূপ ধরা পড়ে না, দ্বিতীয়ের গোচরে কাছের জিনিসের মোটা রূপ ছাড়া আর কিছুই আসে না। যেটা আসে সেটা হল মোটা দাগের ম্যাটার, তাৎক্ষণিক

ইফেক্ট সৃষ্টির অমোঘ অস্ত্র– যা দিয়ে আক্রমণ করে পাঠক-মনকে তাঁর তদ্দণ্ডে জয় করতে হয়। কেননা বশীকরণের সময় তাঁর থাকে না। তিনি নিত্যপরিবর্তমাণ বস্তুপরম্পরার অনুধাবক।

প্রতিপক্ষে, সাহিত্যিক রচনাকারের জাদুর কাঠিটি বশীকরণেরই, যেহেতু তাঁকে অনিত্য থেকেও নিত্যকে ছেঁকে তুলতে হয়। হিউলিট বলেন, সাহিত্যিক হলেই কেউ খারাপ সাংবাদিক হয়ে যাবে তেমন কোনো কথা নেই। ল্যাম্ প্রথমত সাহিত্যিক, অবশিষ্টটুকুই সাংবাদিক। স্যাঁৎ-ব্যভ্ প্রতি সোমবারের পত্রিকায় তাঁর তিন হাজার শব্দের 'মান্ডে চ্যাট' লিখেছেন ১৮৪৯ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিশটি বছর ধরে এবং বলেছেন 'সোমবার দুপুরে আমি মাথাটা তুলে ঘণ্টাখানেক শ্বাস নিয়ে আবার সাতদিনের জন্য আমার কারাকক্ষে অন্তরীণ হয়ে যাই'। এর ওপর মন্তব্য করেছেন ম্যাথু আর্নল্ড : এই মূল্যেই মিলেছে 'কোজ্‌রি'। দুই প্রভুর সেবা করার মতো কঠিন কাজে এই মূল্য দিতেই হয়। এম. জে. আকবর অনিত্যের কারবারী সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তিনি যখন গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো গুরুতর দুর্ঘটনার ওপরও লেখেন, তখন ওতে নিত্যের মূল্যই বর্তায় এবং তাতে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর দাম কিছুমাত্র কমে না।

কথাটা আমি বাড়ালাম দুই কারণে। এক, সাহিত্যিক আর সাংবাদিক একই পাড়ার বাসিন্দা। দুই, বর্তমানে লেখালেখির জমি-জমা বলতে গেলে দ্বিতীয়েরই দখলে। তিনি সদয় না হলে রচনাসাহিত্যের চাষটা হবে কোথায় ? সুতরাং তিনি যেন জিনিয়াসটা জীবনকে দিয়ে আর ট্যালেন্টটা কাজকে গছিয়ে অস্কার ওয়াইল্ডের আক্ষেপটা আর না বাড়ান– বরং কিছু পেটুক 'কলাম' উপড়ে ফেলে, কিছু রঙিন 'মে-পোল্' পোঁতেন। ভূমিহীন হয়েও সাহিত্যিকগণ কিছু চমৎকার রচনা আজো লিখে যাচ্ছেন কল্পনাগৌণ গদ্যের ভুবনে। সেজন্যেই 'অক্সফোর্ড বুক অফ এসেজে'র নির্বাচক ও সম্পাদক জন্ গ্রস্ তাঁর ভূমিকায় বলতে পারেন 'সার্টেনলি দেয়ার ইজ নাথিং টু সাজেস্ট দ্যাট দ্য এসে ইজ ডায়িং' বরং আরেক ধাপ আগে বেড়ে বলতে পারেন 'আ ফর্ম দ্যাট হ্যাজ অলরেডি লেড্ সো মেনি লাইভ্স ইজ ভার্চুয়েলি আনকিলেব্‌ল'।

এই অবধ্য রচনাসাহিত্যকে বাংলা ভাষায় আজ বধ্য বলেই মনে হচ্ছে এজন্যে যে এ আসরে সেরা গদ্যকার আর আসতে চাচ্ছেন না, স্রেফ ড্রেস নির্বাচনের ভয়ে– পাঠকসমীপে তিনি কী পরে আসবেন ? লাউঞ্জস্যুট পরে নামবেন, না কি ড্রেসিংগাউনেই চলে আসবেন ? আমাদের লেখকের সকারণ সন্দেহ যে আমাদের পাঠক হয়তো উদ্ভট কম্বিনেশনই আশা করে বসে আছেন– লুঙ্গির ওপর কোট।

ওদিকে পেঙ্গুইনের 'আ বুক অফ ইংলিশ এসেজে'র নির্বাচক সার এম্‌রিস উইলিয়াম্‌স তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছেন যে রচনা-পাঠকের কাছে অলিভার গোল্ডস্মিথ (১৭২৮-৭৪) ড্রেসিংগাউন পরেও চলে আসতেন, তবে ইংরেজি রচনাসাহিত্যের প্রকৃত পিতা যোসেফ অ্যাডিসন পাঠককে অভ্যর্থনা জানাতেন না– 'আন্টিল্ হি ইজ ড্রেস্‌ড্

অ্যান্ড পাউডার্ড'। তবু অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের অভিভাবক স্যামুয়েল জনসন অ্যাডিসনকেই বলেছেন 'আ কুল্ কারেন্ট অফ ডিলাইট'। প্রকারান্তরে, জনসন রচনাসাহিত্যের মর্মকথাটিই বলে দিয়েছেন এই একটিমাত্র ফ্রেজে– 'স্নিগ্ধশীতল আনন্দধারা।'

কিন্তু কোথায় সে আনন্দধারা আমাদের ? 'বুক অফ ইংলিশ এসেজ' তো অজস্রই দেখা যায়। দেখা যায় বাংলা প্রবন্ধসংগ্রহও। কিন্তু বাংলা রচনাসংগ্রহ কোথায় ? আছে– মাধ্যমিক ক্লাসরুমে আর পরীক্ষার খাতায়, যা পরীক্ষকের ব্যবহারের পরে কাগজের ঠোঙা হয়ে হাট-বাজারে চলে যায়। ওটা লেখানো হয় সম্ভবত ছোটদের সৃজনশীলতা দেখার জন্য। কিন্তু তা দেখানো তো নম্বর হারানোর ঝুঁকির নামান্তর হতে পারে পরীক্ষার্থীর।

নদীর ওপর রচনা লিখতে গিয়ে সুকুমার কলমবাজ, হাঙর-কুমিরকে বন্ধু বানিয়ে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে নিজেকেও কল্পনার রঙে রাঙিয়ে ফেললে– কোনো সৃজনবিমুখ কিংবা রোমাঞ্চভীরু পরীক্ষকের হাতে পড়ে গিয়ে তাকে শূন্যও পেতে হতে পারে। কাজেই গার্জেনের পরামর্শে, নৌকার বদলে গোরুর পিঠে চড়ে নদীর তীরে গিয়ে, সহায়ক গ্রন্থ থেকে মুখস্থ-করা, গোরু বিষয়ক প্রবন্ধটি লিখে দিয়ে সে নিশ্চিত দাঁওটাই মারে।

এ প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব : কাঁচা লেখকদের প্রবন্ধ লিখতে দিয়ে, রচনাটা বরং পাকা লেখকগণই লিখুন। কারণ প্রথমটা লিখতে প্রাজ্ঞজনই পারেন, দ্বিতীয়টা লিখতে তাঁকে ভূয়োদর্শীও হতে হয়।

এ-কথাটা এতটা বলার কারণ, বিংশ শতকে এসে'র অবমূল্যায়নের জন্যে একাডেমিও অনেকাংশেই দায়ী। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আক্ষেপ : যে-ভাষাটিতে শ্রেষ্ঠতম আধুনিক রচনা লেখা হয়েছে, সে-ইংরেজি ভাষার রচনাসাহিত্য তার কুলীন জাত্যর্থ হারাবে স্কুলছাত্রের অপরিপক্ক অনুশীলনের অপরিণত রচনা-নামক অভিন্ন পরিভাষাটার কারণে ! উপনিবেশকের বিদ্যালয়ের সে-অশুভ প্রভাব পুরোপুরি পড়েছে তার তদানীন্তন উপনিবেশে, এ-বাংলার বিদ্যালয়ে। রচনা-শব্দটি শোনামাত্রই শ্রোতার মানসপটে ফুটে উঠবে চিরকেলে পিলে-চমকানো পরীক্ষকের সুপরিচিত প্রশ্নটি : 'রাইট অ্যান এসে! একটা রচনা লিখ !'

রচনা-লেখার মতো সৃজনশীল কর্ম স্কুলছাত্রের পরীক্ষা-হলের সম্পাদ্য বিষয় কী করে হয়– যেটা লেখার পূর্বশর্ত হল অগাধ জ্ঞান এবং অশেষ পাণ্ডিত্য, অথচ যার প্রকাশে থাকবে না দিগ্‌গজপনা, বিশেষজ্ঞপনা ? রচনায় থাকবে স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রাণবন্ত তা, উচ্ছ্বাস, উদ্যম, উদ্দীপনা– থাকবে অন্তরঙ্গতা, আকর্ষণ, আবেদন। শ্রেষ্ঠ রচনাকারের লেখায় বিষয়টিকে মনে হবে 'প্রাপ্ত অছিলামাত্র', 'প্রদত্ত কর্মভার' নয়। রচনা তার পাঠককে প্রত্যক্ষ করাবে খাসা মেজাজের মার্জিত রুচির কর্মরত একটি সূক্ষ্মদর্শী মনকে। ক্লাসরুমে কিংবা পরীক্ষা-হলে আদিষ্ট হয়ে বিশ-ত্রিশ মিনিটের

মেয়াদে লিখে জমা দেবার বস্তুটি, তথ্যপ্রধান প্রবন্ধ দৈবাৎ যদি-বা হতে পারে– শৈলীপ্রধান রচনা হতে পারে না কিছুতেই ।

ম্যাথু আর্নল্ড বলেন : যাবতীয় অমূর্ততা, অশালীনতা, রুক্ষতা, দুরূহতা, উন্নাসিকতা, বৃত্তিনিষ্ঠতা চেঁচে-ছুলে তুলে ফেলে জ্ঞানকে মনোজ্ঞতা দান করার প্রবল উৎসাহ থাকতে হবে শ্রেষ্ঠ রচনাকারের । এতখানি সামর্থ্য শিক্ষার্থী কিংবা পরীক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশিত নয় । অথচ তাকেই লিখতে হয় রচনা এবং তা-ও পরীক্ষালয়ে বসে ঘড়িতে চোখ রেখে– যা লেখার চেষ্টা করতে পারেন তার পরীক্ষক নিজের আলয়ে বসে, অবসরের ফাঁকে অথবা অখণ্ড অবকাশে ।

গল্প

মনির জামান

.....

পিঠটান

প্রবাসজীবনের দুই দশকের মাথায় আবু মিয়ার মনে হল– কুত্তা খাওয়ার দেশে আর কতকাল । এবার ফিরে যাওয়া ভালো । রূপসী বাংলার কয়েকটা চিত্র কল্পনায় ভেসে উঠলে বুকের ভেতর হায়-হুতাশ শুরু হয় । টাকাতো সে অনেক কামাইছে । এবার বরং মায়ের মুখ দেখে, শিশুর মুখ দেখে, স্ত্রীর দু'পায়ের পেজগিতে বাঁধা খেয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়াই উত্তম ওম রসিকের পরিচয় । আবু ক্যালকুলেটিভ মানুষ । জীবনের সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফটাফট ডেবিট ক্রেডিটের কারেন্ট হিসাব মিলিয়ে । জয়ও পেয়েছে ষোল আনা । শুধু পুটির মার কাছেই শোচনীয়ভাবে পরাজিত । কলেজজীবন থেকেই ওর সঙ্গে আবু পেরে ওঠে না । তবুও পুটির মাকেই সে ভালোবাসে । পুটির মা যদি বলে 'সিট ডাউন' তখন শুয়ে-বসে আরাম করতে আবুর ভালো লাগে । কিন্তু কুড়ি বছর ধরে একটানা বলে যাচ্ছে– 'গো আবু, ডু জব এন্ড মেক মানি । গো আবু, গো ... । আবু এবার আর এই আদেশ মান্য করে না । সিউলের বান্ধবহীন পরিবেশে একটানা কাজ করতে তার ফাঁপড় লাগে । মনে মনে বলে– আমি কী কলুর বলদ? কুত্তা-খাওয়া

গন্ধঅলা মেয়েদের সঙ্গে কি বেশি মেশা যায়! কন্যার জন্য আবুর প্রাণ কান্দে। পুটি টেলিফোনে বলে– কাইন্দো না বাজান, দেশে আইসা পড়ো। আবু বলে– তোর মাতো মানা করে। খালি কয়, ডু জব আবু। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল। সময় হলে আমিই তোমাকে ডেকে পাঠাব। পুটি বলে– কউক গা। দেশে আইসা কিছু একটা করতে পারবা। না করলেও সমস্যা নাই।

আবু বলে– মা জননী, তুমিই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পার। এইজন্য তোমাকে এত ভালো লাগে। পুটি ওর মায়ের ভঙ্গিতে বলে– ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল বাজান। সাহসী হও। তোমার সব আছে– শুধু সাহসের অভাব। পুটি ঠিকই বলেছে। সে আর মাগিমার্কা পুরুষ থাকতে চায় না। দ্রুত সিউলের পাট চুকিয়ে বিমানের টিকেট কনফার্ম করে মনের আনন্দে গুনগুন করে উঠে– ওরে নীল দরিয়া/ আমায় দে রে দে ছাড়িয়া/ বন্দি হইয়া মনোয়া বধূ আমার/ কান্দে রইয়া রইয়া...।

কাঁথাকম্বল গুছাইয়া আবু মিয়া দেশে ফিরা আসতেছে এই সংবাদ শুনে ভাই-ব্রাদাররা হায় হুতাশ শুরু করে দেয়। টেলিফোনে বলে– ও ভাই, দেশে আহিস না। দেশের অবস্থা ভালো না। দেশে এখন পুলিশ আর মস্তান ভায়রা ভাই। আমাগের লাইগা বরং ভিসা পাঠা। আমরাও কুত্তা খাওয়ার দেশে যাইগিয়া।

আবুর সিদ্ধান্ত শুনে পুটির মা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে– কী! দেশে আইসা আরাম করবা! পুটি হপায় ভার্সিটিতে ঢুকছে। এখনই তো বেশি বেশি টাকা দরকার। ভার্সিটির বেতন কত জানো? মাসে লাখ টাকা।

আবু বলে– দেশে এসে আমি ব্যবসা করব।

পুটির মা বলে–চ্যাটটা করবা। তোমার মতো ভোদাইরে পাইলে এমপি-মন্ত্রীরা কিমা বানাইয়া খাইয়া ফালাইবো। দেশে আইসা টাকা নষ্ট করার ফন্দি। মাথা ঠাণ্ডা কইরা কাজ করো আবু। হোম সিকনেস মারাত্মক রোগ। সিউলে ভালো ভালো সাইক্রিয়াটিস্ট আছে শুনছি। ওদের লগে কথা কও। দিনে দুইটা কইরা লিথিয়াম খাও। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল আবু ...।

আবু বেডিং-বক্স বান্দে আর মনে মনে বলে– কাভি নেহি পুটির মা, এখন থেকে তুমিই আমার কথা মতো চলবা। সংসারের হাল এইবার নিজের হাতে নিয়া নেবো। বুঝলা ফুটফুটা সুন্দরী, আমি আইসা পড়তাছি।

বিদেশি এয়ারলাইন্সের বিমানে আরামের ঘুম দিয়ে আবু মিয়া যখন ঢাকার মাটিতে নামে তখন রাত আড়াইটা। বাতাসের গন্ধ শুঁকে মনে মনে বলে– আহা বাংলার হাওয়া! আহা জন্মভূমির মাটি! আহা সোনার বাংলা, কতদিন দেখি না তোমায়...। প্লেন সাত ঘণ্টা লেট। পুটি নিশ্চয় বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতেছে। আবু মোবাইল করে কিন্তু অপারেটর মেয়েটা বলে– আপনার কাঙ্ক্ষিত নম্বরটি এই মুহূর্তে বন্ধ আছে। পুটির মা'র নম্বরও বন্ধ। ভাই-ব্রাদারদের নম্বরেরও একই অবস্থা। ঘটনা কী! আবু এয়ারপোর্টের মানি এক্সচেঞ্জ থেকে ডলার ভাঙিয়ে মনে মনে বলে– মা পুটি, তুমি নিশ্চয় আমার

লাইগা খাড়াইয়া আছ। খাড়ায়া থাকতে থাকতে তোমাগো ব্যাকতের চার্জ ফুরাইয়া গেছেগা বুঝি? সমস্যা নাই, আমি আইসা পড়ছি। এখন থেইকা তুমি বাপের কোলে কোলে থাকবা....।

লাগেজ-ব্যাগেজ বুঝে নিতে আবু মিয়া কাস্টমস চেকিং-এ দাঁড়ায়। আগে যতবার এসেছে ভাই-ব্রাদারদের কেউ না কেউ বিমানবন্দরের অন্দরমহল পর্যন্ত ছুটে এসেছে। মালামাল খালাস করেছে ভাই-ব্রাদাররাই। এবার কাউকে চোখে পড়ে না। অগত্যা তাকেই কাস্টমস অফিসারের মুখোমুখি হতে হয়। কাস্টমস ভাই বলে– লাগেজ-ব্যাগেজের চাবি দেন।

আবু বলে– আমি খুলে দেখাচ্ছি।

কাস্টমস ভাই বলে– কষ্ট করার দরকার কী। আপনি রেস্ট নেন। বলতে বলতে লোকগুলো আবুর ব্যাগের জিনিসপত্র ঘাঁটতে শুরু করে। একজন বলে– বাহ্ ভালো সেন্ট তো। ডিজিটাল ক্যামেরাটাও নতুন মডেলের। এগুলো আমি নিয়া নিলাম, বড় ভাই।

আবু অবাক হয়ে বলে– কন কী! আপনি কেন নেবেন?

কাস্টমসের লোক বলে– এগুলো আনা অবৈধ।

আবু ক্ষেপে যায়–নো। রং ল। নো লজ। ওয়েবসাইটে দেখেছি ঢাকা কাস্টমস নাকি ডাকাতদের আস্তানা। তাই বলে আমার সেন্টের শিশি নিয়া যাবেন! এইটা ক্যামন আবদার।

কাস্টমসের লোকগুলো আবুকে ঘিরে ধরে খিক-খিক করে হাসতে থাকে। ওরা বলে– আরে মিয়া, জিয়া বিমানবন্দরের সেলামি না দিয়া প্রধানমন্ত্রীও আপডাউন করতে পারে না। ওদের হাসি ও দৃষ্টিভঙ্গি এমন, আবু ভয় খেয়ে যায়। একজন বলে– ঢং কইরেন না। মাল ছাড়েন। নাইলে লাগেজের লগে কোরিয়া পাঠাইয়া দিমু। রিটার্ন ফ্লাইটে তুইলা দিলেই ফুড়ুৎ ...। কাস্টমসের লোকেরা মানিব্যাগ থেকে বেশ কিছু ডলার তো নিলই সেন্টের শিশি, ক্যামেরা, মোবাইল সেট, রেড ওয়াইনের দুইটা বোতল নিজের মনে করে নিয়ে নেয়। তারপর বলে– এইবার যান। বহুদিন পর দেশে আইছেন। বাড়ি গিয়া লম্বা একটা ঘুম দেন।

ই-মেইলের শেষ ম্যাসেজে আবু মিয়া লিখেছিল– ডিয়ার পুটির মা, আই এম গোয়িং টু সিউল এয়ারপোর্ট। ঢাকা পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে যাবে। পুটিকে নিয়া চলিয়া আইসো...। পুটির মা এয়ারপোর্ট যায়নি। এত করে রিকোয়েস্ট করেছে, তুমি কষ্ট কইরা আরো পাঁচটা বছর থাইকা আসো। তা-না, আইবোই। গোঁয়ারের ঘরের গোবিন্দ। মা যায়নি বলে পুটিও রাগ করে বাসায় বসে থাকে। মা কেন বাবাকে দেশে ফিরতে নিষেধ করে– পুটির কাছে এটা বিরাট প্রশ্ন। এ নিয়ে মা-মেয়ের তর্ক চলতেছিল। পুটির মা এনজিও-কর্মী। তার ওপর ভীষণ স্বেচ্ছাচারী। পুটির রগও কম ত্যাড়া না। তর্কের ফাঁকে ফট করে বলে ফেলে– মনে করছো আমি বুঝি না?

পুটির মা ক্ষেপে যায়– ঐ বান্দরের ঝি। কী বুঝস তুই? পুটি বলে– বাপে ফিরা আইলে তো তোমার পিরিত ডিস্টার্বড হয়া যাইবো। এতো লুকাছাপার দরকার কী, জাফর আঙ্কেলেরে বিয়া কইরা তুমি যাও গিয়া। বাজানরে আর ঠকাইয়ো না..।
মেয়ের কথা শুনে পুটির মা স্তম্ভিত হয়ে যায়– কী! এই কথা। পেটে কইরা আমি কালসাপ পুষছি। আবু কি নীরবে আমাকে দ্বিচারিণী ভাবতেছে! আবু এতখানি ছোটলোক। মেয়েকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে টেলিফোনে এইসব আলাপ করেছে এত দিন! কোনো অবিশ্বাসীর মুখ দেখতে চায় না পুটির মা। রাগে ক্ষোভে প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। পুটিরও অস্থির লাগে। কী বলতে কী বলে ফেলেছে! বাবার সঙ্গে মায়ের একচোট হয়ে যাবে। কী করা যায় বুঝে উঠতে না পেরে চার-পাঁচটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে পুটি গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।
ভাই-ব্রাদারদের কেউ এয়ারপোর্টে যায়নি। যাওয়ার উপায় নেই। দুর্নীতির দায়ে কেউ জেলে, কেউ গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ওদের স্ত্রীরা যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পুটির মা'র মেজাজ দেখে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। পুটির মাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিল, কয়টায় আসবে আবু ভাই? পুটির মা বলেছে– সারা বছর খবর পাই না। ভাই ডলার নিয়া আসতেছে শুইনা টেলিফোনের হিড়িক পড়ছে। আমারে আর কত জ্বালাইবা...। ভাই-ব্রাদারদের বউরা জানে, পুটির মা পাছাফুলা। কিন্তু ভাবীর ঔদ্ধত্য এতদূর যাবে, ভাবেনি। ওরা বলেছে– থাক ভাবী, আর জ্বালাবো না। ভাইকে নিয়া এবার সুখশান্তি করেন। বাই-বাই টা-টা।
এতসব কাণ্ড কারখানার কিছুই জানে না আবু। কাস্টমসঅলাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে পুটির মাকে, পুটিকে, ভাই-ব্রাদারকে খোঁজে। ফ্লাইট লেট দেখে সবাই কি বাসায় ফিরে গেছে? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আবু মিয়া ট্যাক্সিঅলাদের সঙ্গে কথা বলে। সব ট্যাক্সিচালকদের একই কথা– দুই হাজার টাকা দিতে হবে।

আবু অবাক হয়– এত কেন? মগের মুল্লুক নাকি!
ট্যাক্সিঅলারা আবুকে ঘিরে ধরে হাসতে থাকে– আরে ভাই মগের মুল্লুক হতে যাবে কেন। বাংলাদেশ এখন গণতন্ত্রের রোডম্যাপ ধরে এগুচ্ছে। ফ্রি ইকনমিতে মিটার কোনো ব্যাপার না। দুই হাজার তো নর্মাল রেট। লন্ডনের প্যাসঞ্জারগো রেট তিন হাজার। যারা নিউইয়র্ক থেকে আসে তাদের কাছ থেকে পাঁচ হাজার না খসাতে পারলে ঢাকার ট্যাক্সির ইজ্জত পাঞ্চার হইয়া যায়। অগত্যা আবু মিয়া বলে– চলো, মাল উঠাও।
আহা বাংলাদেশ! রাতের ঢাকা এত সুন্দর! জাপানি ট্যাক্সি, সোডিয়াম আলো, রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান! এলাহি কারবার! কে বলে দেশের উন্নতি হয় নাই। মুগ্ধ হতে হতে আবু মিয়ার মুগ্ধতা হঠাৎ কেটে যায়– ঘটনা কী ড্রাইভার। থামলা কেন?
ড্রাইভার বলে– মামুরা ঠেক দিছে।

কয়েকজন যুবক ট্যাক্সিটাকে ঘিরে দাঁড়ায়। আবু বলে– এরা কারা? কী চায়?
ড্রাইভার বলে– এরা লাইনের মামু।
যুবকরা আবুর দিকে পিস্তল তাক করে বলে– মাল ছাড়েন, পরদেশি মামু।
আবু হকচকিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকায়।
ড্রাইভার বলে– পাঁচ হাজার টাকা দিয়া দেন। এরা মানুষ ভালো। বান্ধা রেটে গাড়ি পার কইরা দেয়।
আবু গাঁইগাঁই করলে পিস্তলধারী বলে– ম্যালা কামাইছেন, মাল ছাড়েন। নইলে বেহেস্ত পাঠাইয়া দিমু।
অগত্যা পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মনে মনে গজরাতে থাকে আবু– আমি হইলাম ঢাকার পোলা। ঢাকায় ঢুকতে আমারেই ট্যাক্স দিতে হইলো! খাড়া। বাসায় যাইয়া লই। পুলিশ দিয়া প্যাদানি না খাওয়াইলে আমার নাম আবু মিয়া না...।
দেশে পৌঁছে এসব হাঙ্গামার জন্য আবু ভাই-ব্রাদারদের দোষে। রাইত দুইটা বাজুক আর চারটা বাজুক হারামখোরের দল, তোরাতো এয়ারপোর্টে খাড়ায়া থাকবি। আবু পুটিকে ফোন করে। রিং হয়। পুটি ধরে না। পুটির মাকে ফোন করে। রিং হয়। পুটির মা-ও ধরে না। ঘটনা কী! নিশ্চই কোথাও কোনো গিট্টু লাগছে। ড্রাইভার হঠাৎ গাড়ি সাইড করে। একজন সার্জেন্টকে মটর সাইকেল নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবে– এর কাছে ছিনতাইকারীদের কথা বললে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু ওই প্রসঙ্গে যাওয়ার সুযোগ পায় না আবু। সার্জেন্ট ওকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে বডি সার্চ করে। ট্যাক্সির বুট খুলে লাগেজ দেখে জানতে চায়– কই থেইক্যা আইছেন?
সাউথ কোরিয়া।
বাহ্। কুইক দেন। পাঁচ হাজার মাত্র।
আবু ড্রাইভারের দিকে তাকায়– কিসের টাকা!
ড্রাইভার বলে– উত্তুবুত্তু কইরেন না। এরা সরকারি মামু। এগোও বান্ধা রেট। দিয়া দেন, স্যার।
না দিলে?
গাড়ি সহ থানায় লয়া যাইবো। দুইজনরেই লকআপে ঢুকায়া রাখবো।
কেন? আমরা কী কোনো অন্যায় করছি?
ন্যায়-অন্যায় ব্যাপার না। সরকারি মামুগো পাওয়ার আছে। আইনের ধারা ফিফটি ফোর। থানায় গিয়া হেরইনের পোটলা ধরায়া দিয়া কইবো, বিদেশ থেইকা মাদকদ্রব্য নিয়া আইছেন। এই মামলায় বেল নাই।
বলো কী! আবু ভয় পেয়ে যায়।
ড্রাইভার হাসে– দিয়া দেন, স্যার। দিলেই খালাস।
পুলিশকে টাকা দেওয়ার পর আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি আবুকে। ভোররাতের নিস্তব্ধ পথ ধরে গুলশানে নিজের বাড়িতে পৌঁছে যায়। লাগেজ-ব্যাগেজ

নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার বলে– মাত্র দুই হাজার দিলেন। আপনারে কতগুলা ফারা থেইকা বাঁচাইয়া আনছি, এর লাইগা কী বকশিস পামু না।
রাগ চেপে আরো পাঁচশ দিয়ে আবু বলে– বাঁচাইতে বাঁচাইতে আনছো নাকি খসাইতে খসাইতে আনছো। আমি বুঝি না ভাবছো! যাও। কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। পুলিশ-ডাকাত-ড্রাইভার-কাস্টমস মিল্যাঝিল্যা ভাল সিন্ডিকেট বানায়া লইছো। সাব্বাস।
পথের ধকল ভুলে আবু মিয়া হাঁক ছাড়ে–পুটি, ও পুটি, আমার মা জননী, কোথায় তুমি? এই যে দেখো, তোমার বাজান আইসা পড়ছে..।

জগতের রীতি হল কিছু মানুষ যখন আপনাকে পিঠ দেখাবে অন্যকিছু মানুষ তখন বুক পেতে দেবে। দয়া এবং নির্দয়তার স্টিমের ভিতর দিয়ে মানুষ দিন মাস বছর পার করে। কিন্তু বাড়ি ফিরে আবু মিয়া আরো ফাঁপড়ে পড়ে যায়। তাকে দেখে বাড়ির লোকজন গাল ফুলিয়ে থাকে। ভাই-ব্রাদাররা দুর্নীতির দায়ে দৌড়ের উপর আছে। ভাই-ব্রাদারের বউদের ফোন করলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে– হ মিয়াভাই, সংসার নিয়া ঝামেলায় থাকি। দেশের অবস্থা ভালো না...। পুটির মার সঙ্গে কথা বলার চান্সই পায় না আবু। সকালে এনজিওর কাজে বের হয়; ফেরে রাত দশটা এগারোটার দিকে। পুটিও ব্যস্ততার ভান করে বাপকে এড়িয়ে থাকে। আবু মিয়া সকালে জিজ্ঞেস করে– কই যাইতাছো, মা জননী।
পুটি বলে– ভার্সিটিতে।
তুমি কোন ভার্সিটিতে পড়?
কিং কং ইউন্যুভার্সিটিতে।
কোন সাবজেক্ট?
কর্পোরেট কালচার এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।
খাইছে! এইগুলা পড়ার কী আছে! এইসব বিদ্যা তো ধান্দাবাজি শিখায়। তুমি ইতিহাসে ভর্তি হইতা। পিওর ইকনমিক্স পড়তা। তাইলে বুঝতাম তুমি উচ্চশিক্ষা নিতাছো...।
বাবার কথা শুনে পুটি বিরক্ত হয়। বাবা একটা খেত। দীর্ঘদিন একা একা থেকে আরো যেন বোকা হয়ে গেছে। ছেলেমানুষের মতো কী সব বলে, আগামাথা নাই। ক্যামন যেন অতিথি অতিথি ভাব করে থাকে। সিউলে থাকতে টেলিফোনে যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল, দেশে আসার পর সেই মানুষটাকে খুঁজে পায় না পুটি। সে বলে– যাই বাবা, আমার ক্লাস আছে।
আবু বলে– ড্রেস পাল্টাইয়া যাও।
ড্রেস পাল্টাবো মানে? পুটি চোখ সরু করে বাপের দিকে তাকায়।
না মানে, জিন্স-গেঞ্জি পইরা ক্লাসে গেলে টিচাররা তোমার বুক আর পাছার দিক চাইয়া থাকবো। তোমার স্যারের কনসেনট্রেশন ব্রেক খাইয়া যাইবো।

বাপের কথা শুনে পুটি খিলখিল করে হেসে উঠে– শোনো বাবা, ঢাকা এখন অনেক ফরোয়ার্ড। টিচিং প্রফেশন এখন অনেক ক্যাজুয়েল। কারো দিকে কারো তাকাবার সময় নাই।

আবু বলে– পেপারে দেখলাম, কোন ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের নামে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ তুইলা ক্যাম্পাসে মিছিল হইছে। ঘটনা কী বলতো শুনি!

ওসব হল পলিটিক্স। তুমি ভাইবো না। আই এম এনাফ ম্যাচিওর, বাজান। টিভি দেখ, বাই বাই টা টা।

কোরিয়া যাওয়ার আগে পুটির মাকে প্রেগনেন্ট করে রেখে গেছিল আবু মিয়া। তখন দু'জনের উথালপাতাল পিরিত। রিক্সায় ঘুরে বেড়ায়। মধুমিতায় সিনেমা দেখে। রমনায় বইসা চিনাবাদাম খায় আর ভবিষ্যত নিয়া চিন্তাভাবনা করে। কিন্তু সুখ যে স্রেফ আকাঙ্ক্ষা, পরিপূর্ণভাবে কোনোদিন ধরা দেয় না, এই কথা জেনেও পুটির মা সুখ চায়।

আবু বলে– আমরা তো সুখেই আছি।

পুটির মা বলে– রিক্সায় চইড়া ধুলাবালি আর কালো ধুঁয়া খাওয়ার নাম সুখ! এমন সুখ আমার দরকার নাই।

আবু বলে– ক্যামন সুখ তোমার দরকার কও দেহি?

পুটির মা বাড়ি-গাড়ি চায়। পার্টি প্রোগ্রামে সন্ধ্যা কাটাতে চায়। মাঝে মাঝে দার্জিলিং মাদ্রাজ গিয়ে হাওয়া খেতে চায়। এসবের আকাঙ্ক্ষা আবুরও। কিন্তু আয়-রোজগার যা তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। আবু বলে– তাইলে তো আলাদিনের চেরাগ লাগবে।

পুটির মা বলে– তাইতো। ধনী হওয়ার সর্টকাট ওয়ে বের করো।

আবু বলে– দেখি।

পুটির মা বলে– দেখাদেখির কিছু নাই। যে কোনো একটা চান্স নিয়া নাও।

আবু মিয়া মনে মনে চান্স মোহাম্মদ হয়ে যায় এবং হঠাৎ করে সুযোগও আসে। কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের কাগজপত্র দেখিয়ে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের লোন তোলে। পুটির মা শাড়ি কেনে, গাড়ি কেনে, পার্টি প্রোগ্রামে খরচ করে। সে বলে, টাকাগুলো কাজে লাগাই। কিছু জমি আর নতুন মার্কেটে কয়েকটা দোকান কিনে রাখি।

আবু বলে– কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করবো না!

পুটির মা বলে– ইন্ডাস্ট্রির গুষ্টি মারো। মাটি হইল সোনা।

কথায় আছে, গুড়ের লোভে পিঁপড়া আসে। জাফরুল্লা আদম ব্যবসা করে। সে পুটির মার বন্ধু। আবুর কাছে টাকা আছে জানতে পেয়ে বলে, ব্যাংক ইন্টারেস্ট রিকভারির ঝামেলা শুরু হওয়ার আগে আবুর বিদেশে চলে যাওয়া উচিত। দেশে থাকলে নানাজনকে ঘুষ দিতে হবে। নানা গোঁজামিল দিয়ে চলতে হবে, বহুত হাঙ্গামা। পুটির মা বলে– তাইলে আবু বিদেশে চলে যাক। তুমি ভিসার ব্যবস্থা করো। আবু বলে– ব্যাংকের অফিসাররা খোঁজ নিলে কী বলবা?

পুটির মা বলে– ইন্টারেস্টের জন্য চাপ দিলে বলবো ইন্ডাস্ট্রি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় তুমি আউলাই হয়া কোনখানে চইলা গেছো, কইয়া যাও নাই ।
আবুর দোনোমোনা ভাব দেখে পুটির মা বলে– গো আবু । ডু জব এন্ড মেক মানি ।
ব্যাংক লোনের কয়েক লাখ টাকা গায়েব করে দিতে আবুর ভয় হচ্ছিল । পুটির মা যতই সাহস দেখাক, ঝামেলা হলে আবুই ফেঁসে যাবে । এমন সময় জাফরুল্লা শরাফতের প্রস্তাবটা খারাপ মনে হয় না । বাসায় বসে কেরুর ভদকা খায় আর ডেবিট-ক্রেডিটের ক্যালকুলেশন করতে করতে হঠাৎ একদিন বলে ফেলে– আমি যাই গিয়া । দেরি করলে বাইরে যাওয়ার টাকাও শেষ হয়া যাইবো । পরের টাকা একটা জ্বালা ।
পুটির মা বলে– গো আবু, মাই জান, গুড ডিসিশন নিছো । অল্প কয়টা বছর কাটাইয়া আসো, প্লিজ । টাকা দরকার ।
আবু বলে– আমারে ছাড়া থাকতে তোমার কষ্ট হইবো না?
পুটির মা বলে– কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না, ডার্লিং । তুমি যতদিন থাকবা না ততদিন কেষ্ট ঠাকুররে পূজা দিমু ।
আবু অভিমান করে– বুঝেছি, কেষ্ট ঠাকুরের ভুড়ি মোটা, এর লাইগা ।
পুটির মা হেসে আবুর গায়ে লুটিয়ে পড়ে– না গো না । তুমিই আমার কেষ্ট ঠাকুর । যতদিন থাকবা না ততদিন ঘুম আইবো না । তোমার ফটো বালিশের তলে রাইখা চোখ বুইজা একা একা করতে থাকবো ।
কুড়ি বছরের প্রবাসজীবনে চারবার দেশে এসেছিল আবু মিয়া । কোনো বারই মনে হয়নি পতি-বিরহে পুটির মা ব্যাকুল হয়ে আছে । বরং একাধিক পুরুষের সঙ্গে হেসে ঢলে গালগল্প করতে দেখছে । জাফরুল্লা শরাফত প্লেনের টিকেট আবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে রঙ্গরসাত্মক কী যেন বলে পুটির মার সঙ্গে সেই যে হাসাহাসি করতেছিল, তেমন অন্তরঙ্গতা পরেও দেখেছে আবু । জাফরুল্লা তাকে কিঞ্চিৎ অপদার্থই মনে করে বলে আবুর ধারণা । তার সঙ্গে লোকটা সব সময় একটা ব্যাপারেই আলাপ করে– টাকা কামাই করেন আবু মিয়া । টাকা না থাকলে পুরুষের দাম নাই । আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ভাইবেন না । ওর পাশে আমি আছি... । মেজাজ খারাপ করে আবু মনে মনে বলেছে, টাকা কামাই করুম না হুইয়া থাকুম– তোর কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি । আমার বউ-এর পাশে থাকবি ক্যান! আমার বউ কী অবলা, নাকি তোরে চাকর রাখছে । কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রেখে । জাফরের সঙ্গে সবসময় মধুর ব্যবহার করে গেছে । জাফর যেমন আবুকে বলে, টাকা ছাড়া পুরুষের দাম নাই; আবুও নানান খাজুইরা আলাপ শেষে বলে, আর মোটা হয়েন না জাফর সাহেব । হঠাৎ বাস্ট হয়া যাইতে পারেন । আবুর কথা শুনে জাফর সবসময় মুচকি মুচকি হাসে । নিজের শরীরের অবস্থা নিজে অনুমান করা কঠিন । এবার জাফরুল্লাকে দেখে আবুর করুণা হয় । মোটার চোটে লোকটা হাঁটতে পারে না । থপ থপ করে আবুর ড্রয়িংরুমে ঢুকে সোফায় ধপাস করে বসে এমনভাবে হাসে, গালের মাংসে ভাঁজ পড়ে যায় । আবু টিটকারি করে বলে–

মাশাল্লা আপনার দেখতাছি আরো উন্নতি হইছে। শুয়োরের মতন গাবদা গোবদা লাগতাছে। শুয়োরের সঙ্গে তুল্য করায় জাফরের মন খারাপ হয়। তবুও ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলে– চর্বির চাপে হার্টের গল্লি চিকন হয়া গেছিল। সিঙ্গাপুর থেইকা বাইপাস সার্জারি করায়া আনছি। নিয়মকানুন মাইনা চলতে হয়...।

আবু বলে– আল্লা ভরসা। রাখে আল্লা মারে কে।

জাফর বলে– থাক মিয়া, আমার কথা আর শুয়োরের কথা সমান। আপনার ঘটনা শুনি। ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ চইলা আসলেন। কেসটা কী? এনিথিং রং?

কুড়ি বছর প্রবাস করে আবু দেশে ফিরেছে। অথচ বউবাচ্চার মুখ কালো। ভাই-ব্রাদাররা এড়িয়ে চলে। এসব নিয়ে আবুর মেজাজ টং হয়ে আছে। তার ওপর আদম ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে, কোরিয়ায় কোনো ইলিগ্যাল কাজ করছেন নাকি? ভিসা ক্যানসেল কইরা দিলো ক্যান? রাগ দমন করে আবু ঠাণ্ডা মাথায় বলে– আচ্ছা জাফরুল্লা শরাফত সাহেব, আপনাকে সব সময় দেখতাছি আমার ব্যাপারে খুব চিন্ত াভাবনা করেন। আপনাকে এত দায়িত্ব কে দিছে? আমার বউ?

জাফর বিব্রত হয়– না মানে, টাকাপয়সা দরকার না!

আবুর মেজাজ আরো চড়ে যায়– কার দরকার, আমার নাকি আপনার?

জাফর ম্লান হেসে বলে– ভাই সাহেব, আপনে মনে হয় রাগ করছেন। থাক, আমরা বরং রাজনীতি নিয়া কথা বলি।

মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না আবু। হঠাৎ চিৎকার করে বলে– রাজনীতির মাকে চুদি। ঐ কুত্তার বাচ্চা, আমার ঘর থেকে বের হ। পুটির মায় কী তোর ধোন দড়ি দিয়া বাইন্ধা রাখছে...।

আবুর উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে চাকরবাকররা ছুটে আসে– কী হইছে, স্যার? মাথা গরম হইলো ক্যান!

বাসায় তখন পুটি কিংবা পুটির মা একজনও ছিল না। পুটি গেছে কনসার্ট শুনতে। ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সে মোবাইল কোম্পানির স্পন্সরে ছালা পাগলা গিটার বাজাইয়া গান গাবে। পুটিতো ছালা পাগলার নামে পাগল। ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা বাজবে বলে গেছে। এনজিও ট্যুরে পুটির মা গেছে ভুরুঙ্গামারি। সেখানে সে সেক্সওয়ার্কারদের উদ্দেশ্যে যৌন সচেতনতামূলক বক্তৃতা দেবে। বাড়িতে আবু ভালোই ছিল। লোকটা এসে ভ্যাজাল বাঁধিয়ে দিয়েছে। চাকরবাকররা জাফরকে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হিসাবে জানে। দামি গাড়িতে চলে ফেরে। এমন লোককে কেউ অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেবে, তা ওরা কল্পনা করেনি। আবু গর্জন করে ওঠে– এই, তোরা খাড়াইয়া আছস ক্যান! কুত্তার বাচ্চারে পিটাইয়া বাইর কইরা দে। আমারে জিগায়, ঘটনা কী। ঘটনা তোর বাপের মাথা...। অবস্থা বেগতিক দেখে জাফরুল্লা শরাফত থপ থপ দরজার দিকে ছুটতে ছুটতে বলে– ডোন্ড বি সেন্টিমেন্টাল আবু মিয়া। আমি বাইপাস প্যাসেন্ট। আবু ওর দিকে তেড়ে যায়– যা ব্যাটা। অন্য জায়গায় গিয়া মর...।

ভোঁ শব্দ তুলে জাফরুল্লার কালো গাড়ি চলে যাওয়ার পর পুরো বাড়িতে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। অস্থিরতা কাটানোর জন্য আবু সিগারেট টানে আর ড্রয়িংরুমে পায়চারি করে। ড্রয়িংরুমে সিগারেট খাওয়ার ওপর পুটির মার নিষেধাজ্ঞা দেওয়া আছে। এজন্য যে কাজের মেয়েটা দায়িত্ব পালন করে সে রান্নাঘরের দরজা থেকে উঁকি দেয়। কিন্তু আবুকে কিছু বলার সাহস করে না। সে ভাবে, শান্ত মানুষটা হঠাৎ চেইতা গেল কেন! মেয়েটাকে উঁকিঝুকি দিতে দেখে আবু বলে– কী! কেয়া মতলব? মেয়েটা বুদ্ধিমতী; একগাল হাসি ছড়িয়ে বলে– কফি খাইবেন, স্যার?

পুটির চেয়ে কিছু বড় হবে মেয়েটা। একটা ফুলতোলা শাড়ি পড়েছে। কপালে সবুজ রঙের টিপ। কাজের মেয়েরা কী আজকাল এরকম সাজগোজ করে থাকে? আবুর মেজাজ নরম হয়। সে বলে– যা, আমার রুমের ওয়াল কেবিনেট খুইলা দেখ, ভদকার বোতল আছে, নিয়া আয়।

মেয়েটা বলে– আইচ্ছা আনতাছি।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আবু মিয়া মনে মনে অনুতাপ বোধ করে– যাহ্। পুটির মার পুরনো বন্ধুলোক। কী সব যা তা বইলা ফালাইছি। বেটা নিশ্চয় পুটির মাকে ইনিয়ে বিনিয়ে বহুকিছু শোনাবে। চামার টাইপের মানুষরা তিলকে তাল বানাইতে ওস্তাদ...।

মেয়েটা বোতল গ্লাস তো আনেই, সঙ্গে বরফ লেবু লবণও আনে। আবু অবাক হয়। সে বলে– প্যাগ বানাইতে পারস?

মেয়েটা হাসে– পারি।

আবু বলে– কড়া কইরা একটা প্যাগ বানা।

মেয়েটা লেবু লবণ বরফ মিশিয়ে সুন্দর একটা পেগ বানায়। আবু দুই-তিনটা চুমুক দিয়ে বলে– বাহ খুব সুন্দর হইছে। কে শিখাইছে, পুটির মা?

মেয়েটা মাথা নাড়ে– জ্বী!

আবু বলে– পুটির মা কী রোজ মদ খায়?

মেয়েটা বলে– জ্বী না। যেদিন মন খারাপ থাকে হেইদিন খায়।

একা খায় নাকি সঙ্গে কেউ থাকে?

একা খায়। দোকাও খায়। বন্ধুদের নিয়া পার্টি দিয়াও খায়।

মদের লগে অন্য কিছু খায় না?

একা থাকলে কিছু খায় না।

দোকা থাকলে?

পিঁয়াজ খায়।

পার্টি থাকলে?

ককটেল। তখন পুরুষমানুষও খাইয়া ফালাইতে চায়।

খাইয়া ফালাইতে চায় মানে কী! ক খাইয়া ফালায়।

আবুর কথা শুনে মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ওঠে। পেটে অনেকগুলো পেগ পড়ায় আবুর মেজাজ ফুরফুরা হয়ে গেছে। হাত বাড়িয়ে মেয়েটার গাল ছুঁয়ে বলে– খুব সুন্দর মেয়েতো তুই। এতোদিন খেয়াল করি নাই। কী নাম তোর?
ফুলকুমারী।
বাহ্, দারুণ নাম। ফুলকুমারী, তুই আমার পাশে আইসা বস।
ফুলকুমারী আবুর গা ঘেঁষে বসে। মিষ্টি একটা ঘ্রাণ পায় আবু। ঘাড়ে নাক ঘসে বলে– খাবি একটু?
ফুলকুমারী বলে– না, আমি খাই না। আপনে ওঠেন। চলেন আমার সঙ্গে।
আবু বলে– কোথায় নিয়ে যেতে চাস। কোন সুদূরে...।
মেয়েটা হাসে– ওঠেন তো!
মেয়েটার হাত ধরে আবু উঠে দাঁড়ায়। ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘর পেরিয়ে গেছে। পুটি এখনো ফেরেনি। মেয়েটা আবুকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে যত্ন করে ভাত খাওয়ায়। আবুর ভাল্লাগে। পুটি ফিরতাছে না কেন? দেশে ফেরার মাসখানেকের মধ্যে আবু বুঝে গেছে পুটি এবং পুটির মা'র জগৎ আলাদা হয়ে গেছে। দুই ভুবনের কোথাও আবুর স্থান নেই। সে যেন এ বাড়ির অতিথি। অথচ কী তীব্র আবেগ নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। দীর্ঘ প্রবাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুটির মাকে টাকা পাঠাইছে। ভাই-ব্রাদারদের সাহায্য করেছে। ব্যাংক ব্যালেন্স করেছে। বাকি জীবন শুয়ে-বসে খেলেও ফুরাবে না। অথচ সব কিছুকে ক্যামন যেন অর্থহীন লাগতেছে। স্ত্রী-কন্যাকে ধান্দাবাজ মনে হচ্ছে। তার চেয়ে ফুলকুমারী নামের এই মেয়েটাইতো ভালো। ডিনারের পর আবুর ক্লান্ত লাগে। মেয়েটা বলে– চলেন আপনারে হোয়াইয়া দিই।
আবু বলে– গুড, চলো যাই।
বিছানায় গিয়ে আবু মিয়া মেয়েটাকে টানে। মেয়েটা ওকে বাধা না দিয়ে মধুর ভঙ্গিতে কপালে চুমু দিয়ে, চুলে আঙুল ডুবিয়ে মিষ্টি হেসে বলে– আপনি ঘুম দেন। আমি সময়মতো আইসা পড়বো।
বাপের প্রতি কন্যাদের একটা আকর্ষণ থাকে। আর মেয়ে যদি হয় সদ্য-তরুণী তাইলে তো যৌনানুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ই-মেইলে এবং মোবাইল ফোনে বাপ-মেয়ের যে সম্পর্ক ছিল দেশে ফেরার পর তা টিকল না। আবু যে বুড়ো হয়ে গেছে কিংবা জাফরুল্লার মতো বেঢপ দেখতে হয়েছে তা কিন্তু না। মধ্যবয়স্ক ঝকঝকে পুরুষ হিসেবে আবু এখনো যে কোনো মেয়ের নজর কাড়ে। বিশেষ করে তার ঋজু দেহ আর টানা চোয়াল। বাইরের জগতের তীব্র আকর্ষণ, সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব, আনন্দ-অন্বেষা পুটিকে যত-না বাপের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, তার চেয়ে বেশি যেন মায়ের আচরণ দায়ী। জাফরুল্লা শরাফতের প্রতি মা'র খোলামেলা পক্ষপাতের কারণে বাবাকে একেক সময় ভেউড়া মনে হয় পুটির। মেয়ের অনীহায় আবু একেক সময় অসহায়

বোধ করে। সে বলে– দেশে আইসা পড়ছি বইলা তোমার মা'র মতন তুমিও বোধ হয় খুশি হও নাই। আমি আইসা তোমাগো ঝামেলায় ফেইলা দিছি।
বাপের কথা শুনে পুটি বিব্রত হয়। সে বলে– না বাজান। আসলে পরীক্ষার চাপে আলুভর্তা হয়া আছি।
আবু বলে– তা ঠিক। কিন্তু তুমি আমারে এড়িয়ে যাও, এইটা আমি বুঝি।
পুটি বলে– তাই মনে হচ্ছে তোমার! তাই যদি হয় এজন্য তুমিও কম দায়ী না।
আমার দোষ কোথায় বলো?
আমি যে ফ্রিডম নিয়া চলি এইটা তুমি সহ্য করতে পারতেছ না?
এইটা তুমি ভুল বললা, মা জননী।
তাইলে তুমি বন্ধুদের নিয়ে ইন্ডিয়া ট্যুর করতে বারণ করতেছো কেন?
না মানে, অনেক পুরুষের সঙ্গে বাঙালি মেয়েদের ট্যুর করা ঠিক না।
তাতে সমস্যা কী? আমি সেক্সুয়ালি জড়িয়ে পড়বো, এজন্য? ভুল ভাবনা, বাজান। নিজে না চাইলে কেউ আমাকে এবিউজ করতে পারবে না।
এইটাইতো সমস্যা। তুমি নিজেই এ্যাবিউজড হতে চাবা।
শিওর?
শিওর মানে, হইতে পারে। মনের ওপর কতক্ষণ নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। ঠিক আছে যাও। নিজেরে সামাল দিয়া ব্যাকতেরে কামাল কইরা দিবা।
ভারত ভ্রমণের অনুমতি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে পুটি। বাপের গলা জড়িয়ে চুকচুক করে চুমু খায়। ঠোঁট উল্টিয়ে আদুরে গলায় বলে– তাইলে আমারে তোমার পার্সোনাল ফান্ড থেকে একলাখ টাকা দিবা। নাইলে বন্ধুবান্ধবগো কাছে আমার প্রাউড থাকবে না...। মেয়ের আবদারে বিগলিত হয়ে আবু বলে– তুমি আমার একটাই মা জননী। তুমি যা চাইবা তা পাইবা। আমার কাছে তোমার সাত খুন মাফ।
সমস্ত শুভকামনার পরও পুটির বহির্মুখিতা আবুকে যন্ত্রণা দেয়। সে ভেবেছিল, দেশে ফিরে তিনজনে জড়াজড়ি করে সুন্দর সময় কাটাবে। তা আর হয় না। আবু মনে মনে বলে, যাউক গা। যারে মন চায় তারে দিয়া চোদাউক। এজন্য আবু পুটির মার বহুগামী প্রবণতাকে দায়ী করে। যেমন মা তেমন মেয়ে। আবুর অবস্থা এমন, দেখলাম শুনলাম কিছুই বুঝলাম না! মনকে সামাল দিতে তাই ঘরে বসে আবু মদ খায়। ফুলকুমারী বলে– স্যার আপনার বন্ধুবান্ধব নাই? তাগো লগে খাতির জমান গিয়া।
তাই তো! স্ত্রী-কন্যার ঘোর কাটানোর জন্য আবু ইদানিং গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় কিছু সময় কাটাতে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়– এখন থেকে সে দেশেই থাকবে। ব্যবসা শুরু করবে। আবুর এই মনোভাব জেনে কিছু লোক বলে– যা শালা নতুন ভেজাল...। কয়েকজন তাকে উৎসাহ দেয়– সাবাস আবু। ঠিক সময়ে দেশে আইছো। গুণ্ডাপাণ্ডারা আর্মির হাতে ধরা খাইছে। তুমি একটা ইন্ডাস্ট্রি

দাও। আমরা আছি তোমার সঙ্গে। এক বন্ধু কোরিয়া থেকে 'হ্যান্ড স' মেশিন আমদানি করার পরামর্শ দেয়।

আবু বলে– 'হ্যান্ড স' আবার কী জিনিস?

বন্ধু বলে– ইলেকট্রিক করাত। দুইজনে ধইরা ঘষর ঘষর করা লাগবো না। গাছের লগে ঠাইসা ধইরা বুতাম টিব দিবা, ব্যাস। চালু হয়া গেল। পাঁচ মিনিটের মইধ্যে গাছ শুইয়া পড়বো।

আবু বলে– 'হ্যান্ড স' দিয়া কার গাছ কাটবা?

ক্যান! সরকারের। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেক গাছ। এক হাজার গাছ কাটার ওয়ার্ক অর্ডার নিয়া এক রাইতে পাঁচ হাজার গাছ কাইৎ কইরা ফালামু। লাভের উপর লাভ।

এইটাতো বেআইনি কথা কইলা।

ধুর মিয়া, তুমি শালা আশির দশকে পইড়া আছো। 'লাঙ্গল যার জমি তার' আন্দোলনের মতো করাত যার গাছ তার। আমদানি করবা কিনা কও।

দেখি, আগে বুইঝা লই।

বুঝতে বুঝতে বুড়া হয়া গেলাম। কাজের কাজ কিছু হইলো না। এখন বাংলার ঘরে ঘরে অটোমেটিক করাত পৌঁছাইয়া দিতে চাই। করাত দিয়া গাছও কাটবো মাছও কাটবো। রাজি হয়া যাও। আমি এলসি খোলার ব্যবস্থা করি।

পুটির মার টাইম নাই। অফিস, মিটিং, নারীবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম শেষ করে রাতদুপুরে চাকরবাকরদের নিয়ে বসে। ড্রয়িংরুমের সোফায় পা তুলে দিয়ে বেনসন ধরায়। চাকর বাকররা তার পায়ের কাছে গোল হয়ে বসে। সংসারের হাল-হকিকত নিয়ে মিটিং চলে দেড়-দুই ঘণ্টা। এই সময়টায় পুটির মা সুগন্ধিঅলা পান খায়। পানের লোভে আবু মিয়াও ইদানিং পুটির মার পাশে এসে বসে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। আবুকে দেখে ফুলকুমারী ফিকফিক করে হাসে। আবুও মুচকি মুচকি হাসে। আবুর হাসি দেখে পুটির মা বিরক্ত হয়। তার মনে হয়, আবুর ব্যক্তিত্বহীনতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কোরিয়ায় দুই যুগ লেবারি করে লেবার শ্রেণীর মেয়েদের প্রতি আসক্তি হয়েছে নিশ্চয়। বাড়িতে বদমাইশি চলবে না। পুটির মা ধমক দেয়– তুমি এখানে বসে আছো কেন?

না মানে সংসারের অবস্থাটা একটু বুঝে দেখি।

তোমার এত বুঝতে হবে না। যাও ঘুমিয়ে পড়।

যতই ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকুক, পুটির মার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না আবু। যাওয়ার সময় বলে– আমার জন্য এক বোতল হুইস্কির অর্ডার দাও।

পুটির মা আবুর দিকে কটমট করে তাকায়। তা দেখে ফুলকুমারী মুখে ওড়না-চাপা দিয়ে হাসে। পুটির মা ধমক দেয়– এই পাগল ছেড়ি, হাসবি না কইলাম। মুখের ভিতর মুগুর ঢুকায়া দিমু।

মিটিং শেষ করে নিজের রুমে ঢুকে কুট করে দরজা লক করে দেয় পুটির মা। আসছে পর্যন্ত এক রাতও স্বামীর সঙ্গে শোয়নি। আবু অনেকবার কাছে টানার চেষ্টা করেছে। দরজায় টোকা দিয়েছে কয়েক রাত। কাজ হয়নি। পুটির মা সাফ সাফ বলে দিয়েছে– তুমি আমারে ধরবা না। আমার রুমেও ঢুকবা না।

আবুর ইগোতে লেগেছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

ফুলকুমারীর সঙ্গে ভাব হওয়ার পর থেকে শোয়াশোয়ি নিয়ে আবু আর পুটির মাকে পাত্তা দেয় না। তবুও স্ত্রী বলে কথা। সূক্ষ্ম অভিমান বুকে জেগে থাকে। দেশে এসে সে কী মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলেছে। একেক সময় ভাবে, এসব জটিলতার ভিতরে না থেকে বরং ইউরোপ-আমেরিকা চলে যাই। ভাবনাটা কয়েকদিন ধরে আবুর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। একেক সময় ঘোষণা দিতে ইচ্ছা করে, আমি যাই গা। পরক্ষণে মত পাল্টিয়ে ভাবে, দেখি আর কয়টা দিন, দেশে বইসা এরা করেটা কী! কোথায় পুটির মার সুখশান্তি, একটু বুইঝা লই।

জাফরুল্লা শরাফতের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হওয়ার পর আবু আতঙ্কে ছিল, এই বুঝি পুটির মা ঝাঁটা নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অবাক কাণ্ড, একটা কথাও বলেনি। এমন ভাব দেখাইতেছে, যেন সে ঘটনাটা শুনেনি। যার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ আলাপই হয় না তার সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু সকালবেলা আবু চা খাচ্ছিল আর খবরের কাগজ পড়তেছিল। কয়েকদিন ধরে পত্রিকাগুলো দুই মাথাঅলা শিশুদের খবর ছাপতেছে। ঘটনা কী? নিশ্চয় বিদেশ থেকে কোনো দুইমাথার ডাক্তার এসেছে। ভাবনার ভিতর পুটির মা ডাকে– এই শোনো। পুটির মাকে দেখে আবু চমকে যায়। বাহ্, দারুণ দেখাচ্ছে। কপালে সবুজ রঙের বড় টিপ। আগে পুটির মা টিপ পড়তো না। শিফন শাড়ি পড়তো। এখন দেখতেছে, দেশি সুতি শাড়ি পড়ে। চুলে খোঁপা করে। ঠোটে রং মাখে না। পুটিকে আবু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল– তোর মা'র পোজপাজ কমছে মনে হয়? পুটি বলেছে– মা ইদানিং সিম্পল থাকতে পছন্দ করে। এনজিও করে তো। বিদেশিরা দেশি ঐতিহ্যের মেয়েদেরকে প্রেফার করে। সো, মা বিকেইম এ বাঙালি লেডি। বুঝতে পারছো, বাজান? শাড়ির কুচি ঠিক করতে করতে পুটির মা বলে– সন্ধ্যায় কোথাও যেয়ো না, ঘরে থেকো।

আবু বলে– কেনো, কোথাও যেতে হবে নাকি?

হ্যাঁ, তুমি সহ যাবো।

কোথায়?

গেলেই দেখবে।

রাগী ভঙ্গি করে পুটির মা বেরিয়ে যায়। হুলুস্থুল করে পুটি ডাইনিং টেবিলে এসে চিৎকার করতে থাকে– বুয়া নাস্তা দাও। একদম সময় নাই। এক্ষুনি বেরুতে হবে...। পুটির পরনে জিন্স আর নেটের গেঞ্জি। চুল ঝুটি করে বাঁধা। জিন্সটা এত নিচে পরা যে ডিম্বাকার তলপেটটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। পেপার থেকে চোখ তুলে মেয়ের দিকে

তাকিয়ে থাকে আবু– যা শালা, ভালো সেক্সি মাইয়া জন্ম দিছি মনে হইতেছে... । বাপের চোখে পুরুষের দৃষ্টি দেখে পুটি কপট রাগে বলে– কী বাজান, চাইয়া আছো ক্যান?

আবু বলে– তোমারে দারুণ সেক্সি লাগতেছে ।

পুটি বলে– থ্যাঙ্ক ইউ বাজান । সকালটা সুন্দর হয়ে গেল ।

আবু বলে– বুকের উপর একটা ওড়না দিয়া লইলে ভালো হইতো না । মেয়েগো বুক হইলো নাজুক জায়গা... ।

বাপের কথা এড়িয়ে গিয়ে পুটি বলে– আচ্ছা বাজান, তুমি নাকি লাথি মাইরা জাফর আঙ্কেলের বিচ্চি ফাটায়া দিছো?

আবু চমকে ওঠে– কস কী! তুই কার কাছে শুনলি?

জাফর আঙ্কেল এখন হাসপাতালে । তোমার নামে মামলা কইরা দিছে ।

কিসের মামলা!

এ্যাটেম্পট টু মার্ডার । তোমার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেছিল । থানায় পয়সা দিয়ে মা ওয়ারেন্ট গায়েব করে দিয়েছে ।

বলিস কী! আমি তার গায়ে হাত তুলিনি । চাকরবাকররা সাক্ষি আছে ।

তুমি যে বিশ বছর আগে ব্যাংকলোন তুলে বিদেশে পালিয়ে গেছ, জাফর আঙ্কেল সেটাও জানিয়ে দিয়েছে । তোমার নামে ঋণখেলাপির তালিকায় রেডমার্ক পড়ে গেছে ।

খাইছে আমারে! আবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় । এত কাণ্ড ! আমাকে কিছু জানাসনি কেন! তোরা কি ফন্দি করে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাস!

ডোন্ট বি সিলি, বাজান । আমি তোমার সঙ্গে আছি ।

তোর ভাবচক্কর দেখেতো মনে হয়, তুই অন্য কারো সঙ্গে আছিস ।

এ্যাকজাক্টলি । আমি অনেকের সঙ্গেই আছি এবং তোমার সঙ্গেও আছি । বিকজ ইউ আর মাই বাজান ।

অংক এমন একটা সাবজেক্ট, হয় ছক্কা নাইলে মক্কা । অংকে ভুল হলে দশে শূন্য । কিন্তু ভুলটা যে কোন জায়গায় আবু ধরতে পারে না । তার মাথার ভিতর গুবলেট পাকিয়ে যাচ্ছে । তিন পেগের পর চতুর্থ পেগ গিলেও কিন্তু অংক মিলতেছে না । সে ভেবেছিল যত নিষেধই করুক, দেশে ফিরলে পুটি এবং পুটির মা খুশি হবে । এখন দেখা যাচ্ছে, ডালমে বহুত কালা হ্যায় । সে ফুলকুমারীকে ডাকে– এই ফুলি, ফুলি । সুইট সেক্সি গাই... । ফুলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচের পানদোকানিদের সঙ্গে টাঙ্কি খাচ্ছিল । পান-দোকানদারদের সঙ্গে ফুলকুমারীর রসের পিরিত চলতেছে । বিয়ের কথাও পাক্কা । এর মধ্যে খবর পায়, গ্রামের বাড়িতে দোকানদারটার একটা বউ আছে । বউ চকিদারের মেয়ে । চকিদার নাকি চেয়ারম্যানের ক্যাডার । আবুর মাতাল কণ্ঠের ডাকাডাকি শুনে দোকানদার বেটাকে বাই বাই টা টা দিয়ে ফুলি আবুর রুমে আসে । আবু বলে– বসো ফুলকুমারী । তোমার সঙ্গে জরুরি আলাপ আছে ।

ফুলকুমারী তিড়িং করে উঠে– বসনের টাইম নাই। কী কইবেন কন।
আবু বলে– কাছে আইসা বয়।
ফুলি আবুর গা ঘেঁষে বসে নাক টিপে দিতেই পুচ করে সর্দি বেরিয়ে আঙুলে মাখামাখি হয়ে যায়– ছিছি! খচ্চর বেডা! নাক ঝারেন না ক্যান! ফুলি ওড়না দিয়ে আঙুল মোছে। আবু লুঙি উঁচিয়ে নাক ঝেড়ে বলে, জাফরুল্লার অবস্থা কী বল দেখি।
ফুলি গম্ভীর হয়ে বলে– জাফর স্যারে মইরা গেছে।
কস কী! হাছাই মরছে?
পুরা মরে নাই। আধমরা হয়ে আছে।
আধমরা! আধমরা কেমন ক, দেখি, শুনি।
আধমরা মানে হইল, হুইয়া থাকে, কতা কয়, কিন্তুক উঠতে বইতে হাঁটতে চলতে পারে না।
বাহ, হুইয়া-বইয়া না, হুইয়া হুইয়া খাইবো! মরবো না আধমরা হয়া থাকবো! জাফরুল্লা, হুইয়া হুইয়া মার্ডার কেস চালাইতে চাস? চালা দেখি। আমার নামও আবু মিয়া। শেরকা বেটা শোয়া শের...।
আবু পায়চারি করে আর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেয়। ফুলি যে কোন ফাঁকে চলে গেছে টের পায় না। মোবাইল ফোনটা পিরিং পিরিং করে বেজে উঠে। মনিটর দেখে সচেতন হয়ে আবু বলে– হ্যালো পুটির মা।
কী করতাছো?
ঘুমাইতাছি।
ঘুমাইলে ফোন ধরলা ক্যামনে।
ঘুমের মইধ্যে মনে হইলো তুমি ডাকতাছো, এই শোনো, কাছে আসো..।
ইয়ার্কি মাইরো না, শোনো, ব্যাংক থেকে বাসায় লোক যেতে পারে। তুমি কিন্তু বোকার মতো বলে ফেলো না, আমিই আবুল হোসেন সাহেব। তাইলে কিন্তু ক্যাচ কইরা হ্যান্ডকাপ পড়ায়া সোজা থানায় নিয়ে যাবে। কী বলছি, বুঝছো?
বুঝছি। কেউ আইলে আমি খাটের নীচে লুকায়া থাকবো। পুটির মা সুর নরম করে বলে– তোমাকে কতো করে বললাম, এখন দেশে আসার দরকার নাই। এই জীবনে তো আমার কথা শুনলা না। গোঁয়ার গোবিন্দ কোথাকার। এবার ঠেলা সামলাও। সরকার এখন ক্রোক পলিটিক্স খেলতাছে। ক্রোক পলিটিক্সের ফান্দে যে পড়ছে তার দফারফা। টাকাও ঢালতে হবে জেলও খাটতে হবে। বোঝো অবস্থা..।
প্রসঙ্গ পাল্টে আবু মিয়া আমতা আমতা করে বলে– শুনলাম আমার ধমক খাইয়া জাফরুল্লা শরাফতের নাকি বিচ্চি ফাইটা গেছে?
তোমাকে কে বলছে, পুটি?

আবু চুপ মেরে যায়। নতুন একটা ভুল করে ফেলল সে। পুটির মা ধমক দেয়– কথা বলতেছ না কেন! বাপ-মেয়ে মিলে অনেকদিন ধরে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতাছো। এর পরিণতি ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

আবু বলে– পুটির মা, তুমি হুদাহুদি ভুল বুঝতাছো।

চুপ করো। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। শোনো, ব্যাংকের লোকদেরকে আমি বলেছি, তুমি দেশে এসেছিলে, আবার চলে গেছ। বুঝছো ব্যাপারটা।

তাইলেতো কোনো সমস্যা নাই। কেউ আসলে বলবো, আমি তোমার নতুন স্বামী। আমার নাম নির্লিপ্ত চৌধুরী...।

পুটির মা বিরক্ত হয়ে বলে– তোমার কিছু বলা লাগবে না। তুমি খাটের নিচে লুকিয়ে থেকো। কোনো ঝামেলা করার চেষ্টা করলে প্যাকেট করে সোজা প্লেনে তুলে দেবো, বুঝছো।

মায়ের সঙ্গে পুটির প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দুজনই ইচ্ছাস্বাধীন জীবন কাটায়। আবার মিলঝিলও আছে সমান মাত্রায়। কিন্তু ইদানিং কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। পুটির মায়ের হতাশাই বেশি। তার পুরো সন্দেহ, পুটিই ইন্ধন দিয়ে আবুকে দেশে এনেছে। এখন কী ভীষণ বিপদ। জাফরুল্লা চিৎ হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে, আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা উঠেপড়ে লেগেছে আবুকে জেলের ভাত খাওয়ানোর জন্য। একেই বলে শাঁখের করাত, কইতেও পারে না সইতেও পারে না। জাফরুল্লার বউ মিনাক্ষী পুটির মাকে এমনিতে দুচোখে দেখতে পারে না। এখন সে পুরোমাত্রায় রণচণ্ডী রূপ নিয়ে পুটির মার ওপর আগুন ঝারতেছে। মিনাক্ষীর ধারণা নিজের স্বামীকে বিদেশে সরিয়ে রেখে পুটির মা বহুবছর ধরে তার স্বামীকে আমের আঁটির মতো চুষে খাচ্ছে তো খাচ্ছে, এবার বোধ হয় মেরেই ফেলবে। হাসপাতালে এসে স্বামীর মাথার কাছে পুটির মাকে দেখে বোমার মতো ফেটে পড়ে মিনাক্ষী– খানকি মাগি কোহানকার, আমার স্বামীর বারোটা বাজাইয়া অহন উদাস চোখে ঘড়ির কাঁটার দিকে চাইয়া আছস, কহন দম বাইর হয়া যায়! তোরে আর তোর ভাতাররে যদি র‍্যাবের গুঁতা না খাওয়াইছি তাইলে আমার নাম মিনাক্ষী না গোআক্ষি...।

বিপদের সময় পুটির মা মাথা ঠাণ্ডা রাখতে জানে। সে মাথা নিচু করে মিনাক্ষীর গালাগাল শোনে আর ফাঁকে ফাঁকে বলে– আহা মিনু। থামো প্লিজ। তোমার এত সুন্দর নামটা পাল্টানোর দরকার নাই...। মিনাক্ষী বলে– দরকার আছে না নাই, সেইটা আমি বুঝবো। আপনে অহন যান। আপনার কাছে মাফও চাই দোয়াও চাই...।

এরপর আর বসে থাকা যায় না। আফটার অল তারও তো ইগো আছে। অপমান হজম করে বাসায় ফিরে এসে দেখে সিডি প্লেয়ারে বাজনা ছেড়ে দিয়ে বাপ-মেয়ে ডান্স করতেছে। কী অশ্লীল গান– সাঁইয়া দিলমে আনা রে...। ডান্সের তালে আবু মদের গ্লাসে চুকচুক করে চুমুক দেয়। চান্স পেয়ে পুটি বলে– ফুলি আমাকে এক পেগ দে।

আবু বলে– ফুলকুমারী তুইও আয় আমাদের সঙ্গে। নাচলে শরীর মন দুটোই চাঙ্গা থাকে।
ফুলি বলে– আমি নাচলে দেখবো কে?
পুটি বলে– কারো দেখার দরকার নাই। ডান্সের ভিতর অদ্ভুত একটা চান্স থাকে।
আবু বলে– কিসের চান্স?
পুটি বলে– এই যে ধরো কিস্-এর চান্স।
তাইতো! নাচতে নাচতে কোমর জড়িয়ে ধরে মেয়েকে ছোট ছোট কিস করে আবু। পুটির মা যে আড়ালে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ড দেখছে তা ওরা বুঝতে পারে না পুটির মা দরজার সামনে পড়ে গেলে ওদের টনক নড়ে। পুটি ছুটে গিয়ে বলে– কী হইছে মা!
পুটির মা বলে– যা এখান থেকে। অসভ্য খবিশ কোথাকার।
আবু বলে– আৎকা কাউরে নাচতে দেখলে মৃগিবাই চাঁগা দিয়া সেন্স কলাপস কইরা ফালাইতে পারে। পায়ের পাতায় সরিষার তেল মালিশ করো। এই ফুলি, তেল নিয়া আয়...।
পুটির মা বলে– চুপ করো। এক গ্লাস পানি দিতে বলো।
ফুলি ইচ্ছে করে পুটির মদের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়– ধরেন আম্মা, ঢগ ঢগ কইরা গিলা ফালান। সব ঠিক হয়া যাইবো।
গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুলির গালে চটাশ করে চড় কষে পুটির মা। তারপর কাউকে কিছু না বলে নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। চড় খেয়ে ফুলি বিভ্রান্ত হয়ে বিড় বিড় করতে থাকে–দোষ করবো একজনে, কিলগুতা খামু আমি। চাকরবাকর বইলা আমাগো মানুষ ভাবে না। ঠিক আছে। দেখুম নে কোন ঘাটের পানি কোন দিকে যায়...। কী করা উচিত বুঝতে না পেরে আবু আরো দুই পেগ হুইস্কি খেয়ে পুটির মার রুমের দরজা ধাক্কাতে শুরু করে– এই খোলো। তুমি দেখতেছি আগের মতো ছেলেমানুষ রয়ে গেছো। না খুললে ঢুকাবো ক্যামনে! খোলো না লক্ষ্মীটি, জলদি করো...। মাতাল বাপের কাণ্ড দেখে পুটি হি হি করে হাসে আর বলে– বাজান তুমি আউট হয়ে গেছ। ইউ লুক ফানি বাজান। আসো, আমরা আরো কিছুক্ষণ ডান্স করি। কাম অন বাজান...।
কোরিয়া যাওয়ার আগে ব্যাংক থেকে লোন তোলার সময় বাপের সম্পত্তির এ্যাটাস্টেড কপি সিকিউরিটি হিসাবে কাগজপত্রের সঙ্গে দাখিল করে দিয়েছিল আবু মিয়া। এত বছর পর দুর্নীতি দমন কমিশনের বাঘা অফিসারের হাতে পড়ায় ভাই-ব্রাদারদের টনক নড়ে। ওরা জানতে চায়– কে করছে আকামডা, কে জানাইয়া দিছে?
কে আবার, ভাবীর পিরিতের নাগর জাফরুল্লা শরাফত।
ও এই ঘটনা। ভাই-ব্রাদারদের বউরা খিটখিট করে হাসে। ভাবীই মহা শান্তিতে আছে। এক ভাতারে টাকা কামায়, আরেক ভাতার পিছে পিছে দৌঁড়ায়...। হাসির দমকে বউদের তলপেটের লুদি থলথল করে।

ভাই-ব্রাদার চিরকাল ভাই-ব্রাদারই থেকে যায়। আবু যখন কোরিয়া যায় সবাই তখন ছাত্র; কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আবু ক্যালকুলেটিভ মানুষ। ভাই-ব্রাদারদের জন্য নির্দিষ্ট এমাউন্টের টাকা আলাদা করে পাঠিয়েছে। কুড়ি বছরে ভাই-ব্রাদাররা লেখাপড়া শেষ করে চাকরি-ব্যবসায় ঢুকে বিয়ে-সাদি করে বউ-বাচ্চা জুটিয়ে নানান দুর্নীতিতে জড়িয়ে গিয়ে দৌড়ের উপর আছে। মিয়াভাইয়ের খোঁজখবর নেওয়ার টাইম নাই। এখন যখন পুরনো মামলা দারোগার টেবিলে গিয়ে পড়েছে, ভাই-ব্রাদারের বউরা চারমাথা এক করে ভাবতে থাকে– কী করা যায়।

প্রকাশ বিশ্বাস ঘুঘু টাইপের উকিল। ফাঁসির আসামিকে নির্দ্বিধায় বলে, চিন্তা করিস না। ঝুইল্যা পড়। আমিতো আছি। সুযোগ মতো আবার পাঁচআনি মামলার আসামিকে ভয় দেখায়, বিরাট ঝামেলায় পড়ছস। দারোগা সাব তোর নামে পিস্তল রিকভারি দেখাইছে। মামলা ঘুইরা ফিফটি ফোরে চইলা যাইতে পারে। এক কাম কর, হাজার পাঁচেক টাকা জোগাড় কইরা দে। দেখি কী করা যায়। আইন বড় শক্ত জিনিস...।

কিন্তু ভাই-ব্রাদারের বউরা ধানাই-পানাই ওকালতির ধার ধরতে চায় না। ওদের একটাই কথা– দরকার হইলে মিয়া-ভাইরে ফাঁসাইয়া দেন। বাপের জমির উপর মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিং তুলছি কি মিয়াভাইয়ের জালিয়াতির টাকায়! যেমন কইরা হোক জমি বাঁচান। খরচ যা লাগে দিতাছি। প্রকাশ উকিল বলে– ঠিক আছে, ব্যাকডেটে জমির বিলিবন্দোবস্ত দেখাইয়া দিতাছি। যতক্ষণ মামলা পুলিশের হাতে আছে টাকা দিয়া ঠেকাইতে পারুম। যৌথবাহিনীর নলেজে চইলা গেলে মালও খসবো জমিও যাইবো।

ভাই-ব্রাদারের বউরা ঝুঁকি নিতে চায় না। এমনিতে ওদের স্বামীরা দুর্নীতির দায়ে কেউ জেলে, কেউ ফেরার। তার ওপর যদি বসতবাটির মামলা পায় তাহলে বউদেরও চৌদ্দশিকের গরাদে হান্দাইয়া থুইবো।

ওরা বলে– উকিল সাহেব, বসতবাটি আমাদের নামে বিলিবন্দোবস্ত কইরা দেন।

উকিল বলে– এইটা একটা ভালো প্রস্তাব। তবে মেজর-কর্নেলদের বকশিশ না দিলে দলিল করা যাবে না।

বউরা উকিলের দিকে সরু চোখে তাকায়– মেজর-কর্নেলের ভয় দেখাইয়া টাকাপয়সা কালো কোটের পকেটে ঢুকাইবার মতলব করতাছেন মনে হচ্ছে?

প্রকাশ হৈ হৈ করে ওঠে– অবজেকশন উয়োর অনার। আইনের লোক সম্পর্কে বেআইনি ধারণা করা ঠিক না। যা কই তা করেন। আখেরে ফল পাইবেন।

বউরা বলে– আখেরে দরকার নাই, নগদে চাই। আখেরের ব্যাপার আল্লা নিজে দেখতে পারবো। সেজন্য নানা রঙের ফেরেস্তা আছে। আপনে নাম খারিজ করাইয়া বাড়ি বাচান। নাইলে বালবাচ্চা নিয়া কমলাপুর স্টেশনের ভাঙা ওয়াগনের ভিতর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবো না।

বউদের কথা শুনে এ্যাডভোকেট প্রকাশ কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বলে– জয়, মাতাজী কো জয়।

জীবনের মধ্যে যে এত মারপ্যাঁচ, আগে অনুভব করেনি আবু মিয়া। এখন মনে হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের ধান্দার জায়গায় নাছোড়বান্দা। কয়েকটা পাতিল যেমন রান্নাঘরে অনবরত ঠোকাঠুকি করে পাশাপাশি থাকে, সংসারের মানুষগুলো একজন অন্যজনকে তার চেয়েও বেশি গুতায়। কখন যে গালাগালি হয়, কখন আবার গলাগলি, তার ঠিকঠিকানা নাই। দেশে ফেরার পর পুটির মার মুখে ভাই-ব্রাদারদের দুর্নাম শুনে শুনে আবুর কান পচে যাচ্ছিল। ইদানিং ঘন ঘন আসা-যাওয়া দেখে আবু রহস্য করে বলে– ব্যাপার কী পুটির মা। ভাই-ব্রাদারগো লগে আবার দেখি মিল-মহব্বত শুরু করছো?

পুটির মা মুখ-ঝামটা দেয়– সব কিছুতে নাক দিও না, নাক কাটা পড়বো।

নাক কাটা পড়বো ক্যান! আমার নাক কী লম্বা হয়া গেছে?

তোমার নাক দিয়া দুর্নীতির গন্ধ বাইর হইতাছে। নাকে রুমাল দিয়া রাখো।

সরকারের দুর্নীতি দমনের সুযোগ নিয়ে বউগুলো যে শ্বশুরের ভিটামাটি নিজেদের নামে ভাগ বণ্টন করে নিচ্ছে, আবু তা বেশ বোঝে। সম্পদের লোভে চার বউ শত্রুতা ভুলে গিয়ে এ্যাডভোকেট প্রকাশের পিছে ঘুরঘুর করে। বউগুলোকে নানারকম ভয় দেখিয়ে কাবু রাখতে চায় প্রকাশ। সে বলে– এই যে ম্যাডামরা, খুব খেয়াল, দুর্নীতিবাজদের বউরাও প্যাঁচে পইরা ক্যাচ হয়া যাইতেছে।

বউরা বলে– পারলে ফাঁসাক। সুযোগমতন পাইয়া গেলে ইয়াং মেজররে ফ্যাসানো কোনো ব্যাপার না, উকিল সাব। ফাঁপড় লইয়েন না।

উকিল হাসে– জয় মাতাজী কো জয়। পুটির মার উদ্দেশ্যে বলে– আপনার সাহেবকে একটু ঢাইকা রাখবেন। ঢাকার পোলাগো কাজকারবার ঢাইকা না রাখলে সমস্যা আছে।

পুটির মা বলে– ঠিক কইছেন। ওকে তো ঘর থেকে বের হতে দিই না।

উকিল বলে– এইটাই তো সমস্যা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিদেশ থেকে কুত্তা আমদানি করছে। কুত্তাগুলার জিহ্বা লম্বা আর মারাত্মক গন্ধবাতিক। দুর্নীতিবাজের গন্ধ ওরা চেনে। যে কোনো সময় ঝপ কইরা ঘরে ঢুইকা টুটি কামড়াইয়া ধরতে পারে।

উকিলের কথা শুনে ভাই-ব্রাদারের বউরা আবুর কাছে ছুটে আসে– মিয়াভাই আপনে যান গা।

আবু বলে– কই যামু।

ইন্ডিয়া হয়া কোরিয়া যান গা।

কইলে তো আর যাওন যায় না। আগে ভাও বুইঝা লই।

ভাও বোঝোনের টাইম নাই। গন্ধবাতিক কুত্তা ঘুরতাছে। অক্ষনি যান গিয়া।

আবু মিয়ার মন খারাপ হয়। আহা সোনার বাংলা! এত আশা নিয়া দেশে ফিরছে। ইচ্ছা ছিল সুখশান্তি করবে। এখন দেখতাছে, সুখ পাখিরা কুক্ কুক্ কইরা বদ-

আওয়াজ ছাড়তাছে। কিন্তু আবু তো বোকা লোক নয়। ডেবিট-ক্রেডিটের হিসাব কষে নিয়ে বউদের বলে– তোমরা চিন্তা কইরো না। আমার লাইগা তোমরা বিপদে পড়বা এইটা হইতে পারে না। আমি এক্ষনি যাইতেছি।

ভাসুরের দুর্দশায় বউরা কান্না জুড়ে দেয়– কই যাইবেন মিয়াভাই, কইয়া যান।

আবু বলে– দুই চোখ যেদিকে যায়। আল্লার দুনিয়ায় যাওনের জায়গার কী অভাব!

পুটির মা আবেগের ধার ধরে না। বিপদের সময় আবেগ ক্ষতিকর। তার নিষেধাজ্ঞা না মেনে দেশে আসা আবুর উচিত হয়নি। সে বলে– গো আবু গো, জাস্ট সেভ ইয়োরসেলফ। নিজে বাচলে পরে আইসা বাপের শ্রাদ্ধ করতে পারবা...।

আবু মনঃক্ষুণ্ন হয়ে বলে– বাপের শ্রাদ্ধ না পাপের শ্রাদ্ধ কোনটা করতাছি বুঝার পারতাছি না।

পুটির মা কঠোর কণ্ঠে বলে– ওই হইলো। যাহা পাপ তাহাই বাপ। গো আবু, গো। প্লিজ।

বাপের আত্মগোপন করা নিয়ে পুটির তেমন ভাবান্তর নেই। না থাকাটা অস্বাভাবিক না। সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পা-রাখা, আনন্দ-ফুর্তির পিছে লাগামহীন গতিতে ছুটন্ত তরুণীর পক্ষে প্রবাসী বাপকে আগন্তকের চেয়ে বেশি কিছু মনে না-ও হতে পারে। আবুর অন্তর্ধান তাই পুটি ও পুটির মায়ের অভ্যস্ত জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। পুটির মা ইদানিং রাত নটার মধ্যে ঘরে ফিরে মদ খেতে শুরু করেছে। আবু চলে যাওয়ায় অদ্ভুত একটা চাপমুক্তির আনন্দ পাচ্ছে। আবুর আগমন এবং প্রস্থান দুটোই পুটির মার জন্য সব সময়েই ইতিবাচক। এবার এসে জা'দের সঙ্গে বহুদিনের দূরত্ব ঘুচিয়ে সবাইকে শ্বশুরের সম্পত্তির মালিকানা লাভের পথ সুগম করে দিয়ে গেছে। পুটির মার সঙ্গে তাদের এখন গলায় গলায় খাতির। ইদানিং ওদের ঘন ঘন কথা হয়– কে কী রাঁধতেছে, কার বাসায় কে বেড়াতে এসেছে, কার বাচ্চা ডিম খেতে চায় না, কার স্বামী নাক ডাকে– নানা সাংসারিক কথাবার্তা। পুটির জন্মদিনে জা'দের দাওয়াত দিতে গেলে ওরা আবদার করে– ও ভাবী তুমি একলা মাল খাও, এইটা ঠিক না। আমরা কি অবলা? আমরা কী নারী স্বাধীনতা চাই না!

পুটির মা বলে– ঠিক আছে। পুটির জন্মদিনে এবার ড্রাইজিনের ব্যবস্থা থাকবে। খুশি?

সংসারে বউদের অবস্থান পোক্ত করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু মা'র সমস্ত প্লান-প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিয়ে পুটি জানায়, এবারের জন্মদিনে সে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দার্জিলিং-এ কাটাবে। বিমানের টিকেট, হোটেল বুকিং সব কনফার্ম।

পুটির মা জানতে চায়– তোর সঙ্গে আর কারা যাচ্ছে?

পুটি বলে– আমার ভার্সিটির বন্ধুবান্ধব।

দুর্নীতিবাজ এমপির বখাটে ছেলেটাও আছে নাকি?

জুম্মানকে তুমি বখাটে বলতাছো কেন? জুম্মন আমার বয়ফ্রেন্ড।

তোর মতো পুচকে মেয়ের আবার বয়ফ্রেন্ড কী! পাখনা গজাইছে, তাই না!

তোমার হাজারটা বয়ফ্রেন্ড থাকবে, আমার একটাও থাকবে না, এইটা ইনজাস্টিজ, মা।

তাই বলে ঐ রকমের অশিক্ষিত ঘরের বখাটে ছেলেটাকে নিয়ে দার্জিলিং-এ থাকবি। এটা আমি মানবো না পুটি।

আমার বয়স কুড়ি-একুশ। না মানলে কিছু যায় আসে না। তুমি যদি বাধা দাও আমি বাসা ছেড়ে দেবো। জুম্মনের সঙ্গে লিভটুগ শুরু করবো।

মেয়ের তেজ দেখে পুটির মা দুশ্চিন্তায় মূর্ছা যায়। ডাক্তার বলে– অত্যধিক চাপের কারণে নার্ভাস ব্রেকডাউন। হাসপাতালে নিতে হবে।

পুটির মা এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে হাসপাতালে যায়। ভাই-ব্রাদারের বউরা ফুলের তোড়া নিয়ে ছুটে আসে। তাদের ধারণা হয়, স্বামীর দুর্দশায় ভাবী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তারা বলে– চিন্তা কইরা কী হইবো ভাবী। মিয়াভাই চালাকচতুর মানুষ। যেখানে থাকুক ভালো থাকবো।

পুটির প্রসঙ্গ চেপে গিয়ে পুটির মা বলে– তাই বইলা একটা ফোন করবো না। এইটা ক্যামন কথা!

বউরা বলে– পুরুষমানুষের কাণ্ডজ্ঞান কম থাকে। অগো মন বলতে কিছু নাই। হুইতে পারলেই খুশি। দুশ্চিন্তা বাদ দিয়া চলো বাড়ির নাম খারিজের কাজে লাইগা পড়ি। তুমি না থাকলে উকিল বেটা ছয়-নয় কইতে থাকে। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও।

পুটির মার অসুস্থতা ভাই-ব্রাদারের বউগুলোর কাম্য নয়। ওরা তাকে সুস্থ করে বাসায় নিয়ে আসে। ততদিনে পুটি ফুড়ুৎ। জুম্মনকে নিয়ে দার্জিলিং চলে গেছে। ব্যাপারটা কওয়াও যায় না, সওয়াও যায় না। যেন শাঁখের করাত। সামনেও কাটে পিছেও কাটে। শুধু রক্ত ঝরে না। নিরুপায় পুটির মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে– দেখিস মাইয়া, বাপের মতন ফাইসা যাইস না।

আকমল হোসেন নিপু

....

গোলাঘর

উঠোনের এক পাশে পুরনো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাঘরটা অনেকদিন মেরামত করা হয়নি। পরিচর্যা না থাকায় ঘরের সবকটি খুঁটি কেমন ক্ষয়ে গেছে। দু-একটি খুঁটির গোড়া পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, খুঁটি এখন শূন্যের উপর ঝুলে আছে। শরফুদ্দিন গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। খুঁটিগুলো যথেষ্ট পুরনো ও কাঠের তৈরি। এখন যদি এগুলো বদলাতে হয়, তাহলে এত কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে! থাকার ঘরের দরজা-জানালা লাগাতেই এখন কাঠ পাওয়া যায় না। সেখানে গোলাঘরে কাঠের খুঁটি লাগানোর চিন্তা করা, সেটা নিজের কাছে হাস্যকর মনে হয় শরফুদ্দিনের। হেলাফেলায় ঝোঁপঝাড়-বাঁধা বাঁশই এখন দশগাঁও ঘুরে এক বাড়িতে মিলে কি না! তবু খুঁটি বদলাতে হলে বাঁশের খুঁটিই লাগাতে হবে।

শরফুদ্দিন মনে মনে হাসে। তার ভেতরটা কচলে তামাকপোড়া ঠোঁটে হাসি ঝিলিক দেয়। যদিও আশপাশে কেউ না থাকায় সেই হাসি আর কারো দেখার সুযোগ নেই। গোলাঘরের খুঁটি বদলানোর চিন্তাটাই এখন তার কাছে কেমন উদ্ভট লাগে। এই গোলাঘরের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা– সেটাই যেখানে এখন নিশ্চিত করতে পারছে না, সেখানে খুঁটি বদলানোর কথা তার মাথায় কী করে আসে! সে গোলাঘর থেকে মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে।

আকাশে বেশ মেঘ জমেছে, ছাইমাখা মেঘের দল আকাশের তলে তলে জমাট হচ্ছে। শরফুদ্দিন ঠিক ধরতে পারে না, এখন কোন মাস– চৈত্র না বৈশাখ! আজকাল মাসের হিসাবটাও ঠিক তার মাথায় চট করে আসে না। হয়তো প্রয়োজনও পড়ে না। কী দরকার মাস, তারিখ এসব মনে রেখে! আগে একটা সময় ছিল। ক্ষেতের ফসল বোনার জন্য সময়টা ঠিকঠাক মতো মনে রাখা লাগত। এখনতো তার সেরকম টান নেই। কিন্তু গোলাঘরটা তার মাথা থেকে নামতে চায় না। যদি ঝড় ওঠে, তাহলে এবার আর ঘরটাকে খাড়া রাখা যাবে বলে মনে হয় না। পয়লা ঝাপটাতেই কাত হয়ে পড়তে পারে। কখনও কখনও তার যদিও মনে হয়, ঘরটা ঝড়ে বা বাতাসে পড়ে গেলেই বরং ভালো। এটা থেকে তো আর কোনো কাজে লাগছে না। আবার বাপ-দাদার আমলের এই গোলাঘর– এটাকে নিজে থেকে ভেঙে ফেলতেও মনটা কেমন ঝড়ে-দুমড়ানো সুপুরিগাছের মতো মোচড় দিয়ে ওঠে। মাথার ভেতর চিনচিন করে

রক্তের কণা, নাকি রক্তের স্রোত! শরফুদ্দিন অনেকবার মনে করেছে, ঘরটা ভেঙে ফেলি।

কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। বাবার মৃত্যু যদিও খুব বেশিদিন হয়নি। তবে সেই কবে দাদার মৃত্যু হয়েছে, গোলাঘরটা ভেঙে ফেলার কথা মাথায় আসলেই সবার আগে দাদার মুখটা মনে পড়ে। মাথা-ভরা কাশফুল যেন, এরকম পরিপাটি সাদা চুল। মুখভরা সাদা দাড়ি। চোখভরা মনে হয় মেঘের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা চাঁদের ঢেলে দেওয়া থইথই জোছনার আলো। পুরো চেহারা জুড়ে কেমন তৃপ্তির শান্ত ছায়া। লোকটা ঘরের বারান্দায় গ্রামের আরও লোকজনের সাথে বসে বৃন্দাবনি হুঁকোর নলে মুখ লাগিয়ে ধোঁয়া টানত, আর গড়গড় গড়গড় করে হুঁকোর আওয়াজ বের হত। কেমন ভালো লাগার তামাকপোড়া ঘ্রাণ বারান্দায়, বারান্দা ছাড়িয়ে উঠোনে ছড়িয়ে পড়ত।
এরকম দৃশ্য শুধু দাদার আমলের জন্যই খাটে না, শরফুদ্দির বাবাও দাদার সেই রেওয়াজটা অনেকদিন ধরে রেখেছিল। সন্ধ্যা হলেই তাদের ঘরের বারান্দায় তার বাবার বয়সী, বাবার বয়সের চেয়ে ছোট বা বড় লোকজন এসে ভিড় করত। নানারকম কথাবার্তায় তারা মশগুল থেকেছে। ঘরের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে বাটাভরা পানসুপারি এসেছে। চা-পান খেতে খেতে যখন রাত বেশ গভীর হয়ে উঠত, তখন আস্তে আস্তে আসর ভাঙত। কখনও এরকম আসরে ছেদ পড়লে বাড়িটাকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত তার। এর একটা কারণ ছিল, শরফুদ্দিনরা গ্রামের স্বচ্ছল গেরস্থ। অনেক জমিজমা তাদের। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তাতে যে ফসল হত, এই ফসলেই ভরে উঠত তাদের এই গোলাঘরটি। সারা বছর এই ধান বিক্রি করে অনেক ভালোভাবেই তাদের সংসার চলেছে। তেমন কোনো অভাব অনটন ছিল না তাদের। আশপাশে অভাবের ছোঁয়া থাকলেও তারা কখনও টের পায়নি। গোলাভরা ধান আছে, এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় স্বস্তির ধন।

আজকাল খুব মনে পড়ে শরফুদ্দিনের। অগ্রহায়ণ মাসে যখন আমন ধান কাটা হত– সে কী হইচই বাড়ি জুড়ে। ডজন ডজন কামলা মুনিষ, নানা জায়গা থেকে আসত– এরা হল্লা চিৎকার করে, গান গাইতে গাইতে ধান কাটত, ধান মাড়াই দিত, ধান ঝাড়ত– এটাই ছিল তাদের কাছে বড় এক উৎসবের মতো। সারাটা বছর যেন তারা এই উৎসবের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। অগ্রহায়ণ মাস আসার আগেই গোলাঘরটি সংস্কারের কাজ হত– শরফুদ্দিনের দাদা, পরে তার বাবা গোলাঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতেন কোন খুঁটিটার গোড়া পচে গেছে বা দুর্বল হয়ে গেছে। সেটা বদলানো হত, কাঠের খুঁটির সাথে দুএকটা বাঁশের খুঁটিও লাগানো হতো। শরফুদ্দিনরা গোলাঘর পরিষ্কার বা মেরামত হচ্ছে দেখলেই বুঝতে পারত, সামনে ধান কাটার মৌসুম।

শরফুদ্দিনকে গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শরফুদ্দিনের বউ কুলসুম বেগমের বুকে কেমন ছেত করে খোঁচা লাগে। শরফুদ্দিনকে তো সে একেবারে

লউয়েগোস্তে চিনে। একেবারে চাষাভূষা মানুষ। জমি, চাষ আর ফসল– এই ছকের বাইরে আর কোনো দুনিয়ার সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। এই নিয়ে সে কখনও ভাবেওনি। সে বছর কয়েক আগেও বলত, 'গোলাভরা ধান থাকলে চাষার পোলার আর অতো চিন্তা কী! মাছ মাংশ নাই মিললো, নুন শাকতো আছে।'

সেই শরফুদ্দিন কতদিন গোলায় আর ধান তুলতে পারেনি। গোলাঘরটা এখন খুলেও দেখে না। কুলসুম বেগম বলে, 'এখানে দাড়াইয়া কী করো। আসমানে মেঘ করছে। মনে অয় ঝড় ওঠবো। সইন্ধার আগে বাজার থাকি গিয়া আইঅওনা।'
শরফুদ্দিন এতটা সময় অনেকটা ঘোরের মধ্যে ছিল– তার মাথার ভেতর ছিল গোলাঘর। কিছুতেই সেই গোলাঘরটাকে সে মাথার ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। সে তো চাষার নাতি, চাষার পুত– সেও তো চাষা। কিন্তু সে তার নিজের জায়গাজমি কিছুই ধরে রাখতে পারলো না।

সে এরজন্য নিজেকে খুব একটা দায়ী করতেও পারে না। শরফুদ্দিনদের তো অত চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। তারা জমি চষে বীজ বুনবে, তাতে ফসল ফলবে– তাই খেয়ে-দেয়ে শান্তিতে থাকবে। যখন গোলাভরা ধান থাকবে, তখন গ্রামে গ্রামে গাজীর গীত হবে, কোথাও যাত্রাপালা হবে। কখনও কখনও গানের আসর হবে। সবাই হেসেখেলে জীবনটাকে পার করে দেবে। এসময় তার বাবার অন্যরকম একটি চেহারা খুব মনে পড়ে। তাদের টঙ্গি ঘরে যাত্রার রিহার্সেল হত। তার বাবাও একটা পার্ট দিতেন। একবার সে অনেক কান্নাকাটি করে সেই রিহার্সেলের ঘরে ঢুকতে পেরেছিল। সেদিন ছিল ফাইনাল রিহার্সেল। যাদের যাদের যাত্রার পার্ট ছিল, তারা সকলেই যার যার পোশাক পরেছিলেন। শরফুদ্দিন মনে করতে পারে না, যাত্রার নামটি। তবে এটুকু তার মনে আছে, তার বাবা মাথায় পড়েছিলেন রাজার মতো পাগড়ি। লম্বাচওড়া তার বাবাকে পাগড়ি, পাজামা আর শেরওয়ানি পরা অবস্থায় তো সে চিনতেই পারছিল না।

এরকম চিন্তার বাইরে কখনওই যেতে পারেনি শরফুদ্দিন। গ্রামের মাধ্যমিক স্কুল থেকে সে যা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, তাতে তার চলতে-ফিরতেও কোনো সমস্যা হচ্ছিল না। যেকারণে জমিজমা, চাষবাস, ফসল– এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতে পারেনি, কিংবা এটুকুও বলা যায় তার ভাবার দরকার পড়েনি। বউ কুলসুম বেগম বেশ গলা চড়িয়েই বলে, 'কী অইলো, আমি যে গলা ফাটাই কথা কইরাম। কানে যার না। শেষে মেঘতুফান আইলেতো আর যাইতায় পারতায় না।'

শরফুদ্দিন এবার গোলাঘরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বউয়ের মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ তার মনে হয়, কুলসুম বেগমের চেহারাটাও অনেকটা গোলাঘরের মতো। সেখানে যেন কতকাল কোনো আদর পড়েনি, তেলপানির ছোঁয়া লাগেনি। মায়াবতী মুখটা জুড়ে চৈত্রের শুকনো পাতার খসখসে পোড়া মেঘ। মনটা ধক করে উঠে, মাঠের খোলা বুকের মতো হু হু বাতাস মাথার উপর দিয়ে, কানের কাছ থেকে

উড়ে যায়। কুলসুম বেগম তো এরকম ছিল না– তার চোখের সামনে সেই লাজভরা চোখ, লাজরাঙা ত্বকের মুখটি ভেসে ওঠে।

তখনই তার মনে পড়ে, বাবা তখনও বেঁচে। বাবা ধান বেচে বাজারে যেতেন, আর এসে মায়ের সামনে বাজারের থলে রেখে বলতেন, 'আর মনে হয় না চাষাভূষা মানুষ বাঁচবো। ধান বেচি যে বাজার খাইবো, সেই দিন মনে হয় আর নাই।'

মা তার বাবার মুখের দিকে বোকা বোকা চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতেন, যেন এরকম আজব কথা এর আগে তাকে আর কেউ শোনায়নি। বাবা বলতেই থাকতেন, 'এক মন ধান বেচি দেখো একটা ইলিশ মাছ কিনমু। সেই সাধ্য নাই। পেয়াজ, মরিচ, তেল, নুন সব জিনিসেরই দাম খালি বাড়ছে। আর বাড়ছে ধান চাষের খরচ। কুলিয়ে চলার কোনো পথ দেখিনা।'

শরফুদ্দিন তখন বড় হয়ে গেলেও, বাবা তখনও বেঁচে বলে সংসারের পুরো দায় তার ওপর বর্তায়নি। সে ক্ষেত সামাল দিতেই ব্যস্ত। সংসারের আশয়-বিষয় নিয়ে বাবা কথা বললে সে জানতে পারত, নতুন কী হচ্ছে। না হলে সে তো কাজ না থাকলে গা-গতরে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। তাতে কোনো সমস্যা হওয়ারও কথা না, এটাই তো চাষাভূষা মানুষের কাজ। কাম শেষ তো, আনন্দফূর্তি করে সময় কাটাও। সে দেখে এসেছে, বাবা-দাদারা তাই করেছেন। আর সে তো শুধু একজন কৃষকের ছেলেই নয়, তাদের অনেক জমিজমা আছে বলে তাদের জোতজমিতে অনেক মুনিষ খাটে। তাদেরকে ঠিকঠাক মতো চালানোই তার কাজ। কিন্তু যেখানে তার বাবা-দাদা ধান বেচে জমি কিনেছেন, বাড়তি এটা-ওটা কিনেছেন।

একদিন শরফুদ্দিন দেখল সেই বাবা কিনা শুধু ধান বেচে আর সংসার সামাল দিতে পারছেন না। মা অসুখে পড়লেন, তখন ধানের জায়গা বিক্রি করে মায়ের চিকিৎসা করাচ্ছেন। ছোট বোনের বিয়ে দিলেন, তারজন্য জায়গা বিক্রি করলেন। সেই যে জায়গা বিক্রি শুরু হল, আর সেটা থামান গেল না। বাবা মারা গেলেন, একদিন মা-ও মারা গেলেন। শরফুদ্দিন যেন অথৈ সাগরে পড়ে। কোথায় এতদিন সে কামলা মুনিষ খাটিয়ে ধান চাষ করেছে। সেখানে নিজে জমিতে লাঙল ঠেলে, ধান কাটে, ধান ঝাড়ে– সারাক্ষণ ধান চাষের সাথে জড়িয়ে থাকে। তবু সংসার সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না তার।

তার মাঝেমাঝে মনে হয়, ছোটবেলায় যখন ছেলেরা দল বেঁধে মার্বেল খেলত তখন হাত থেকে কাঁচের তৈরি মার্বেল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত। অনেকটা সেরকমই তার হাতের মুঠো থেকে পিছলে পিছলে বেরিয়ে যায় বাপ-দাদার জমিজমা। শুধু কৃষক হয়ে আর সময় চলে না, সংসার চলে না। ধান চাষের পেছনে যে খরচ, তা বিক্রিটিক্রি করে আর নগদ কিছু থাকে না। একসাথে বেশি টাকার দরকার হলেই তখন জমি বিক্রি করতে হয়েছে। কৃষকের হাত থেকে জমি ছুটতে থাকে। শরফুদ্দিন কিছুতেই আর জমি ধরে রাখতে পারে না। তার মনে হয় কোথাও সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। কৃষকের

এখন কোমর ভাঙার পালা– সেই ভাঙা কোমর আর সোজা করে উঠে দাঁড়ানো কঠিন। শরফুদ্দিন যখন তার কৃষকজীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করে, তখন আশপাশের অনেক কৃষকের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। যাদের মুখগুলোকে তার মনে হয় অচেনা, চৈত্রের ফাটা জমিনের মতো রুক্ষসুক্ষ। যাদের চোখের সামনে এখন আর থোড়-আসা যুবতী ধানগাছের দোল নেই, নাচ নেই।

সেরকম একটা সময়ে শরফুদ্দিনের হঠাৎ খেয়াল হয়, তাদের গোলাঘরটি খালি পড়ে আছে। কতদিন সেই গোলাঘরে ধান তুলে রাখা হয়নি। সেটা যে ইচ্ছা করে রাখেনি, বিষয়টা তা নয়। সে যে ধান পায়, তার অনেকটা ধারদেনা শোধ করতেই শেষ হয়ে যায়। বাকি ধান আর গোলাঘর পর্যন্ত নেওয়ার দরকার পড়ে না। ধানের মাচা বা টুকরিতে এখানে সেখানে রেখে দিলেই হয়। তা দিয়ে কোনোরকম পেট চলে। মাঝেমধ্যে ধানচাল বাকিতে কিনেও খেতে হয়। শরফুদ্দিন বুঝতে পারে না, এই একটা জীবনের ভেতর এত ওলটপালট কী করে হল! যত দিন যায়, জীবনটা খালি কঠিন থেকে আরও কঠিন হয়। সে ঠিক যেন তার বাবার মতোই কুলসুম বেগমকে বলে, 'নারে বউ, জমি চষা হালুয়া মাইনষের দিন মনে হয় আর নাই। জমি যদিও সকল মাইনষের খোরাক দেয়। কিন্তু হাল বাইয়া এখন আর হালুয়া বেটার পাছার কাপড় ঘুরবো না।'

কুলসুম বেগম কী বলবে, সে-ও অনেকটা তার শাশুড়ির মতো চোখমুখ বড় করে শরফুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। শরফুদ্দিন বলে, 'হালুয়া মাইনষের দেশ। কিন্তু হালুয়াই এই দেশে দেখছি এখন সব চাইতে বিপদে। অন্যরার এদিক-ওদিক সুযোগ থাকে। শুধু হালুয়াই আছে হুড়কির চিপাত। তার কোনো রক্ষা নাই। তারে নিয়া খালি লম্বা লম্বা কথাই অইবো। বাচবো কেমনে কেউ কয় না।'

কুলসুম বেগম কী বলবে, সে তো আর শরফুদ্দিন নয়। তার মাথায় তো আর এরকম ভাবনা আসে না। সে যদিও কইলজা পুড়িয়ে সংসারটাকে সামলে-সুমলে চলছে। তবু এর থেকে কোনো মুক্তি আছে কিনা, বা মুক্তির কোনো পথ আছে কিনা, সেটা তো আর সে বুঝে না। সে স্বামীর মুখে, সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে পারলেই খুশি। নিজে কী খেলো, না খেলো– তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই তার। তার মাথার ভেতর থকথক করে পথ হারিয়ে ফেলা অন্ধকার।

যখন থেকে শরফুদ্দিনের কাছে গোলাঘর খালি পড়ে থাকার ঘটনাটা ধরা পড়ে– সেই সময়টা থেকে কেন জানি, খুব অসহায়, নিঃস্ব মনে হতে থাকে তাকে। মনে হয় কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে খামচে ধরে আছে। তাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসে। কেউ যেন তার বুকের হাড়গোড় বেছে বেছে নিয়ে গেছে। বুকের ভেতর এখন আর কোনো সম্পদ জমা নেই। তার এই শূন্যতাটুকু সে না বউ, না অন্য কারো সাথে ভাগ করতে পারে না। সে একবার হলেও শূন্য গোলাঘরটার কাছে এসে দাঁড়ায়, আর তার অসহায়ত্বটাকে যেন সে যাচাই বাছাই করে।

তখন অবশ্য একটা ঘটনা ঘটে, যেই-না গোলাঘরের কাছে আসে সে তখনই তার নাকে এসে ধাক্কা লাগে তামাক-পোড়ার গন্ধ। সে চমকে উঠে– যেন আশপাশে তার দাদা, বা তার বাবা কোথাও বসে হুঁকো টানছেন। শরফুদ্দিন অনেকটা অভ্যাসবশেই যেন চারদিকে চোখ মেলে তাদের খোঁজে (যদিও গোলাঘরের পাশে এলেই সে তামাক-পোড়া গন্ধ পায়, এটা হয়তো পুরোটা ঠিক না। সন্ধ্যার পরও সে উঠোনে যখন একা দাঁড়িয়ে থাকে, তখনও এরকম তামাক-পোড়া গন্ধ এসে তার নাকে লাগে। শুধু গন্ধই নয়। তখন তো সে হুঁকো টানার গুড়গুড় শব্দও শুনতে পায়)। তামাক-পোড়া গন্ধ পাওয়ার বিষয়টি সে একদিন কুলসুম বেগমকেও বলেছিল। কুলসুম বেগম সোজাসাপটা বলে দিয়েছে, 'ধুর, এখন কেউ তামাক খায়নি। সবাইতো বিড়ি টানে নাইলে সিগারেট টানে। এটা তোমার মনের ভুল।'

কুলসুম বেগম অনেকটা নীরবে গোলাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক গোলাঘর, না শরফুদ্দিনের কাছে– এটা ঠিক বোঝা যায় না। তবে তার খুব কষ্ট হয়। এই গোলাঘর থেকে সেও তো লোক লাগিয়ে ধান বের করেছে। এটা আর কতদিন আগের কথা। দেখতে দেখতে চোখের সামনে সব বদলে গেল। কুলসুম বেগম শরফুদ্দিনকে বলে, 'এই যে হালুয়া সাহেব। আন্ধাইর যে অর খেয়াল আছেনি! কোনসময় বাজার করবায়!'

শরফুদ্দিনের এতে কিছুটা ঘোর কাটে। সে কোনোদিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সে এখন সবজির জন্য বিচরায় যেতে পারে, বাজারে যেতে পারে– অন্য কোনোখানেও যেতে পারে। কুলসুম বেগম এ নিয়ে ভাবে না, গোলাঘরের সামনে থেকে মানুষটা সরে যাক, এটাই সে চেয়েছে। সে অনেকদিন লক্ষ করেছে, গোলাঘরের কাছে এলেই লোকটা কেমন যেন বিষাদমাখা কোনো ঘোরের মানুষ হয়ে যায়। তার চোখ কেমন জলশূন্য, আলোশূন্য হয়ে পড়ে।

সে রাতেই আকাশ তোলপাড় করে প্রচণ্ড ঝড় উঠে। মৌসুমের প্রথম ঝড় বলেই কিনা শরফুদ্দিনের মনে হচ্ছিল তাদের টিনের চাল ভেঙেচুরে উড়ে যাবে। বাইরে বাতাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ। সাথে মেঘের গর্জন, আঁধারচেরা বিজলির চমক। ঝমঝম বৃষ্টির ঝাপটানি। ঘর ভাঙার কথা মনে আসতেই আবার বুকটা ধ্বক করে ওঠে। বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সম্পদের অবশেষ বা শেষ চিহ্নগুলোর মধ্যে এই টিনের ঘরটিও একটি।

এখন যদি সেই ঘরটি উড়ে যায়, শরফুদ্দিনের পক্ষে আর নতুন করে পাকা ও টিনের ঘর বানানো সম্ভব না। কিন্তু এরকম ঝড়ের কবলে কিই-বা করার আছে তার। নিজেকে তখন পথের ধারে বসে থাকা হাত-পা বিহীন কোনো নিঃস্ব মানুষের মতো মনে হয়। এত অসহায় তাকে এর আগে আর মনে হয়নি। সময়ের চাকায় গড়িয়ে চলা শরফুদ্দিন বাঁকা কোমর সোজা করার কোনো আলামত না দেখেও এতটা অসহায় বোধ করেনি। এইসময় নিজেকে কোনোভাবেই ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে না। একসময় খাটের উপর বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে যেন সবকিছু ভেঙেচুরে যাওয়ার অপেক্ষা করে শরফুদ্দিন। এভাবে বসতে বসতে কখন যে সে বিছানায় ঢলে পড়ে, ঘুমিয়ে যায়– সেটা সে আর মনে করতে পারে না।

তার ঘুম ভাঙে কুলসুম বেগম, বাচ্চাকাচ্চাদের চেঁচামেচিতে। হঠাৎ ঘুমের ভেতর মনে হচ্ছিল মেঘের বিকট আওয়াজ, যেন আকাশটাই এখন দুমড়ে মুচড়ে ঘরের চালের উপর পড়ছে। কিন্তু চোখ মেলার পর সে কিছুক্ষণ ঘোর বা একধরনের বিভ্রমের মধ্যে সময় কাটায়। ঘরের ভেতর সকালের রোদের আভাস, তাতে হালকা আলো ফুটছে। সে ধড়মরিয়ে খাটের উপর উঠে বসে– বাইরে অনেক লোকের কোলাহল।

সে কিছু আন্দাজ করতে না পেরে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে ছুটে আসে। ঘুমছুটা চোখে উঠোনটাকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সে হঠাৎ করে অনুমান করতে পারে না কোথায় পরিবর্তনটা হয়েছে। সেরকম একটা মুহূর্তে উঠোনের উত্তর দিকটা তার চোখে খুব ফাঁকা লাগে। সে যেন মনে করতে পারে না, সেখানে এতদিন কী ছিল! আর তখনই সে বুঝতে পারে অনেক লোক সেখানে। উঠোনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটি ঘর। ঘুমের রেশটা তার চোখ থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি বলে, সে হুট করে মনে করতে পারে না এই ঘরটি এখানে কেন ছিল!

এসময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় কুলসুম বেগম।–'কতদিন কইলাম। ধান না থাউক। খুঁটিখাটি ঠিকঠাক করো। ঘরটাতো চোখের সামনে খাড়া থাকতো।'

শরফুদ্দিনের বুঝতে আর কোনো সমস্যা হয় না– বাপদাদার আমলের তৈরি সেই গোলাঘরটি আর নেই। গোলাঘরটি শূন্য হতে হতে এখন নিজেই মাটির সাথে মিশে গেছে।

জুলাই ২৬, ২০১০

প্রকাশিত দু'টি গল্পের আলোচনা

.....

তুহিন সমদ্দার

[দু'টি গল্পেরই গল্পকারদের নাম গোপন রেখে 'পিঠটান' ও 'গোলাঘর' গল্প দু'টি আলোচনার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছিল এই সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকার, সমালোচক তুহিন সমদ্দারকে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে সময় করে গল্প দু'টি আগাগোড়া পাঠ করে তিনি নিচের আলোচনাটি লিখে দিয়েছেন 'গোলাঘর'-এ ছাপার জন্য। শ্রমলব্ধ কাজটি করে দেয়ার জন্য আলোচককে জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আশা করা যায়, এই আলোচনা অন্তত গল্পকার-ব্যক্তির প্রভাব-নিরপেক্ষ হয়েছে। গল্প দু'টি এবং এর ওপর আলোচনাটি কেমন হয়েছে, সেই বিচারের ভার অবশ্য বর্তায় শেষপর্যন্ত পাঠকের ওপর।]

একটি গল্প, অন্যটি হতে পারত...

সম্পাদকের নিন্দামন্দ

[প্রথমেই জানিয়ে রাখি, 'নামগোত্রপরিচয়হীন' এহেন গল্প-সমালোচনায় আমার সায় নেই। এতে করে লেখক ও সমালোচক উভয়কেই সম্পাদক সাহেব একধরনের অবিশ্বাসের চোরকুঠুরিতে বন্দী করে শেষে যদি নির্দলীয়-নিরপেক্ষ-তত্ত্বাবধায়ক সাহিত্য-সমালোচনা আশা করেন– তা একপ্রকার অপরাধই বলতে হবে। লেখক লিখবেন এবং সমালোচক সেই লেখাটিকেই– ব্যক্তি-সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে– আমলে নিয়ে বিশ্লেষণে ব্রতী হবেন– পাঠক নিশ্চয় তারই প্রত্যাশা করেন। অথচ এহেন উদ্যোগে প্রথমেই সাধারণভাবে পাঠককেও বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, "এই যে লেখক আর (বিশেষত) সমালোচকদের দেখছেন– এরা আসলে নীতিবিবর্জিত, শঠ, ব্যক্তি-আক্রমণে সদা তৎপর, মিথ্যুক, অবিশ্বাসী প্রজাতি-বিশেষ! এরূপ আলোচকদের শাণিত নখদন্ত থেকে নিরীহ ছাগশিশুপ্রায় লেখকদের এছাড়া আর কীরূপে বাঁচাই বলুন? অগত্যা হেঁ হেঁ...।" ফলত, লেখককেও যারপরনাই ভালনারেবল-ভালোমানুষিতে অহেতুক শ্রেণী করছেন সম্পাদক। অথচ আমরা তো জানি, এককালের বাঙলা সাহিত্যের বাঘা বাঘা সৎ সম্পাদকেরা কত অসাধ্য সাধনায় কোনো চাতুরির আশ্রয় না নিয়েও প্রকৃত বিশ্লেষণী লেখাটি তাবড় ক্রিটিকের হাত দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। অবশ্য একটা দুটো সজনীকান্ত (যিনি আল্টিমেটলি কবি জীবনানন্দকে মাতাল আখ্যায়িত করায় জীবনবাবু তাঁকে আদর করে সজ্‌নে বলে ডেকেছিলেন একবার!)

তখনও ছিল। সে যা-ই হোক– একুনে আমার বক্তব্য হল: চরমতম বিশ্লেষণে এই জাতীয় সেফগার্ড খুব একটা যে কাজে আসে না, তা গোলাঘর পত্রিকায় পূর্বজ গল্প-কবিতার 'নিরপেক্ষ' আলোচনাগুলো দেখলেই প্রতীয়মান হয়। আইডিয়াটি মোটামুটিভাবে ইউনিক, সন্দেহ নেই; তবে নামবহির্ভূত লেখার পাঠ-পরবর্তী আলোচনা অনেকটা হাতমোজা পড়ে স্তনমর্দনের মতোই! যা খুশি তা লিখে দিলেই যেমন লেখা পার পেয়ে যায় না– তেমনি সমালোচক একটা মনগড়া যুক্তিতে লেখাটিকে আগাগোড়া ধৌত করলেই যে তার রং জ্বলে যাবে– তা-ও নয়। অতএব, প্রকৃত প্রস্তাবে– আইন চলুক বা না-ই চলুক, লেখা তার নিজস্ব গতিতেই চলবে, নচেৎ চিন্তাশীল পাঠক (যতটা নির্বোধ ভাবা হয় তাঁদের আজকাল) তা বিস্মৃত হতে দিতে তিলমাত্র দ্বিধা করবেন না।]

দুটি গল্প দেয়া হয়েছে আমাকে: 'পিঠটান' ও 'গোলাঘর'।

গল্প (ছোটগল্প বিশেষত) যদি রহস্য জিইয়ে রাখতে না পারে- সরলরেখার মতো সোজাসাপ্টা হয়, তবে তা হয়ে উঠতে পারে উৎকৃষ্ট কেসহিস্ট্রি। সে হিসেবে 'গোলাঘর' লেখাটি একটি উঁচু মানের বিষয়ী-অনুধ্যান তো বটেই। না হলে কেন নাম শুনেই আমার মনে হল– এটি আমাদের হৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এলিজিই বহন করবে? তারপর প্রথম লাইনে– 'উঠোনের একপাশে পুরনো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাঘরটা' আর কোনো শস্যময় সম্ভাবনার বারতা নিয়ে আসতে পারল না। তার পাশে পাঠক-আমাকে দাঁড় করিয়ে কাহিনীকার যথাসম্ভব অতীত গৌরব ব্যাখ্যা করে গেলেন, পাশাপাশি ভগ্নদূতের মতো শরফুদ্দিনের আফসোসমালা তথাপি আমাকে এতটুকু উস্‌কে দিতে পারল না আশ্চর্য! তাহলে এর মধ্যে গাল্পিক অভিনিবেশ কোথায়? দাদা-পরদাদার শান-শওকতের ফিরিস্তি তো ক্লিশে। অবশেষে মেলোড্রামার পরে লেখক পাঠকের নিমিত্তে একটি মরাল দিলেন: সময় থাকিতে করো ভবিষ্য চিন্তন! ব্যস শেষ। তা বাবা, দেশে কিংবা বিশ্বে পুঁজিবাদের ঝোল যখন বিস্মৃতির রসুইঘরে সরগরমে রান্না হচ্ছেই– ইতিহাস-ঐতিহ্য-লোক চেতনার সুক্তুনিতে সেই স্বাদ যে আর পাওয়া যাবে না– তা তো একরকম ভবিতব্যই। একে গল্পের কাঠামোয় পুরতে হলে আর-একটু নিবেদন– আর-একটু ডন-বৈঠক দিতে হবে বৈকি! তবেই-না চিন্তাশীল পাঠকের (মায় সমালোচকের) মুখে ধন্য ধন্য রব উঠবে। (জানি না কার বাড়া ভাতে ছাই দিলাম। কার কায়ক্লেশে তৈরি করা 'ইমেজে' চির ধরল। না জানি কোন্ বিখ্যাত লেখকের সুবিখ্যাত লবি থেকে আমার নামটা জনমের তরে খারিজ হয়ে গেল :) তা যাকগে। কিছু সম্ভাবনার কথাও তো বলতে হবে। কুলসুম বেগমের সংলাপের ভিন্ন ডায়লেক্ট ভালো লেগেছে। চরিত্রের বিশ্বস্ততা তৈরি হয়েছে। গোলাঘরের কাছে এলে শরফুদ্দিনের নাকে দাদার আমলের তামাক পোড়ার গন্ধ লাগার বিষয়টিও ছুঁয়ে যাবার মতো। এমনকি আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, গল্পটিতে গ্রামবাংলার কৃষকজীবনের পোড়াকপালি দুর্দশার যে

চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা শতভাগ খাঁটি ও বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু বাদ পড়ে গেছে সেই এক্স-ফ্যাক্টর; যার কারণে আমরা বানোয়াট কাহিনী পড়তে আনন্দ পাই; ভাবতে শিখি।

এবার আসি 'পিঠটান' আখ্যানে। আদ্যোপান্ত আকর্ষণে– পাঠক আপনার ভালো লাগুক, চাই না লাগুক– পড়ে যেতে হবেই। কেননা প্রথম লাইনেই গল্পের হিরো আবু মিয়ার সমস্যা গল্পকার সুকৌশলে আপনার মাথায় দিব্যি চালান করে দিয়েছেন। অথচ গল্পটি বলে গেছেন নিজের তৈরি করা ভাষায়। বিশ্বাসযোগ্যভাবে চরিত্রগুলো তাদের আচরণ কথাবার্তা চালিয়ে গেছে– এতটুকু ছন্দপতন কোথাও নেই। খুব স্থিতধী না হলে এভাবে চরিত্র নির্মাণ অসম্ভব। সিনেমায় যাকে বলে 'মেক-বিলিভ'– তার চরম নিরীক্ষা এই গল্পের প্রাণ। প্রতিটি লাইন উদ্ধৃত করার মতো, তবু একটি স্ট্যানজা তুলে দেয়াই যথেষ্ট বিবেচনা করি:

আবু ড্রাইভারের দিকে তাকায়– কিসের টাকা!
ড্রাইভার বলে– উত্তুবুত্তু কইরেন না। এরা সরকারি মামু। এগোও বান্ধা রেট। দিয়া দেন, স্যার।
না দিলে?
গাড়ি সহ থানায় লয়া যাইবো। দুইজনরেই লকআপে ঢুকায়া রাখবো।
কেন? আমরা কী কোনো অন্যায় করছি।
ন্যায় অন্যায় ব্যাপার না। সরকারি মামুগো পাওয়ার আছে। আইনের ধারা ফিফটি ফোর। থানায় গিয়া হেরইনের পোটলা ধরায়া দিয়া কইবো, বিদেশ থেইকা মাদকদ্রব্য নিয়া আইছেন। এই মামলায় বেল নাই।
বলো কী! আবু ভয় পেয়ে যায়।
ড্রাইভার হাসে– দিয়া দেন, স্যার। দিলেই খালাস।

ঘটনাটি এরকম: কুত্তা খাওয়ার দেশে দুই দশক কাটিয়ে ঋণখেলাপি আবু মিয়া দেশে ফিরে দেখে তার স্ত্রী ও একমাত্র তরুণী কন্যা কার্যত বেহাত হয়ে গেছে। সময়টা জরুরি অবস্থাকালীন। তার প্রবাসে কষ্টার্জিত টাকায় মানুষ হওয়া ভাই-বেরাদাররাও আবুর হুট করে চলে আসায় খুশি হতে পারেনি। কেননা তারাও আছে দুদকের ভয়ে দৌড়ের উপর। গত বিশ বছরে তার উপার্জিত টাকায় স্ত্রী ও কন্যার অভ্যস্ত বিলাসী উচ্ছৃঙ্খল জীবনে আবু একটি আচানক উৎপাত-বিশেষ। তার ওপরে কোরিয়া যাওয়ার আগে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি করার ধাপ্পা দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের লোন নেয়ার ফলে নিজ স্ত্রীর পরকীয়া প্রেমিক জাফরুল্লা শরাফত তাকে ধরিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। এহেন ফাঁপড়ের মধ্যে হাঁসফাস আবু মিয়া চৌদ্দশিকের দায় এড়াতে কিংবা বুঝি পরিবারের সকলের প্রতি অভিমানেই অবশেষে অন্তর্ধান করে। কিন্তু কাহিনী তারপরও আর একটু এগিয়ে শেষ হয়। দেখা যায়, সমপরিমাণ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণকারী

আবু মিয়ার স্ত্রী ও কন্যার মাঝে সম্পর্কের চির ধরেছে। যার সূচনা হয়েছিল বহু আগে। এতদিন সুপ্ত ছিল মা-মেয়ের রেষারেষি। বস্তুত আবুর প্রতিকল্প হয়ে পুটিই (আবুর মেয়ে) তার মায়ের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে আর-একটি স্বার্থপরতা করে বসে। দুর্নীতিবাজ এমপির বখে-যাওয়া ছেলে জুম্মনের সাথে ইলোপ্ হয়ে যায় সে। একাকী পড়ে থাকে পুটির মা। পর্যুদস্ত, পরাভূত, আহত অথচ 'অদ্ভুত একটা চাপমুক্তির আনন্দে' নির্ভার!

না, এটি কোনো ট্রাজিক গল্প নয়। গল্পকার সেভাবে দেখাতে চাননি। কেবল চরিত্রগুলোর ভেতরকার স্থূল সীমাবদ্ধতাই যেন এই পরিণতি ডেকে এনেছে। এ ছাড়া আর কী-ই-বা হতে পারত অন্তিমে? আমি ভেবে দেখেছি– গল্পের শেষটা অন্যভাবেও শেষ করা যেত হয়তো– কিন্তু তাতে ইতর-বিশেষ কিছু হত না। প্রকৃতপক্ষে এই কাহিনীর জন্য সফল সমাপ্তি অতটা জরুরি নয়। যে মেসেজ তিনি গল্প থেকে দেবেন ভেবেছেন– তা শতভাগ পূর্ণ হয়েছে বলে আমার ধারণা। সাবলীল গতিময়তার মধ্যে গল্পটি এগিয়েছে। আর ভেতরে ভেতরে বিভিন্ন অনুষঙ্গের পাঞ্চ সামাজিক অসঙ্গতি ও চরিত্রের ভাবগতিকে মূর্ত করেছে। পাঠক লক্ষ করুন সাহসী শব্দগুলো (বোল্ড ওয়ার্ডস); কী বিচিত্র স্পষ্টতায় তিনি সমাজের অসঙ্গতি ও পচনশীলতাকে বিবৃত করেছেন:

> *এই সংবাদ শুনে ভাই-ব্রাদাররা হায় হুতাশ শুরু করে দেয়। টেলিফোনে বলে– ও ভাই, দেশে আহিস না। দেশের অবস্থা ভালো না। দেশে এখন **পুলিশ আর মস্তান ভায়রা ভাই**। আমাগের লাইগা বরং ভিসা পাঠা। আমরাও **কুত্তা খাওয়ার দেশে** যাইগিয়া।*
>
> *আবু ক্ষেপে যায়–নো। **রং ল। নো লজ**। ওয়েবসাইটে দেখেছি **ঢাকা কাস্টমস নাকি ডাকাতদের আস্তানা**। তাই বলে আমার সেন্টের শিশি নিয়া যাবেন! এইটা ক্যামন আবদার।*
>
> *ট্যাক্সিঅলারা আবুকে ঘিরে ধরে হাসতে থাকে– আরে ভাই মগের মুল্লুক হতে যাবে কেন। বাংলাদেশ এখন গণতন্ত্রের রোডম্যাপ ধরে এগুচ্ছে। **ফ্রি ইকনমিতে মিটার কোনো ব্যাপার না**। দুই হাজার তো নর্মাল রেট।*
>
> ***আহা বাংলাদেশ!** রাতের ঢাকা এত সুন্দর! **জাপানি ট্যাক্সি, সোডিয়াম আলো, রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান!** এলাহি কারবার! কে বলে দেশের উন্নতি হয় নাই।*
>
> *তুমি কোন ভার্সিটিতে পড়? -**কিং কং** ইউন্যুভার্সিটিতে। –কোন সাবজেক্ট?– **কর্পোরেট কালচার** এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। -খাইছে! এইগুলা পড়ার কী আছে! এইসব বিদ্যা তো ধান্দাবাজি শিখায়। তুমি ইতিহাসে ভর্তি হইতা। পিওর ইকনমিক্স পড়তা। তাইলে বুঝতাম তুমি উচ্চশিক্ষা নিতাছো...।*

*আবু কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজের কাগজপত্র দেখিয়ে ব্যাংক থেকে মোটা অংকের লোন তোলে। পুটির মা শাড়ি কেনে, গাড়ি কেনে, পার্টি প্রোগ্রামে খরচ করে। সে বলে, **টাকাগুলো কাজে লাগাই**। কিছু জমি আর নতুন মার্কেটে কয়েকটা দোকান কিনে রাখি। আবু বলে– কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করবো না! পুটির মা বলে– **ইন্ডাস্ট্রির গুষ্টি মারো**। মাটি হইল সোনা।*

*পুটি গেছে কনসার্ট শুনতে। ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সে **মোবাইল কোম্পানির স্পন্সরডে ছালা পাগলা** গিটার বাজাইয়া গান গাবে। পুটিতো ছালা পাগলার নামে পাগল। ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা বাজবে বলে গেছে। **এনজিও ট্যুরে পুটির মা গেছে ভুরুঙ্গামারি**। সেখানে সে **সেক্সওয়ার্কারদের** উদ্দেশ্যে **যৌন সচেতনতামূলক** বক্তৃতা দেবে।*

*আবু বলে– 'হ্যান্ড স' আবার কী জিনিস? বন্ধু বলে– ইলেকট্রিক করাত। দুইজনে ধইরা ঘষর ঘষর করা লাগবো না। **গাছের লগে ঠাইসা ধইরা বুতাম টিব দিবা,** ব্যাস। চালু হয়া গেল। **পাঁচ মিনিটের মইধ্যে গাছ শুইয়া পড়বো**।*

*আবু বলে– 'হ্যান্ড স' দিয়া কার গাছ কাটবা? -ক্যান! **সরকারের**। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অনেক গাছ। এক হাজার গাছ কাটার ওয়ার্ক অর্ডার নিয়া **এক রাইতে পাঁচ হাজার গাছ কাইৎ** কইরা ফালামু।*

*সকালবেলা আবু চা খাচ্ছিল আর খবরের কাগজ পড়তেছিল। কয়েকদিন ধরে **পত্রিকাগুলো দুই মাথাঅলা শিশুদের** খবর ছাপতেছে। ঘটনা কী? নিশ্চয় বিদেশ থেকে কোনো **দুইমাথার ডাক্তার** এসেছে।*

*কেউ আসলে বলবো, আমি তোমার নতুন স্বামী। আমার নাম **নির্লিপ্ত চৌধুরী...**।*

*বাংলাদেশ সেনাবাহিনী **বিদেশ থেকে কুত্তা আমদানি** করছে। কুত্তাগুলার জিহ্বা লম্বা আর মারাত্মক গন্ধবাতিক। **দুর্নীতিবাজের গন্ধ ওরা চেনে**।*

*ও ভাবী তুমি **একলা মাল খাও,** এইটা ঠিক না। আমরা কি অবলা? **আমরা কি নারী স্বাধীনতা চাই না!***

*আবু মনক্ষুণ্ন হয়ে বলে– **বাপের শ্রাদ্ধ না পাপের শ্রাদ্ধ** কোনটা করতাছি বুঝার পারতাছি না। পুটির মা কঠোর কণ্ঠে বলে– ওই হইলো। **যাহা পাপ তাহাই বাপ।***

এই পাপ কীভাবে কীভাবে আমাদের আদ্যোপান্ত গ্রাস করে নিচ্ছে তার আর্কিটাইপ আবু মিয়ার ফ্যামেলি। স্বার্থ ছাড়া ঘরের বৌ-ও যেখানে 'দু পায়ের পেজগিতে' বাঁধতে নারাজ। কিন্তু এহ বাহ্য! সমাজ যখন পচনের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়– রাষ্ট্র তখন হিজড়েসুলভ আচরণ করে। কামারকে দিয়ে কুমোরের কাজ চালানোর মতো বেঠিক লোকটি অঠিক চেয়ারে আসীন হয়। গোলে হরিবোলের মতো প্রশাসনে থাকা লোকগুলোর খামখেয়ালি আর বিচারিক আয়োজনে থাকা ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাচারী কপট

সিদ্ধান্তসমূহ কীভাবে আরও আরও পচনশীল মনীষার জন্ম দেয়– এই গল্প তার একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে আবু কোনো মীমাংসিত চরিত্র নয়। অন্যায় সুযোগ আর দুর্নীতিতে সে-ও মেডেল পাওয়ার মতো সিদ্ধহস্ত– ক্যালকুলেটিভ মানুষ। কিন্তু তার আশেপাশের ভোগী ও লোভী মানুষগুলোর গ্যাঁড়াকলে টিকতে না পেরে হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায়– বোধকরি যেন এই রাষ্ট্র ও সমাজ সরকারের বিবর্জিত নীতির চৌহদ্দি পেরিয়ে মরতে মরতে মরে বাঁচার মতোই তার এই অন্তর্ধান আরো বেশি অর্থময়। গল্পটি কোনো একক ব্যক্তির ওপর ভোদাই রাষ্ট্রের রোষানলের চলচ্চিত্র নয়। বরং সমগ্র সমাজকাঠামোর রন্ধ্রে যে দুর্নীতির কু-আচার– তার সামগ্রিকতা একক ব্যক্তিপরিবারের চিত্রকল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ তো গেল বিষয়-আলোচনা। কিন্তু লেখকের প্রকৃত শক্তিমত্তা– যার ফলে গল্পটি 'হয়ে উঠেছে'– তা তার নির্জলা ঝরঝরে সংক্ষিপ্ত বাক্যের বিন্যাস আর চরিত্রগুলোর মানানসই সংলাপ। পুরো গল্পজুড়ে উইট, শ্লেষ আর পিন্স। কিন্তু তা মাত্রাছাড়া মনে হয়নি কখনো। কাহিনীর ওপেননেসের কারণেই কোথাও কোথাও আরও বেশি রসঘন করা যেত কিন্তু লেখক সেই প্রলোভন থেকে নিজেকে সংবরণ করে বরং বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়েছেন। গল্পকার যা-ই বলুন, বলেছেন তার নিজের নির্মাণ-করা গল্প-ভাষায়। এক্ষুনি কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি: ফুটফুটা সুন্দরী, চর্বির চাপে হার্টের গল্লি চিকন হয়া গেছিল, হাসির দমকে বউদের তলপেটের লুদি থলথল করে, ইত্যাদি। বিপরীতধর্মী বাক্যাংশ বা বিরোধমূলক প্রবচনের বেশ কিছু আলামত এই গল্পের বিশেষত্ব। যেমন, আবু বলে দেশে এসে আমি ব্যবসা করবো, পুটির মা বলে চ্যাটটা করবা; বাপের শ্রাদ্ধ না পাপের শ্রাদ্ধ; লাঙ্গল যার জমি তার আন্দোলনের মতো করাত যার গাছ তার; বাঁচাইতে বাঁচাইতে আনছো নাকি খসাইতে খসাইতে আনছো; গোঁয়ারের ঘরের গোবিন্দ; শের কা বেটা শোয়াসের; ইত্যাদি। পুরো গল্পের চরিত্রগুলো তো বটেই– বর্ণনাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢাকাইয়া চলতি ব্যবহার করা হয়েছে। অত্যন্ত সাবধানে করা হয়েছে কাজটি। কেবল একটি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে সবগুলো চরিত্রই দারুণভাবে উৎরে গেছে। উকিল প্রকাশ বিশ্বাসকে মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস থেকে ধার করা। প্রথমেই তার পেশাগত পরিচয়ের সাথে 'ঘুঘু' শব্দটির প্রয়োগ লেখকের দুর্বলতার প্রকাশ। তার ওপরে 'জয় মাতাজীকো জয়' এই ভাষাটা ঠিক বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে খাপ খায় না। গল্পটি পড়তে থাকাকালীন সময়ে আমি বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম কারণ এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় কাহিনী এমন ডালপালা ছড়ায় যে শেষ পর্যন্ত তাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না।

লেখকের শক্তিমত্তা আসলে এখানেই। মূল কাহিনীর সাথে ছোট ছোট আরও কয়েকটি আপাত অবান্তর বিষয় তিনি টাচ করে গেছেন– যা সার্বিকভাবে গল্পের মাংসবৃদ্ধি করেছে–মেদাধিক্য ছাড়াই। ইলেকট্রিক হ্যান্ড স'র বিষয়টি এমন একটি উদাহরণ। তবে ফুলবানুর আবু মিয়ার নাক টিপতে গিয়ে সর্দি বের করার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আমি খুঁজে পাইনি। বিষয়টি অনায়াসে বাদ দেয়া যেতে পারে... বাদ দেয়া উচিত।

হে নামহীন সুধী লেখক, আপনার লেখাটি আমাকে বারবার পড়তে হয়েছে– উল্টে পাল্টে বহুভাবে প্রিজমের মতো করে ভাবতে হয়েছে এর বর্ণময় রূপ। এই আলোচনায় তার কতটুকুই-বা ছায়া পড়ল? আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ফাইনাল কাট।

গল্প অনেকটা স্ট্রাটেজিক গেমের মতো। তাকে ধাপে ধাপে নির্মাণ করতে হয়। শুটিংয়ের মাইলকে মাইল রাশপ্রিন্ট থেকে প্রয়োজনীয় ফুটেজকে নিজস্ব ছন্দে গ্রথিত করায় যেমন চলচ্চিত্র প্রাণ পায়, তেমনি আমাদের হাজারো চলমান ঘটনাবলির মধ্যে ঠিক মানানসই ক্ষুদ্র ঘটনাংশকে যথাসম্ভব বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করতে পারার ভেতরেই গল্পের সফলতা নির্ভর করে। কাজটি বিলক্ষণ কঠিনতম। যিনি তা পারেন– তার হাতে ছয়টি আঙুল আছে বলে মানি। 'পিঠটান' গল্পের এই নির্মাণগম স্ট্রাটেজি– ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে চট করে শিফট্ করা, পরিমিত ডিটেল আর ফ্লাশব্যাকের টুকরো-টাকরা কাহিনীর ইনার ভয়েসে নিদারুণ গতিময়তার সৃষ্টি করেছে। এর বিপরীতে 'গোলাঘর' লেখাটির একরৈখিকতা কাহিনীতে কোনো বাঁক বা আকর্ষণ অবশিষ্ট না রেখে ক্রমান্বয়ে তার অমোঘ নিয়তির দিকে অগ্রসর হয়েছে। লেখক হয়তো সততার সাথে গোলাঘরের অন্তিম পরিণতি দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু তা রিপোর্টিং ধাঁচে কেবল একটি ঘটনাকেই বিবৃত করে। মাঝখান থেকে মার খেয়ে যায় গল্প হতে পারা গল্পের প্লটটি। কেননা, ঘটে যা তা সব সত্য নহে–।

২৮ সেপ্টেম্বর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

রবিউল হুসাইন

বিশ্বচলচ্চিত্রকর্মা সত্যজিৎ: ভিন্ন বিবেচনায়

বিশ্বচলচ্চিত্রের ইতিহাসে বাঙালির অবদান কোনোদিন ছিল না। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চলচ্চিত্র যেহেতু যন্ত্রকুশলতার দিক দিয়ে ও পরিবেশনার নতুন শিল্পআংগিকে আধুনিক এবং জটিল ছিল, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় প্রাচ্য বা ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের সমকালীনতা বেশ পিছিয়ে ছিল। সেই পরিবেশে চলচ্চিত্রের মতো এই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শিল্প-মাধ্যম খুব স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হতে পারেনি। আর এর বিকাশের আশা এক কথায় তখনকার দিনের পরিবেশে অসম্ভব ও অভাবিত ছিল।

কিন্তু ১৯৫৫ সালে ৩৪ বছর বয়সী সত্যজিতের 'পথের পাঁচালি' সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। ১৯১৩ সালে রবি ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনার সংগে এই অসম্ভব ঘটনার একমাত্র তুলনা চলে যখন 'পথের পাঁচালি' ফ্রান্সের কানে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৫৬ সালে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল হিসেবে বিশ্বনন্দিত হয়। দ্যাখা যায়, ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৬ এই ১১ বছরে ছবিটি ১২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে বিভূষিত হয়েছিল এবং বিশ্বচলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়-পরবর্তীকালের ইটালির নব্য-বাস্তবতা রীতির এক গৌরবময় ও সোনালি অধ্যায়কে আরো সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিল যা বিশ্বচলচ্চিত্র শিল্পের এক অখণ্ড এবং অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিগণিত।

'পথের পাঁচালি' থেকে 'আগন্তুক' এই ২৮টি কাহিনীচিত্র ১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ মোট ৩৬ বছরের সোনালি ফসল। এর ভেতরে ভেতরে ৫টি তথ্যচিত্র এবং ৩টি টেলিফিল্ম নির্মাণ করেছেন সত্যজিৎ। প্রতিটি ছবিতে তিনি তাঁর বিস্ময়কর স্বকীয়তা, সৃষ্টিশীলতা ও শিল্পসুষমা এমন এক স্তরে নিয়ে গ্যাছেন যার জন্যে কুরোশিয়োর মতো চিত্রপরিচালকও বলে গ্যাছেন যে সত্যজিতের ছবি না দেখলে মেঘ আর রৌদ্রের খেলা দ্যাখা যেত না অথবা সত্যজিতের ছবিতে কোনো বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য নেই, সবই স্বয়ম্ভব।

আসলে সত্যজিতের চিন্তা ও কর্ম এবং সেই মতো পরিবেশনা এমন এক চড়া সুরে বাঁধা যার সম্পূর্ণটা নিয়ন্ত্রিত, স্তরে স্তরে গাঁথা এবং সাজানো। এই যে পরম্পরার দর্শনগত মানসিকতা তার অসাধারণ কল্পনাশক্তি, শ্রম, শৃংঙ্খলা ও কর্তব্যবোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করে। এই কারণে অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্যের কোনো চিহ্নমাত্র নেই, প্রতিটিই নির্মেদ, নিরাবেগ, যথোপযুক্ত এবং যথার্থ। এই সব গুণ সাধারণভাবে বাঙালি চরিত্রে বিরল। ইংরেজ আমল থেকেই বাঙালির অসম্মানজনক চরিত্র কথ্যকাহিনীতে একদা বলা হত এবং এখনো হয়তো কেউ কেউ বলে থাকে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যে যে এরা অলস, ভীতু, শৃংঙ্খলাহীন, অসৎ, মিথ্যুক, চতুর, কলহপ্রিয়, চাটুকারিতাপ্রিয়, হিংসুটে, পরশ্রীকাতর, পরস্ত্রীকাতর ইত্যাদি। কিন্তু সেই বাঙালিরাই তাদের নিজস্ব সৎচিন্তা ও মেধাবলে যুগে যুগে ক্ষণজন্মা পুরুষদেরকে জন্ম দিয়েছে এবং পরে ক্রমাগতভাবে প্রমাণিত করেছে পরিস্থিতির আনুকূল্যতায় এই মানুষেরা দীপ্ত ও দীপ্যমান হতে পারে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম, কেননা মানুষের ধর্মই হচ্ছে অগ্রসরতা ও উন্নতিশীলতা। তাই জন্মেছেন রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ, শেখ মুজিব এবং সেই ভীতু ও অলস বাঙালিরাই যুদ্ধ করে সৃষ্টি করেছে এই বাংলাদেশকে। এই প্রসংগটি সত্যজিতের কর্মকুশলতার অসামান্য সৃষ্টিশীলতা ও শৃংখলাবোধ আলোচনা করলে এসে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কেননা সৃষ্টিশীলতার কাছে ইতিহাসও বিপর্যস্ত হয়ে থাকে।

সত্যজিতের ছবিতে শিল্পনির্দেশনা, পরিচালনা ও নির্মাণ তার শিল্পচরিত্রের শৃংখলাবোধ, অটুট আঁটসাঁট বাঁধুনি ও গাঁথুনি। একটি অনায়াস সহজ ভংগি, মনে হয় কিছুই না, আটপৌরে কিন্তু কঠিন সেই রীতি যেমন, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। জীবন থেকে উৎসারিত সেইসব শিল্পচেতনা ও বোধ, এর পেছনে আছে একটি অনুসন্ধিৎসু সংগ্রামী মানুষের চির-বালকসুলভ জ্ঞানপিপাসা এবং সেই মতো দীর্ঘ প্রস্তুতি। পারিবারিক ঐতিহ্য, মায়ের সংগ্রামী জীবন, একমাত্র পুত্র হওয়া সত্যজিৎকে যেমন অন্তর্মুখী ও নিঃসঙ্গতাপ্রিয় করে তুলেছিল, সেইটিই পরবর্তীকালে জীবনের প্রতি দৃঢ়তা, একাগ্রতা, সংকল্পে অটল কর্মস্পৃহা এনে বহির্মুখী একটা সৃষ্টিশীল মন-মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করেছে। তাই তাঁর ছবিতে শিল্প-পরিচালনা, নির্দেশনা শুধুমাত্র বংশীচন্দ্র গুপ্ত বা অশোক বসুর শিল্পনির্দেশনা নয়, এই শিল্পক্ষমতা সামগ্রিক অর্থে বিশাল ব্যাপ্তি ও যোজনায় ছড়িয়ে গ্যাছে।

অর্থনীতিতে স্নাতক, পরবর্তীকালে মায়ের ইচ্ছেয় শান্তিনিকেতনে অসমাপ্ত বছর দুই-তিন শিক্ষানবিসি সত্যজিতের বংশধারায় তৈরি শিল্পচৈতন্যকে আরো ক্ষুরধার করে তোলে। রবীন্দ্র আবহাওয়া, ব্রাহ্ম সমাজ, তার আগে ডিরোজিওর ইয়ং বেংগল আন্দোলনের ঢেউ, কোলকাতার কুখ্যাত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সবকিছুই সত্যজিৎকে নির্মাণ করতে সাহায্য করেছে। বলা যায়, তিনি বোধ হয় সেই বেংগল রেনেসাঁর লাস্ট অব দি মহিকান্স্। পারিবারিক সূত্রে লেখাপড়া, ছবি আঁকা এবং সংগীত– তিনটিই তিনি পেয়েছিলেন আবহাওয়া গুণে। এই সম্ভাবনাকে তীর্যক-তীক্ষ্ণ করে তোলেন

নন্দলাল এবং বিনোদ বিহারী, তাঁর দুই গুরু এবং মাস্টারমশাই। তারা তাঁকে প্রকৃত শিল্পের দিক ও মন-মানসিকতায় করে তুললেন ভারতীয়, দেশীয়, নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার মুখোমুখি। তারা শিখিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্পধারার সংগে প্রাচ্য শিল্পধারার কোথায় পার্থক্য আর মিল। হাতে-কলমে শেখাতে গিয়ে সত্যজিতের শিল্পীমনকে নন্দলাল ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য দিয়ে মুড়ে দিলেন। ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর মাস্টারমশাইরা বলেছিলেন যে, এ দেশের শিল্পরীতি থেকে সত্যজিৎ যেন কোনোদিন বিচ্যুত না হন। পশ্চিমা রীতিতে ছবি আঁকা শুরু হয় উপর থেকে। আগে পাতা, ডাল, কাণ্ড তারপর মাটি। কিন্তু প্রাচ্যরীতিতে এর উল্টোটি। প্রকৃতির নিয়মে গাছ যে ভাবে বাড়ে তেমনি। প্রথমে মাটি, যেটি ভিত্তি, তারপর কাণ্ড, ডাল-পালা, তারপর পাতা-ফুল। আরো বলেছেন, স্কেচের যে লাইন আঁকা হয় কাগজে, ধরা থাক একটা গোরুর বা প্রাণীর, লাইনটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে অনুভব করা যায় যে সেই লাইন শুধুমাত্র পেন্সিলের সাধারণ আঁচড় নয়। তার নিচে আছে রক্ত, মাংস, ধমনী। এই যে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সর্বোপরি নিজের দেশ, পরিমণ্ডল, কৃষ্টি-সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিকে সত্যিকার অর্থে সার্থকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে শিখিয়েছিলেন তাঁর মাস্টারমশাইয়েরা। এই কথা সত্যজিৎ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে গ্যাছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এখনো তাঁর ইচ্ছে হয় মাস্টারমশাইদের পায়ের নিচে পড়ে থাকতে।

যুবক বয়সের প্রস্তুতিপর্বে সত্যজিতের এই শিক্ষাই প্রকৃত অর্থে তাঁর প্রতিটি ছবিতে প্রতিফলিত। তিনি সব সময় নিজের দেশ, সমাজ ও পরিমণ্ডলের ভেতরে থেকে কাজ করে গ্যাছেন এবং তাঁর শিল্পীমন তথা ছবির শিল্প-পরিচালনা বা নির্দেশনা দেশীয় ঐতিহ্যে জারিত হয়ে অসামান্য রূপে পরিবেশিত হয়েছে আর তা বৈশ্বিক শিল্পপরিবেশের এক গৌরবময় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যপঞ্জিতে দ্যাখা যায়, সত্যজিতের আজীবন বন্ধু ও শিল্পী বংশীচন্দ্র গুপ্ত ২৮টি কাহিনীচিত্রের মধ্যে ২০টির শিল্পনির্দেশনায় ছিলেন। বাকি ৮টায় ছিলেন অশোক বসু তেমনি ৫টি তথ্যচিত্রের মধ্যে ১টি বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং ১টি অশোক বসু, ও ৩টি টেলিফিল্মর মধ্যে ১টি বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং ২টি অশোক বসু।

সত্যজিৎ বলেছেন, 'কোনোরকম গালভরা প্রচারমূলক বক্তব্য পেশ না করে আমার ছবিতে আমি আমার গল্পটাকেই উপস্থিত করতে চাই। প্রথম এবং অন্যতম কথাই হল তাকে একটা গল্প হ'তে হবে। আমি কাহিনী বা প্লটে বিশ্বাস করি। কারণ, গল্প বলার ভারতের একটা ঐতিহ্য আছে।'

সত্যজিতের এই মূলভাবনার সম্প্রসারিত রূপ তাঁর ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, কথোপকথন, শিল্পনিদের্শনা, অভিনয়, সংগীত প্রতিটি বিষয়ে প্রতিফলিত। এই জন্যে তাঁর লাল খেরোখাতায় প্রতিটি দৃশ্যের খুঁটিনাটি সাবলীল ক্ষমতার ছবি এঁকে একের পর এক ফিল্ম সদৃশ স্কেচে ভরিয়ে তুলতেন। কী করবেন তার সম্পূর্ণ ভাবনাটা তিনি ছবির

মাধ্যমে সাজিয়ে তুলতেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে তিনি সেটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে সেলুলয়েডে রূপ দিতেন। আসলে এইভাবে তিনি তাঁর সহকর্মী এবং শিল্প-নির্দেশককে তাঁর কল্পনার অনুষঙ্গী করে তুলতেন। এবং তাঁরা সেগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করতেন। এই বাস্তবায়িত রূপ আমরা তাঁর প্রতিটি ছবিতে অসামান্য রূপে দেখি। 'পথের পাঁচালি'তে ঝড়ের রাতে কুপিজ্বলা, শতছিন্ন বাতাস-কাঁপা পর্দা কিংবা বা ঝড়ের পরে হরিহর যখন ফিরে এল গ্রামে, সেই সময়কার পড়ে-থাকা টুকিটাকি উঠোনময় জিনিষপত্তর, গাছের ভাংগা ডাল, ঝরা পাতা কিংবা ইন্দির ঠাকরুনের ছিন্ন পাটি নিয়ে ফিরে আসা এবং সর্বোপরি অপুদের গরুর গাড়িতে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পর ঘরের মেঝের ফাটল বেয়ে একটি বাস্তুসাপের চকিতে চলে যাওয়া– সবকিছু এত নিখুঁত বাস্তব ও স্বাভাবিক যে এই ধারার পরম্পরা তাঁর প্রতিটি ছবিতে দৃশ্যমান এবং নেত্রগ্রাহ্য এক অনুপম সৌন্দর্যের জন্ম দিয়েছে। 'মহানগরে' নিম্নবিত্ত এক শহুরে পরিবারের ঘরের দৃশ্য, দেয়ালের আস্তর-খসানো নগ্ন বাস্তবতা সত্যজিতের কল্পনাপ্রসূত হলেও এর অসামান্য রূপ দিয়েছিলেন বংশীচন্দ্র গুপ্ত। এক বিদেশি দেখে ভেবেছিলেন যে প্রতিটি দেয়ালের নিচে বুঝি চাকা লাগানো, যাতে ক্যামেরা চালানোর সময় দেয়ালগুলো সরানো যাবে, যেমন করে স্টুডিওতে অন্যরা করে থাকে, কিন্তু আসলে তা ছিল স্থায়ী যা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে এতটুকু পরিসরে সত্যজিৎ কীভাবে ক্যামেরার কাজ করেছেন। এরকম বহু উদাহরণে ভরপুর সত্যজিতের ছবিগুলো। 'চারুলতা' ছবিতে যে ঘরটি ছিল, সেটির স্কেচে দ্যাখা যায় ছবির পাশ দিয়ে লেখা আছে কী কী আসবাবপত্র দিয়ে ঘরটি সাজানো হবে তার অনুপুংখ বিবরণ ও তালিকা। তেমনি দ্যাখা যায় 'অপুর সংসার' ছবিতে অপুর ঘরের স্কেচে চৌকি, আলনা, বইয়ের র‍্যাক কত কী খুঁটি-নাটি জিনিষপত্তর, যা নতুন একটি সংসার পাতায় জন্যে কাজে লাগবে। আসলে ন্যাচারালনেস বা প্রাকৃতিকতাকে রিয়েলিস্টিক বা বাস্তবসম্মত করে তোলাই শিল্পীর ক্ষমতা নির্দেশ করে। সত্যজিতের সেই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। আপাত খুঁতখুঁতে স্বভাবের, যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ঈপ্সিত ফল পাওয়ার জন্যে, সত্যজিৎ তাই সব ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন এবং অতৃপ্ত। এসবই ছিল একজন খাঁটি শিল্পীর গুণবৈশিষ্ট্য। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, গড ইজ ইন ডিটেইল্‌স্ অর্থাৎ খুঁটিনাটি অনুপুংখতার ভেতরে ঈশ্বর বাস করেন। সত্যজিৎ সারাটি জীবন ধরে সেই সুন্দর ও সৎ ঈশ্বরকেই খুঁজে গ্যাছেন। 'শাখা-প্রশাখা' ছবিতে একটি কথা আছে যে, যে বস্তুটি যত সহজ-সরল তার ভেতর দিয়ে ততই মহৎ কিছু বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি ও প্রবল। শিল্পী সত্যজিৎ যিনি আপাদমস্তক একজন পরিপূর্ণ শিল্পী ছিলেন, তাঁর শিল্পীজীবনের আপ্তবাক্যই যেন ছিল এটি।

শিল্পনির্দেশনা শুধুমাত্র কোনো দৃশ্যের সেট বসানো বুঝায় না, সামগ্রিক অর্থে অভিনয়, দৃশ্যকল্প, ছবির ফ্রেমিং, কম্পোজিশন বা গঠনরীতি, যথার্থ সংগীত, শব্দ, ক্যামেরার ফেড-ইন, ফেড-আউট, জাম্পকাট, মন্তাজ, অপসৃয়মাণ দৃশ্য, নিকটের বড়ো

দৃশ্য সব বুঝায়। একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর ছবিতে স্পষ্ট, সেটা হচ্ছে তথাকথিত আধুনিকতার নামে মন্তাজ, জুম, স্লো বা জাম্পকাট দৃশ্য একেবারে নেই বললেই চলে। তিনি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি বাঙালি-জীবন বা কাহিনীর রূপায়ণ করেন, সেই জীবন বা ছবিতে এই রকম দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়। গল্প বা কাহিনীর কাছে সৎ থাকার জন্যে ওই সব গিমিক্সকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন সচেতনভাবে। যা জীবনের জন্যে স্বাভাবিক ও সাবলীল এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতায় ঋদ্ধ তাই তিনি অনুসরণ করেছেন। তাঁর ছবিতে চরিত্রানুযায়ী শিল্পী খোঁজা ও সংগ্রহ করাও উঁচুদরের শিল্প-নির্দেশনা প্রমাণ করে। তা না হলে বেশ্যাপল্লী থেকে কীভাবে এবং কেমন করে অশীতিপর বৃদ্ধা চুনীবালার মতো মহতী এক শিল্পীকে খুঁজে বের করেন কিংবা কীভাবে খুঁজে পান প্রয়াত প্রমোদ গাঙ্গুলীকে?

ছবির ফ্রেমিং এবং কম্পোজিশনে সত্যজিৎ তাঁর শিল্পীমন দিয়ে বিশ্বচলচ্চিত্রের কতকগুলো মহৎ সৃষ্টির উদাহরণ দিয়েছেন যা কালজয়ী এবং ধ্রুপদী মাত্রার। 'পথের পাঁচালি'তে ইন্দির ঠাকরুনের বহুল আলোচিত মৃত্যুদৃশ্য– মৃতার হাঁ-করা মুখে মাছি, দুর্গার ভয়মিশ্রিত অবাক-করা চাউনি, পায়ে লেগে ঘটির গড়িয়ে যাওয়া, দুর্গার মৃত্যুর পর অপুর পুঁতি খুঁজে পাওয়া, পরে পানা-পুকুরে ছুঁড়ে দিয়ে পানির কেন্দ্রানুগ আবর্ত সৃষ্টি ও খুঁজে-যাওয়া, 'মহানগরে' বৃদ্ধের লাঠিটি শব্দ করতে করতে সিঁড়িতে গড়িয়ে যাওয়া, 'জলসাঘরে' বিশ্বম্ভর বাবুর মদের গ্লাসে মাছি পড়া, 'চারুলতায়' চারুর জানালার খড়খড়ি তুলে নিজের অবরুদ্ধ জীবনের বিপরীতে বাইরের রৌদ্রালোকিত কাটা কাটা দৃশ্য কিংবা দোলনায় দুলে ওঠার সংগে ক্যামেরা সমেত যাবতীয় দৃশ্যের দুলে দুলে ওঠা, 'অপুর সংসারে' বউয়ের টাঙ্গা গাড়িতে ছেঁড়া পর্দার ভিতর দিয়ে কোলকাতা শহর অবাক চোখে দ্যাখা অথবা সকালবেলার কুয়াশার ভিতর চলন্ত রেলগাড়ির তলায় এক শুওরের কাটা-পড়া ও তার করুণ মরণ-চিৎকার, কিংবা 'শাখা-প্রশাখা'য় বৃদ্ধ পিতা অমরনাথের সংগে মানসিক রোগী পুত্র প্রশান্তের মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সিসটাইন চ্যাপেলের সেই বিখ্যাত ঈশ্বর ও আদমের হাত স্পর্শ করার অনুরূপে দুজনের চারটি হাত মেলানো– সব এখন বিশ্বচলচ্চিত্রের ধ্রুপদী দৃশ্য। এসব দৃশ্য শিল্পনির্দেশনার চরম চূড়াতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং এসব দৃশ্য বার বার দেখেও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। যে সত্যজিৎ লাইকা বাক্স-ক্যামেরা থেকে অরিফ্ল্যাক্স ক্যামেরা চালিয়ে সার্থকতার চরম বিন্দুতে পৌঁছেছিলেন তার সীমাবদ্ধ যন্ত্রকৌশল চলচ্চিত্রসামগ্রীর অভাব কখনো পেছনে থাকতে দ্যায়নি শুধুমাত্র তাঁর চরম নিষ্ঠা ও শৃংখলাবোধের জন্যে। বিদেশিরা বার বার অবাক হয়েছে এই ভেবে যে ওইসব মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি একের পর এক কীভাবে অপূর্ব ও অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করে গ্যাছেন। 'হীরক রাজার দেশে'র শুটিং করতে তিনি যখন রাজস্থানের মরুভূমিতে ছিলেন তখন তাঁর শুটিংস্থলের অনতিদূরে একটি বোম্বে ফিল্মের শুটিং-এর জন্যে পরিচালক, নায়ক-নায়িকাদের

শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সারি সারি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। তাঁরা তো দেখে অবাক সেই গরমে কীভাবে সত্যজিতের মতো পরিচালক গরিবানা হালে শুটিং করছেন।

সত্যজিৎ বলেছেন, আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার জন্যে মা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন। আমার মায়ের গুণের শেষ নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা কাজ করার আদর্শ আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আসে তিনি তাঁর মায়ের আদর্শে দীক্ষা নিয়ে এই রকম কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজের কাজে সৎ হতে পেরেছিলেন। তাই দ্যাখা যায় যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, তাতে সোনা ফলিয়েছেন।

ভয়েটল্যাণ্ডরে ক্যামেরায় স্থিরচিত্র তুলে বিলেতের এক কাগজের প্রথম পুরস্কার পান। আন্তর্জাতিক প্রচ্ছদ প্রদর্শনীতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' বইয়ের প্রচ্ছদচিত্রের জন্যে সোনার মেডেল পান। রে'জ লেটার অর্থাৎ রায়ের অক্ষর নামে তাঁর নিজস্বরীতির ইংরেজি অক্ষরমালা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে তিন বছরের শান্তিনিকেতনের লেখাপড়া বন্ধ করে ডি জে কিমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় ভিসুয়ালাইজার হিসেবে চাকরি নেন। এরপর সিগনেট প্রেসের ডিকে গুপ্তের সংগে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন বইয়ের মলাট আঁকা শুরু করেন। এবং এই মলাটশিল্পের চেহারা তাঁর সৃজনীশক্তির জাদুস্পর্শে তখন সম্পূর্ণ বদলিয়ে যায়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি'র ছোটদের সংস্করণ 'আম আটির ভেঁপু' বইটির অলঙ্করণ করেন, তখনই তাঁর 'পথের পাঁচালি' ছবি করার ইচ্ছে মনে জাগে। পরে হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্তের সংগে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গঠন করেন। এসময় জাঁ রেনোয়া আসেন 'দ্য রিভার' ছবির জন্যে। খুব কাছ থেকে সেই ছবির নির্মাণরীতি দ্যাখেন। ইতিমধ্যে ডি জে কিমারের আর্ট ডিরেকটর হিসেবে পদোন্নতি হয় এবং প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন। লন্ডনে প্রায় ১০০টি ধ্রুপদী ছবি দ্যাখেন খুব সীমিত সময়ে। এইভাবে তাঁর চলচ্চিত্রের প্রস্তুতি গ্রহণ। প্রথমে ইচ্ছে ছিল হরিসাধন দের সংগে 'ঘরে-বাইরে' ছবি করার চিন্তা তা না হয়ে 'পথের পাঁচালি' এবং তারপরেই ইতিহাস সৃষ্টি। তিনি চলচ্চিত্রের কারুকৌশলেও সীমিত যন্ত্রপাতি নিয়ে সৃজনীশক্তির ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। 'গুগাবাবা' অর্থাৎ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে ভূতের কণ্ঠের জন্যে টেপ দ্রুত চালিয়ে যে তাড়াহুড়াপূর্ণ শব্দ সৃষ্টি হয় সেই ধারার প্রথম প্রবর্তন করেন। চারটি ভূতের নৃত্যদৃশ্য চারটি স্তরে– প্রথমে সোজা, তারপর উল্টো এই ভাবে করে নিয়ে, যেহেতু ক্যামেরা অত উঁচুতে নিয়ে বিশাল করে দেখাবার উপায় ছিল না, তাই এই অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। 'শতরঞ্জ কী খেলাড়ি' ছবিতে একই সময়ে ইংরেজি ও হিন্দি কথা জুড়ে আর একটি অভিনবত্ব আনেন ডাবিং-এর ক্ষেত্রে যা গিনিজ বুক অব ওয়ার্ল্ডের সিনেমাটোগ্রাফিতে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সত্যজিৎ সংগীতে চিরকাল নিমজ্জিত ছিলেন, বিশেষ করে পাশচাত্য সংগীতে। রবিশঙ্কর, বেলায়েত খাঁ'র পাশাপাশি বাখ, মোজার্ট, বেটোভেনের দারুণ ভক্ত ছিলেন,

বিশেষ করে মোজার্টের। তাঁর অনেক ছবির আবহসংগীতে এদের সংগীতকর্মকে ব্যবহার করেছেন। ভালো পিয়ানো বাজাতেন, নিজের প্রায় ছবিতে এবং অন্যের পরিচালনায় ছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছেন, নিজের সুকণ্ঠের ধারাভাষ্য দিয়েছেন এবং চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। 'শাখা-প্রশাখা'য় বাখের সংগীত সম্বন্ধে কথোপকথন আছে। সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, বিভূতিভূষণ ছাড়া পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের কাফকা, টমাস মান, টলস্টয়, দস্তয়ভস্কির লেখা পছন্দ করতেন। নিজে ৪০ বছর বয়সে সাহিত্যরচনা শুরু করেন। বিশেষ করে শিশু সাহিত্য ও বিজ্ঞান কল্পকাহিনীতে এবং সর্বকালের একজন সেরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর গল্পকার হিসেবে আশ্চর্যরকম সফলতা লাভ করেন। প্রায় ৩৮টি বই লিখেছেন এবং আইজাক আসিমভ সম্পাদিত পৃথিবীর একশটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কল্প-কাহিনী সমগ্রে তাঁর গল্প স্থান পেয়েছে। 'দি এ্যালিয়েন' নামে ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা একটি জীব সম্বন্ধে ছবি করতে চেয়েছিলেন, তার প্রতিকৃতি ও চিত্রনাট্যও শেষ করেছিলেন। শোনা যায় এই কাহিনী কিভাবে যেন বিদেশে পাচার হয়ে যায় এবং স্পিলবার্গের বিখ্যাত 'ইটির' সংগে 'দি এ্যালিয়েনে'র বিস্ময়কর মিল দ্যাখা যায়। এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ প্রসংগ সব সময় এড়িয়ে গ্যাছেন।

জীবনে সত্যজিৎ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তথ্যপঞ্জিতে দ্যাখা যায়, চলচ্চিত্রের জন্যে দেশি-বিদেশি মোট ৭০টি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৯১, কান থেকে লস এ্যাঞ্জেলস-এর অস্কার মোট ৩৫ বছর ব্যাপী মৃত্যুপূর্বকাল পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পর পেলেন ভারত সরকার কর্তৃক 'আগন্তুকে'র জন্যে। আরো ভবিষ্যতে কত যে পাবেন কে জানে। এতসব কৃতিত্ব সত্ত্বেও এমন একটি সৃষ্টিশীল ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রেখে কিছু সমালোচনাও করা যায়। আশা করি পাঠকেরা ভেবে দেখবেন। যেমন,

(.) তাঁর কৃতিত্ব আরো পরিপূর্ণতায় ভরে উঠত যদি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর কাহিনী বেয়ারিম্যান, বুনুয়েল বা ফেলিনির মতো নিজেদের রচনা হত। মহৎ সাহিত্যের চলচ্চিত্র রূপায়ণ বোধ হয় কিছুটা পরিমাণ অনায়াসলব্ধ যেহেতু মূল শিল্পগুণ তাতে বিদ্যমান থাকেই, সেই আলোকে কথাটির সূত্রপাত করে বলা যেতে পারে। তাছাড়া মূল কাহিনী নিজের রচনা হলে সমস্ত কিছুই নিজের সৃষ্টি এই রকম কৃতিত্বের দাবিদার সম্পূর্ণ হয়।

(.) দ্যাখা যায় তিনি তাঁর প্রথম জীবনের মন-মানসিকতায় ও চলনে-বলনে পাশ্চাত্যধারার ভক্ত ছিলেন। ভারতের বিশাল সংগীত-ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী পাশ্চাত্যসংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরে অবশ্য শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর মননে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যাই হোক অনেকে মনে করেন, ছবির পরিচালনায় তিনি যেমন অনন্য, সংগীত পরিচালনায় সেরূপ সমমানের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি যেহেতু সেটি তাঁর অধীনস্থ বিষয় ছিল না। ছবি নির্মাণের

সবকিছুর দায়িত্ব এককভাবে না নিয়ে অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ওপর ছেড়ে দিলে হয়তো ফল আরো পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ হত ।

(.) তাঁর জীবদ্দশায় যখন তিনি পরিপূর্ণ সৃষ্টিশীল এক আন্তর্জাতিক মাপের ব্যক্তিত্ব, তখন বাংলাদেশে এতবড় একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘটল । এদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে ছিল তাঁর পূর্বপুরুষের আবাসস্থল । এসব ছাড়াও একজন বাঙালি এবং সর্বোপরি তাঁর মতো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল চিত্রস্রষ্টা হয়েও বাঙালি ইতিহাসের এতবড় ঘটনা সম্বন্ধে শুধুমাত্র চলচ্চিত্রনির্ভর শিল্পসৃষ্টির কারণেও তাঁর দিক থেকে কোনো ছবি তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ বা আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি, এটা খুব আশ্চর্যজনক । তাঁর মতো স্রষ্টা এই বিরল স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ে কাহিনীচিত্র নির্মাণ তো দূরের কথা একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেননি । এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে তাঁর এ বিষয়ে যেহেতু কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাই এই সবে তিনি আগ্রহী নন । তবুও কথা থেকে যায় ।

(.) তাঁর ছবি নির্মাণ ধ্রুপদী রীতির । তিনি আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাই অত সময় দেননি । ফলে ছবিগুলো বেশ ধীর লয়ের । নতুন আধুনিক চিত্ররীতি সৃষ্টির বদলে তিনি প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে সেগুলোকে আরো ক্ষুরধার করে ব্যবহার করছেন ।

(.) সারাজীবন প্রায় নতুন শিল্পীদের নিয়ে তিনি কাজ করেছেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি অসাধারণ সব ছবি তৈরি করেছেন । কিন্তু ছবির তুলনায় অভিনয়ের দিক দিয়ে তিনি তাঁর ছবির সাহায্যে অন্যান্য দেশের বড় পরিচালকের ছবির কিছু শিল্পীদের মতো বড় মাপের শিল্পী তেমনভাবে আমাদেরকে উপহার দিতে পারেননি । হয়তো-বা উন্নয়নশীল দেশের শিল্পী বলেই আন্তর্জাতিকভাবে তারা অনুরূপভাবে স্বীকৃত হননি ।

(.) তিনি শিল্পীদের সম্বন্ধে শেষজীবনে বলেছেন যে, নতুন শিল্পী নিয়ে কাজ করা মানে সময়ের অপচয় করা । তিনি তাই শুধুমাত্র পুরনো অভিজ্ঞতাপূর্ণ শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী । নতুনদের তুলনায় তারা তাড়াতাড়ি কাজ বোঝে এবং সেইমতো সাড়া দ্যায় । এই কথাগুলো তাঁর আগের বলা কথার সংগে মেলে না, তাই স্ববিরোধী ।

(.) অস্কার পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি বলেছেন যে, এটি হল চলচ্চিত্রের নোবেল পুরস্কার, এরপর আর কিছু পাওয়ার নেই । তাঁর মতো দেশি-বিদেশি অসংখ্য পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অসাধারণ একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মুখে কথাগুলো যেন মানায় না । তিনি এসবের ঊর্ধ্বে যেতে পারতেন অনায়াসে । হয়তো-বা রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তাঁর এই উক্তি ছিল আবেগাক্রান্ত ।

(.) শেষের দিকে তাঁর ছবির মান আগের ছবির তুলনায় তত উৎকৃষ্টতর মানের হিসেবে পরিগণিত বা প্রমাণিত হয়নি । বিশেষ করে সমালোচকদের চোখে । এরকম

বিরূপ সমালোচনা হলেই তিনি ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন। এমন একজন মহৎ শিল্পীর এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকে বিব্রত হতেন, যেহেতু তাঁর মতো শিল্পী এসব ক্ষুদ্রতার অনেক ঊর্ধ্বে থাকবেন এই আশাই তারা করতেন।

আসলে একটি মানুষ যখন চতুর্দিক থেকে অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠেন তখন আমাদের দেশের সাধারণেরা তার ভেতর কোনোরকম ক্ষুদ্রতা, স্ববিরোধিতা বা দুর্বলতা ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না, পরিবর্তে তারা তাকে একজন দেবতার মতো নিষ্কলুষ একটি মানুষ হিসেবে দেখতে চান এবং এ-কারণেই এই সব সমালোচনার জন্ম ও উৎপত্তি। কিন্তু হাজার হলেও মানুষ তো মানুষই, অন্য কিছু নয়।

যাইহোক, এতসব সমালোচনা সত্ত্বেও সত্যজিতের ছবিতে শিল্পরূপ সামগ্রিক অর্থে এদেশের মানুষের জীবনের প্রতিরূপ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ ভালোবাসা-বোধানুভব-দেশপ্রেমকে তিনি নিপুণ শৈল্য-চিকিৎসকের মতো কেটেছেঁটে দেখিয়েছেন তাঁর ক্যামেরা নামক ক্ষুরধার দৃশ্য-অস্ত্র দিয়ে। যতই দিন যাবে ছবিগুলো ততই আমাদেরকে আরো গভীরভাবে নিজেদের স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব বুঝাতে সাহায্য করবে। এগুলো আমাদের জন্যে চিরদিনের শিল্প-উৎস হয়ে থাকবে।

কিশোরগঞ্জের মসুয়া গ্রাম, তাঁর পৈত্রিক আদি নিবাস ছিল, তারপর বিশপ লেফ্রয় রোডের বাসা, 'পথের পাঁচালি'র নিশ্চিন্দপুরের পটভূমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাড়িয়ার কাছে বোড়াল নামক গ্রামও ঠিক অর্থে তাঁর আদি নিবাস যেখান থেকে তাঁর শিল্পীজীবনের সৃষ্টি বা শুরু। তারপর ফুলে ফলে ভরে আনত সেই বিরল জাতের ব্যক্তি-বৃক্ষটি আমাদের চলচ্চিত্রের চিরকালের প্রেরণা হয়ে রইবেন। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র শিল্পের শূন্যস্থান পূরণের যে ঐশীবাণী দিয়েছিলেন এই চলচ্চিত্র শিল্পের এবং তার প্রকৃত স্রষ্টার অভাবের কথা মনে রেখে, সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন সত্যজিৎ মাত্র তার ২৭ বছর পরে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথই পুনর্জন্ম লাভ করেছেন সত্যজিৎ নামক এই বিশ্বচলচ্চিত্র-কর্মার মাঝে পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে, মননে, মেধায়, কর্মে, বৈদগ্ধ্যে, উদ্যোগে, আচরণে এবং সর্বোপরি শিল্পসৃষ্টিতে।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

গণসংগীতের গাঙচিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী "সত্যেন সেন গণসংগীত উৎসব ও জাতীয় গণসংগীত প্রতিযোগিতা ২০১০"-এর আয়োজন করেছে। গণসংগীত-এর কথা মনে হলেই যাঁদের কথা সর্বাগ্রে স্মরণে আসে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গুরুসদয় দত্ত, নিবারণ পণ্ডিত, রমেশচন্দ্র শীল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সত্যেন সেন, সলিল চৌধুরী, দেবব্রত বিশ্বাস এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস। উদীচী'র উৎসবে গণসংগীতের গাঙচিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জীবন ও গান নিয়ে এই লেখাটি শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করেছি।

এক

জন্ম হয়েছে ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমিতে। পিতা হরকুমার বিশ্বাস ও মাতা সরোজিনী দেবী। মামাবাড়িতে সংগীতের শিক্ষা ও চর্চার পরিবেশ ছিল। দাদু রাজমোহন চৌধুরী ছিলেন একজন প্রখ্যাত তবলাবাদক। সেই সূত্র ধরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তার বড় ভাই আফতাব উদ্দিন খাঁ-য়ের যাতায়ত ছিল বাড়িতে। মা ছিলেন সুকণ্ঠী গায়িকা। বৃটিশ শাসন-শোষণের মাঝে নদ-নদী, হাওর আর সুরমা-খোয়াই-এর শাখা-উপশাখা বিধৌত শ্যামল প্রান্তরে সবুজ ঘাসে, শালিধানের ঘ্রাণে গড়ে উঠেছে মন। মাটি আর মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম আকুতি, শ্রীভূমি সিলেট যেন ভরে দিয়েছে বুক– শানিত করেছে সুরের স্রোতধারায়। তিনি মেহনতি মানুষের, গণজাগরণের শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭)। তৎকালীন হবিগঞ্জ মহকুমায় মিরাশী গ্রামে তাঁর জন্ম। অগ্রহায়ণে ধানের দেশে ধানের গন্ধ-ঘ্রাণে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর ভাষায় 'এই ধানই আমায় গান দিয়েছে'।

কৈশোরকালে শুনেছি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিখ্যাত 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য'-র পংক্তিমালার অংশবিশেষ গুরুস্থানীয় জনের মুখে মুখে বিক্ষিপ্তভাবে। রচয়িতা কে তা জানা ছিল না। পাকিস্তানি শাসনামলে উত্তর-পূর্বকোণের এক মফস্বল শহর সুনামগঞ্জে গুঞ্জরিত হত এই গান। দু'একটি কলি উল্লেখ করি।

মাউন্ট ব্যাটন সাহেব ও
তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে থুইয়া গেলায় ও ।
তোমার সোনার পুরী আন্ধার কইরা ও প্রভু কই চলিলায় ॥....
সর্দার কান্দে, পণ্ডিত কান্দে, কান্দে মৌলানায় (কিরে হায় হায় রে)
তোমার নয়াদিল্লী ডুবি ডুবুও, বুঝি ভঙ্গ বঙ্গ ভেসে যায় ॥

মাউন্টব্যাটন অভয় দিয়ে বলছেন:

মিথ্যা কেনে ভাবনা কর, ভয়ের কিবা আছে,
অশরীরী ছায়া আমার থাকবে কাছে কাছে ॥ (আমি যাই যাইরে)

মফস্বলের সেই বর্ষীয়ান গায়ক গাইছেন:
শোনো শোনো দেশবাসী শোনো দিয়া মন-
একদৌড়ে চল্লিশ টাকা হলো চাউলের মণ (ভালো বেশ বেশ বেশ) ॥

স্মৃতিনির্ভর থেকে এই মঙ্গলকাব্যর অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল । সুতরাং গানের কথায় ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয় । পরে সংগীত নিয়ে পঠন-পাঠনকালে জেনেছি যে, ব্যঙ্গগীতি 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য' রচনার প্রেক্ষাপট ও প্রেরণা লাভের উৎস । সিলেটের লাউতা বাহাদুরপুরের সোনা উল্লাহ নামে এক জাহাজকর্মী অসাধারণ ব্যঙ্গাত্মক বক্তৃতা করতেন । সাধারণ বক্তৃতায় যা হত না, সোনা উল্লাহর একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাষণে তা জনমানসে দাগ কাটত । সোনা উল্লাহ সাংহাই বন্দরে চীনা শ্রমিকের ধর্মঘট দেখেছিলেন । উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন এই জাহাজকর্মীর ব্যঙ্গাত্মক রূপের অসাধারণ সার্থকতা গণমানুষের শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করেছিল 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য' রচনা করতে । গানটির রচনাকাল ১৯৪৮, গানটির মূল রূপটি গ্রহণ করেছিলেন অনেক আগে শোনা একটি গ্রাম্যগীতি থেকে । গ্রামের জমিদারের মৃত্যুতে এই গ্রাম্যগীতিটি রম্যছলে রচিত, যেমন–

'বাবু গোপীচান্দ রায় / সোনারপুরী আন্ধার কইরা লুকাইলা কোথায়? পুয়ায় (ছেলে) কান্দে, পুরিয়ে (মেয়ে) কান্দে, কান্দে বাবুর মায়-/দুই তালার উপরে কান্দে রাসমনি বেশ্যায় ।'
মাটি মানুষের সুর থেকে প্রেরণা লাভ করে রচিত হল অসাধারণ এক 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্য' যা তৎকালীন সময়ে আপামর জনমানসকে প্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল ।
আরেকটি গানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না । সেই গানটি হল : 'আমরা তো ভুলি নাই শহিদ ।' ১৯৫০-৫১ সালের দিকে শিল্পী তখন আত্মগোপন

করে আছেন খাসিয়া পাহাড়ে। শিলচর জেলে এক কৃষক কমরেড মাধবনাথ শহিদ হন। এ নিয়ে গান লেখার তাগিদ এল শিল্পীর কাছে। শিল্পী তখন শয্যাশায়ী, অসুস্থ গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। এমন অবস্থায় তবু শিল্পী বিলম্বিত ভাটিয়ালির এক বিশেষ ঢঙে রচনা করলেন:

আমরা তো ভুলি নাই শহিদ, সে কথা ভুলবো না, তোমার কইলজার খুনে রাঙাইলো যে আন্ধার জেলখানা ॥

দুই

সহপাঠী লোহিত কাকোতির কাছ থেকে প্রথম দেশাত্মবোধক অসমীয়া গান শিখেছেন শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। গানটি হল:

'কিয়নো পাহরা অসমীয়া হেরা
চিরকাল তুমি আছিলা স্বাধীন
ভারতের মাঝত তোমার জননী
বীরপ্রসবিনী আছিলা এদিন।'

গানটি জৌনপুরী রাগে রচিত। সেই সময়ে গানটি রেকর্ড করেছিলেন গায়ক প্রফুলকুমার বড়ুয়া, শিলংয়ে প্রথম আই,পি,টি এ প্রতিষ্ঠার পর যিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যার সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল পরবর্তীকালেও। সংক্ষেপে শৈশব-কৈশোর যৌবনকালের কথা এখানে উল্লেখ করি ('উজান গাঙ বাইয়া' সম্পাদিত গ্রন্থসূত্রে), যদিও-বা কম-বেশি সবার জানা আছে। প্রথম জীবনে হবিগঞ্জের মিডল ইংলিশ স্কুলে পড়াশুনা। ১৯২৭-২৮ সালে আসামে ডিব্রুগড়ে স্কুলের সহপাঠী লোহিত কাকোতির কাছে প্রথম বিহু ও দেশাত্মবোধক গান শোনেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩০-৩১ সালে সিলেট মুরারী চাঁদ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৫ সালে কারাবাসে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৮-৩৯ সালে তার গানে মেহনতি মজুর কৃষকের কথা আমরা লক্ষ করি। কথা ও সুরে অগ্নিবীণা ঝংকৃত বিদ্রোহীকবি নজরুলের মতো দৃপ্ত উচ্চারণে শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখলেন:

আগে চল মজুর কিষাণ
সমর শিবিরে শোন হাঁকিছে কিষাণ।

১৯৪২ সালে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে মাসির বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন পঞ্চখণ্ডে। সেখানে লুলা নদীতে মাঝির কণ্ঠে একটি সারি গান শুনেছিলেন 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইয়োরে সাধু ভাই'। সেই সুরে শিল্পী লিখলেন : কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে।' ১৯৪৩ সালে আই.পি.টি এ প্রতিষ্ঠা এবং সিলেটে Surma Valley Cultural Squad গড়ে তোলেন। ১৯৪৭-এ সরষের তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে লেখেন হৈরর

তেল (সরষের তৈল) 'আজব দেশের আজব লীলা' গানটি। 'মাউন্টব্যাটন মঙ্গলকাব্যে'র কথা আগে বলেছি, রচনাকাল ১৯৪৮। ঐ সময়ে আসামে আইপিটি-এর সংগঠকরূপে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। মহান অক্টোবর বিপ্লবজাত শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রকে রক্ষার যুদ্ধে লাল পল্টনকে প্রাণের রসদ যুগিয়েছিল যে কয়টি গান তার মধ্যে 'ভেদী অনশন মৃত্যু' গানটি অন্যতম। শিল্পী গানটি অনুবাদ করেন ১৯৪৯ সালে। ১৯৫১ সালে কারাগারে বন্দীজীবন যাপন। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে গুলি চালানোর পরে 'ঢাকার ডাক' গানটি রচনা করেন। ১৯৫৩ সালে 'খোয়াই' ও 'চিঠির জবাব' কবিতা দু'টি লেখেন। ১৯৫৭ সালে চিকিৎসার জন্য চীন চলে যান। আড়াই বছর সেখানে থাকেন। চীন থেকে ফিরে ১৯৫৯ সালে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন রানু দত্তের (পরে বিশ্বাস) সঙ্গে। ১৯৬০-এ আসামে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সময় গণনাট্যের সংঘের শান্তি-সম্প্রীতির অভিযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শিল্পী ভূপেন হাজারিকা ও শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের যৌথ রচনা ও দ্বৈতকণ্ঠের বিখ্যাত প্রেরণাদায়ী গান 'হারাধন রঙমন কথা'র পরিবেশনায় সমগ্র আসামে দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার জাগিয়ে তোলে। ১৯৬১ সালে কাব্যগ্রন্থ 'সীমান্ত প্রহরী' প্রকাশিত হয়। এই সময়কালে কমরেড মুজফফর আহমেদের সুপারিশে সোভিয়েত কনস্যুলেটে যোগাযোগ অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬১-৬৮ সালে সংস্কৃতির সকল শাখায় শিল্পীকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখি। একদিকে নাটক, চলচ্চিত্র ও যাত্রায় সংগীত পরিচালনা অপরদিকে গীতরচনা, সুরযোজনা আর সংগঠকের দায়িত্বপালন। এরমধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য : কল্লোল, তীর, তেলেঙ্গানা, ১৭৯৯, লাল লণ্ঠন, লেনিন, পদ্মানদীর মাঝি, রাইফেল, রাহুমুক্ত রাশিয়া, মানুষের অধিকার, কাঙ্গাল হরিশ এবং নাটক ও যাত্রায় চাঁদ মনসার নৃত্যনাট্য ও লালন ফকির চলচ্চিত্র। ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' ছবিতে ভাটিয়ালি গান গেয়েছেন শিল্পী। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের উদ্যোগে কলকাতায় নবন্যাসযুগের প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয়।

১৯৬৪ সালে পারমানবিক যুদ্ধের প্রতিবাদে রচনা করেন "শঙ্খচিল" গানটি। ১৯৬৬'র খাদ্য আন্দোলন তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন 'গুলিবিদ্ধ গান যে আমার' গানটি। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির একতার প্রেক্ষাপটে 'তীর' নাটকে তাঁর সংগীত পরিচালনার জন্য সিপিএমের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং মোহমুক্তি ঘটে।

সচেতন শিল্পী ১৯৬৯ সালে নকশালপন্থী আন্দোলনের প্রতি সমর্থনদান করলেন। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হল অসমীয়া কাব্যগ্রন্থ "কুলখুরার চোতাল" এবং সংগঠক হেমাঙ্গ বিশ্বাস ১৯৭১ সালে গঠন করলেন "মাস সিঙ্গার্স"।

১৯৭৪ সালে কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটির প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয়বার চীন ভ্রমণ করেন এবং সোভিয়েত কনস্যুলেট কার্যালয়ের চাকরি ত্যাগ করেন। "শঙ্খচিলের গান" প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। এই সময়ে 'আবার চীন দেখে এলাম' বইটি প্রকাশ পায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংগীতের ওপর কয়েকটি বক্তৃতাদান করেন। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় লোকসঙ্গীত সমীক্ষা; বাংলা ও আসাম। চীন সরকারের আমন্ত্রণে তৃতীয়বারের মতো সস্ত্রীক ভ্রমণ করে আসেন ১৯৭৯ সালে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় "হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান"।

১৯৭৬ সালে মাও সে তুং-এর মহাপ্রয়াণে "আরো বসন্ত বহু বসন্ত" গানটি রচনা করেন। ১৯৮৩ সালে শিল্পী সদলবলে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সফরে আসেন। বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন ঢাকা ও সিলেটে। সমগ্র বাংলাদেশ যেন মেতে উঠেছিল তাঁর গীতমূর্চ্ছনায়। জার্নাল এম্পোরিয়াস নলবাড়ি অসম হয়ে অসমীয়া কাব্যগ্রন্থে 'কুল খরার চোতাল' দ্বিতীয় প্রকাশ পায় ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৬ সালে আজিজুল হকসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য সরব ছিলেন। Hope-এর বিরোধিতা করেন। আরোয়ালে কৃষকহত্যার প্রতিবাদে স্বাক্ষর দান করেন। অনুষ্টুপ-এ তিন কিস্তি প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী "উজান গাঙ বাইয়া"। এই সময়ে গণনাট্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হায়দ্রাবাদে জাতীয় কনভেনশনে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম উপ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালের ২২ নভেম্বর কলকাতার এস, এস, কে, এম হাসপাতালে এই অক্লান্ত গণমানুষের শিল্পী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংক্ষেপে এই কর্মবীর, মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অসম্পূর্ণ কর্ম ও সাধনার ধারা এককথায় বলা যায় এটি "অসম্পূর্ণ অন্বেষণ"।

তিন

সংগীত নিয়ে অধ্যয়নকালে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি নিবন্ধ "শ্রীহট্টের লোকসংগীতের সুর বিচার ও বিশ্লেষণ" পাঠ করে বিস্মিত হয়েছি। বৃহত্তর সিলেটের লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য কোথায় তা পুঙ্খানুভাবে উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন। কিভাবে লোকসংগীত থেকে রাগসংগীতে আবার কেমন করেই-বা গায়নরীতির ধারায় লোকসংগীত রাগসংগীতে উত্তীর্ণ হয় কিংবা রাগসংগীত কিভাবে লোকসংগীতকে প্রভাবিত করেছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তার সুনিপুণ পরিচয় বিধৃত আছে এই প্রবন্ধে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানতে চেয়েছিলেন, লোকসংগীত আর রাগসংগীতের মধ্যে তফাতটা কোথায়? উত্তরে খাঁ সাহেব বলেছিলেন, গায়কীতে এবং গেয়ে শোনালেন শৈশবে শোনা একটি লোকগীতি "পাখি কইয়ো বন্ধুয়ার নাগাল পাইলে'। তিতাস নদী-পারের এই গানটি পরে পিলু রাগে বাজিয়ে শোনালেন সরোদ বাজিয়ে। নতুন দিক উন্মোচিত হল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস উৎসাহভরে তাই লিখলেন কিভাবে

কেমন করে আদিবাসীদের নামানুসারে রাগ-রাগিণীর সর্বভারতীয়রূপ কিভাবে গড়ে উঠল মাটি-মানুষের অকৃত্রিম হৃদয় থেকে। আরেকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'লোকসংগীত বাঙলা ও আসাম' গ্রন্থে বাংলাভাষী তো বটেই বৃহত্তর সিলেটের সঙ্গে আসামের যে নিবিড় যোগ কেবল ভৌগোলিক দিক দিয়ে নয়, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে এর পরিচয় মেলে তথ্য ও যুক্তির আলোকে লেখা বইটিতে। বৃহত্তর সিলেটের লোকসংগীত নিয়ে এমন গভীর ও অকপট আলোচনা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের আগে কেউ বিশ্লেষণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

চার

হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মরণ উপলক্ষে এই লেখা। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে ভারতীয় বৃত্তি লাভ করে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতভবনে ভর্তি হই। এই প্রথমবারের মতো শান্তিনিকেতন যাত্রা। সেজন্য অভিভাবক বিশেষ করে বাবা-মা উৎকণ্ঠায়। যাবার আগে বললেন, কলকাতা ও শান্তি নিকেতনে রয়েছেন শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী। যেহেতু কোনো আত্মীয়-পরিজন নেই পরিচিত, সে কারণে সময় সুযোগ পেলে যেনো তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এক বছর পর ১৯৭৭ সালে বিশ্বভারতী, সংগীতভবন থেকে আমাকে লোকগীতিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য নির্বাচন করা হল। কলকাতায় সর্বভারতীয় যুব উৎসব (YUV `77) সেন্টপল ক্যাথিড্রল চার্চের সামনের ময়দানে মুক্ত মঞ্চে সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। লোকগীতি বিষয়ে তিনজনের মধ্যে প্রধান বিচারক ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। বিকেল ৫.০০টায় শুরু হল সংগীত প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার আগে নিয়মাবলি ও লোকগীতি পরিবেশনকালে কী কী যন্ত্র ব্যবহার করা যাবে সে সম্পর্কে বললেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। হারমোনিয়াম এবং তবলা সঙ্গত করা যাবে না এবং যে অঞ্চলের গান সেই আঞ্চলিক উচ্চারণে গান গাইতে হবে। আমি প্রতিযোগিতার জন্য যে গানটি নির্বাচন করেছিলাম ও তবলা সঙ্গতকার নিয়ে গিয়েছিলাম নিয়মানুযায়ী তা হয় না। সে কারণে তাৎক্ষণিকভাবে একটি বন্ধু বিচ্ছেদী ভাটিয়ালি গান বৈতালিকে গাইব ঠিক করলাম। হারমোনিয়ামে শুধু স্কেল ধরে (সা, পা) গাইলাম বিচ্ছেদী গান:

সুজন বন্ধু রে .....
ও বন্ধু কোন বা দেশে থাকো
অভাগীরে কান্দাইয়া কন্যার এমন রাখো
সুজন বন্ধুয়ারে।

গানটি শেষ হলে পর আরও কয়েকজন যথারীতি নিয়মানুসারে গান করলেন। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষায় আছি কখন ফল ঘোষণা করা হবে! প্রতিযোগিতা শেষে শিল্পী হেমাঙ্গ

বিশ্বাস অন্যান্য বিচারকমণ্ডলীর সঙ্গে মঞ্চে উঠে লোকসংগীত সম্পর্কে কিছু বললেন এবং ফলাফল ঘোষণা করলেন। লোকগীতিতে প্রথম স্থান অর্জন করলাম আমি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মঞ্চের দিকে যেতে চাইলাম। কিন্তু উদ্যোক্তারা যেতে বারণ করলেন। কিছুক্ষণ পর শুনি অনুষ্ঠানস্থল থেকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস চলে গেছেন। আমি দু'তিনজন উদ্যোক্তার কাছ থেকে টেলিফোন ও ঠিকানা জানার চেষ্টা করি। এই ছিল আমার শিল্পীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষাৎ। কয়েকমাস পর কলকাতায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসফরে এসে ঠিকানা নিয়ে নাকতলার বাড়িতে (সম্ভবত ভাড়া বাড়ি) দেখা করতে যাই। গানের মহড়া চলছে বাড়িতে। পরিচয় দিলাম। শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রসংগীত শিখতে এসেছি শুনে যেমন আনন্দিত হলেন তেমনি আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন এবং সতর্ক করে দিলেন যেন উচ্চারণ সঠিকভাবে করি রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে। স্বল্পবাক মানুষ এবং আপোষহীন এক সংগীত অভিযাত্রী। অকৃত্রিম হৃদয়ের লোকগান বিকৃতভাবে উপস্থাপন কোনো মতেই মানতেন না এবং কখনো মেনেও নেননি।

পাঁচ

মেহনতি মানুষের জন্য মন তাঁর অবারিত, উৎসারিত হৃদয় উন্মুখ মাটির সোঁদা গন্ধের অনুরাগে, মন কেঁদে বেড়ায় শুধুই মাটি-মানুষের পরশ লাভে, তাই গান জেগে উঠে, অস্ফুট হাহাকার ঝরে সুরের মায়াজালে:

আমার মন কান্দে রে পদ্মার চরের লাইগা দরদী রে
মন কান্দে পদ্মার পারের লাইগা।

.....
আইজ কোলে আমার লক্ষ্মীন্দর
বিষে অঙ্গ জর জর
আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া..... ।।

সিলেট আসাম চারণ করে শেষ জীবনে কলকাতাবাসী হলেন শিল্পী।

সেই সময়ে লেখা একটি গান যা বাংলাভাষী, বাঙালির কাছে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে বর্তমান প্রজন্মের কাছেও সমাদৃত এবং জনপ্রিয় হয়েছে সেটি হল :

"হবিগঞ্জের জালালী কইতর সুনামগঞ্জের কুড়া
সুরমা নদীর গাঙচিল আমি শূন্যে দিলাম উড়া
শূন্যে দিলাম উড়ারে ভাই যাইতে চান্দের চর
ডানা ভাইঙ্গা পড়লাম আমি কইলকাত্তার উপর ।।
তোমরা আমায় চিনো নি ..... ।।"

সমগ্র জীবন প্রতিবাদ প্রতিরোধে, মিছিল মিটিংয়ে, সক্রিয় সংগ্রামে, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে, মানুষের সাম্যতার, সমবণ্টনের নীতিতে আস্থাবান শিল্পীর কাছে গানই হয়েছিল হাতিয়ার। প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার লেখনী যেমন ঝরেছে, তেমনি অকৃত্রিম হৃদয়ের সুরের সঙ্গে সুদূর সমুদ্দুরের গর্জন আর ঢেউয়ের এক অপূর্ব কলতান মিলেমিশে আছে তাঁর সৃষ্ট কথা ও সুরে। শিল্পীর মনে প্রশ্ন ছিল, গানে তার প্রতিধ্বনি শুনি, তোমরা আমায় চিন নি?

গণসংগীতের এই গাঙচিলকে আমরা চিনেছি বা জেনেছি কতটুকু?

এই লেখার ভিতর দিয়ে মহান শিল্পীর প্রতি আমার বিনম্র অভিবাদন।

তথ্যসূত্র

১. উজান গাঙ বাইয়া–হেমাঙ্গ বিশ্বাস (মৈনাক বিশ্বাস সম্পাদিত)।
২. লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম – হেমাঙ্গ বিশ্বাস ।
৩. শ্রীহট্টের লোকসংগীত - গুরুসদয় দত্ত ও নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত। পরিশিষ্ট : শ্রীহট্টের
৪. লোকসংগীতের সুর বিচার – হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

মফিদুল হক

.....

একান্ত কথন চতুষ্টয়/ মাহমুদ দারবিশ

এক বর্গমিটার কারাকক্ষ

এই হচ্ছে দুয়ার আর দুয়ারের ওপাশে হৃদয়নন্দনপুর। আমাদের বস্তুনিচয়– এবং সকল কিছুই তো আমাদের– আমরা পাল্টে নিতে পারি। আর দুয়ার তো দুয়ার বটে, দ্ব্যর্থকতার দ্বার, কল্পকাহিনীর প্রবেশপথ। যে দুয়ার আশ্বিনকে করে মৃদুমন্দ, চষা ক্ষেতে বয়ে আনে ফসলের উদ্‌গম। যে দুয়ারে নেই আর কোনো দ্বার, তবু তো আমি দুয়ার পেরিয়ে যেতে পারি আপনকার বাহিরে, এবং ভালোবাসায় বরণ করি উভয়ত, যা কিছু দৃশ্যের গোচর, যা কিছু দৃশ্যের বাহির। এই সমুদয় বিস্ময় ও সৌন্দর্য তো নিহিত বিশ্বভুবনে– সেখানে– তবুও তো দুয়ারে নেই আর কোনো দ্বার! কোনো আলো পৌঁছয় না আমার কারাকক্ষে, পৌঁছয় কেবল অন্তরপ্রকোষ্ঠে। আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। শান্তি বর্ষিত হউক যা কিছু রোধ করে আছে শব্দের প্রবাহ। আমার স্বাধীনতার বন্দনা করে আমি লিখেছি দশটি কবিতা, এখানে ওখানে। আমি ভালোবাসি ঘুলঘুলি দিয়ে গলিয়ে আসা আকাশের কণা– সামান্য এক ছটা আলো যেখানে সন্তরণ করে অশ্ব। আমি ভালোবাসি মায়ের তুচ্ছতি সকল কিছু, তার কাপড়ে লেপ্টে থাকা কফির ঘ্রাণ আমি পাই সাতসকালে যখন তিনি খুলে দেন মুরগির খাঁচার দ্বার। হেমন্ত ও শীতের মধ্যবর্তী ফসলের খেত আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি কারারক্ষীর সন্ততিদের, দূরের ফুটপাতে বিছিয়ে রাখা সাময়িকপত্রের সারি। আমি বিদ্রূপবহ বিশটি কবিতা লিখেছি সেই স্থান নিয়ে যেখানে আমাদের কোনো স্থান নেই। আমার স্বাধীনতা তো তেমনটি নয় যা তাদের কাম্য, আমার স্বাধীনতা হচ্ছে কারাকক্ষ প্রশস্ততর করে তোলা, দুয়ারের বন্দনা গান গেয়ে চলা। দুয়ার তো দুয়ার মাত্র, তবুও তো দুয়ার দিয়ে আমি যেতে পারি নিজের ভেতরে, বাইরে, করতে পারি ভেতরবাহির।

দুই

ট্রেনে একটি আসন

এই উড়ুনি আমাদের নয়। বিদায়মুহূর্তের প্রেমিকযুগল। স্টেশনের হলুদ আলো। সেইসব গোলাপ যা প্রেম-প্রত্যাশী হৃদয়কে করে প্রবঞ্চিত, প্ল্যাটফর্মে ঝরে পড়ে বিশ্বাসখোয়ানো অশ্রু। এই পুরাণকথা আমাদের নয়। যাত্রা করেছে ওরা এখান থেকে। আমাদের কি এমন কোনো নিশ্চিত গন্তব্য রয়েছে, যেখানে পৌঁছে আমরা পেতে পারি যাত্রাশেষের আনন্দ? টিউলিপগুচ্ছ– আমাদের জন্য নয়। তাহলে রেলকে আমরা কেন ভালোবাসব? আমরা পথ চলছি এক শূন্যতার খোঁজে, তবে আমরা ট্রেনকে কেন ভালোবাসব, যখন নতুন স্টেশন অর্থ নির্বাসনের নতুন এক ঠাঁই। ধোঁয়াচ্ছন্নতায় অপেক্ষমান আমাদের প্রেম অবলোকনের জন্য যে লণ্ঠন তা আমাদের নয়। সরোবর পাড়ি দিয়ে যায় দ্রুতগামী ট্রেন। প্রতিটি যাত্রীর পকেটে গৃহপ্রবেশের চাবি, পরিবারের সমবেত ছবি। সব যাত্রী পৌঁছে যায় নিজ নিজ পরিবারে, আমাদের নেই ফেরবার মতো কোনো ঘর। আমরা চলছি এক শূন্যতার সন্ধানে, চলিষ্ণুতার মধ্যে যেন পেতে পারি প্রজাপতির চিরচঞ্চল শুদ্ধতা।

আমাদের নেই কোনো গবাক্ষ, যেখান থেকে বিনিময় করা যায় নানা ভাষার সম্ভাষণ। যখন আমরা অতীত দিনের ঘোড়সওয়ারি হয়েছিলাম তখন কি ভুবন ছিল অধিকতর স্বচ্ছতোয়া? কোথায় গেল সেই অশ্বদল? কোথায় আজ আমাদের গানের সেইসব অপ্সরার দল? আমাদের ভেতরকার নিসর্গগান আজ কত দূর? আপন দূরত্ব থেকেও বহু দূরবর্তী আজ আমি। তাহলে আমার প্রেম আছে আরো কত দূরে? প্রগল্‌ভ তরুণীরা দস্যুর মতো আমাদের হরণ করে। ট্রেনের জানালায় লিখে রাখা ঠিকানা আমরা বিস্মৃত হই। আমরা, দশ মিনিটের ভালোবাসায় মাতোয়ারা, পারি না এক গৃহে পুনরায় প্রবেশ করতে পারি না জাগিয়ে তুলতে পুনর্বার একই প্রতিধ্বনি।

তিন

নিবিড় পরিচর্যা কক্ষ

যখন পৃথিবী আমাকে চেপে ধরে, বাতাস পাক খায় আমাকে ঘিরে, হাওয়াকে বাগে আনতে আমার দিতে হয় উড়াল, তখন বুঝি আমি তো কোনো পাখি নই, মনুষ্যমাত্র। আমার অন্তর চুরমার হয়ে যায় কত না বাঁশির বাদনে। আমার স্বেদ তুষারকণার মতো ঝরে পড়ে, হাতের তালুতে ফুটে ওঠে আপন সমাধিচিত্র। ধীরে ধীরে আমি দোলায়িত হই শয্যায়, আমি লাফিয়ে উঠি, হারিয়ে ফেলি চেতন কিয়ৎক্ষণের জন্য, তারপর ঢলে পড়ি মৃত্যুর কোলে। দোলায়মান সেই মৃত্যুর দ্বারে আমি চেঁচিয়ে উঠি, ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমাকে, তোমার পায়ে পায়ে আমি কি পৌঁছে যেতে পারি মরণে? এবং আমার মৃত্যু হয়, আমি একেবারে মরতে বসি। তোমার বিলাপধ্বনিহীন মৃত্যু কী শান্ত ও নিস্তব্ধ!

শ্বাস ফিরিয়ে আনতে আমার বুকে বারবার চাপ দিয়ে চলা তোমার ও-দুটি হাতবিহীন মৃত্যু কী শান্ত ও নিরুদ্বেগ! মরণের আগে ও পরে আমি তোমাকে ভালোবেসে যাই এবং এই দোলাচলের মধ্যে দেখি কেবল আমার মায়ের মুখ ।

কিয়ৎকালের জন্য বন্ধনমুক্ত আমার হৃদয় ফিরে এসেছে আবার স্বস্থানে । প্রেমাস্পদের কাছে জানতে চাই, কোন্ হৃদয়ে আমি বাঁধা পড়েছিলাম? আমার বুকের ওপর ঝুঁকে সজল চোখে জবাব দেয় প্রেমিকা, হে আমার হৃদয়, কেন তুমি অসত্যোচ্চারণে দ্বিধা থরথর করো আমাকে । এখনও কিছু সময় আমাদের হাতে আছে, তাই আঁকড়ে থাকো আমাকে যতক্ষণ-না শেবার রানীর রাজ্য থেকে আসে তোমার ডাক ।

আমরা পত্র বিনিময় করি । আমরা পাড়ি দিই তিরিশ সমুদ্র ও ষাটটি তীর, তারপরও ফুরোয় না আমাদের চলা ।

হে আমার হৃদয়, হাওয়ার প্রেমে মাতোয়ারা যে অশ্ব কে তাকে বোকা বানাবে । যতক্ষণ পর্যন্ত-না শেষ এই আলিঙ্গন সমাপ্ত করে আমরা প্রার্থনায় আনত হই পৃথিবীর কাছে ততক্ষণ থাকো কাছাকাছি ।

থাকো কাছাকাছি যেন আমি বুঝতে পারি তুমি কি আসলে আমার হৃদয়, অথবা তুমি কি সেই স্বর যখন সে বলে ওঠে, গ্রহণ করো আমাকে ।

চার

হোটেলের একটি ঘর

শান্তি বর্ষিত হোক ভালোবাসার ওপর যখন উদয় হয় প্রেমের, ঘটে তার বিনাশ এবং প্রেমিক বদল হয় হোটেলে হোটেলে । এর ফলে কি হারাবার আছে কিছু? বাগানে বসে আমরা চুমুক দেব সান্ধ্যকফির পেয়ালায় । রাতে আমরা বলব নির্বাসনের গল্প । এরপর আমরা যাব হোটেলের ঘরে – নিবিড় প্রেমময় একটি রাত্রির সন্ধানে দুই আগন্তুক, আর তারপর, তারপর ।

আমাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকবে খুচরো কিছু কথা, আমরা ভুলে যাব সিগারেটের প্যাকেট, যেন অন্যরা এসে এমনিভাবে কাটাতে পারে সন্ধ্যা, করতে পারে ধূমপান । আমরা বালিশের উপর রেখে যাব আমাদের কিছু বেভুল ঘুম, যেন আসতে পারে অন্যরা, বিশ্রাম নিতে পারে আমাদের নিদ্রায়, আর তারপর, তারপর । কীভাবে আমরা এইসব হোটেলে যাপিত শরীরের ওপর অর্পণ করেছিলাম আস্থা? কীভাবে আমরা এইসব হোটেলে নিজস্ব গোপনীয়তা বিষয়ে নিরুদ্বেগ হয়েছিলাম?

নিবিড় আঁধারে শরীর গেঁথে নেয় শরীর, যেন অন্যরা অব্যাহত রাখতে পারে আমাদের কান্না, আর তারপর, তারপর। যে-বিছানা ছিল সকলের জন্য, সার্বজনীন সেই শয্যায় শুয়েছিলাম কেবল আমরা দু'জন। আমরা বলেছিলাম সেইসব কথা যা কিছুক্ষণ আগে উচ্চারণ করে গেছে স্বল্পকালের যুগলেরা। বিদায়বেলা এগিয়ে আসে দ্রুতই। এই চটজলদি মিলন কি কেবল ভুলে যেতে অন্যদের যারা আমাদের ভালোবেসেছিল অন্যসব হোটেলে? এসব অসংলগ্ন কথা কি তুমি আর কাউকে বলোনি? আরেক হোটেলে আরেক জনকে আমি কি আগে বলিনি এইসব কথা, অথবা বলিনি কি একই বিছানায় এমনিভাবে শায়িত? আমরা অনুসরণ করে যাব একই পদাঙ্ক, যেন আসতে পারে অন্যরা, অনুসরণ করতে পারে একই পায়ের ছাপ, আর তারপর, তারপর।

দর্শন / প্রবন্ধ

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

.....

লোকায়ত দর্শন: মুক্ত ভাবনার গোড়ার কথা

কয়েক হাজার বছর ধরে ভারতীয় অনুভূতির মৌলিক সূত্রানুধাবন করে এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, প্রাকৃতজন তথা সাধারণ মানুষদের জগৎ-জীবন সংক্রান্ত একান্ত ভাবনাগুলোর অন্যতম বিষয়বস্তু হল লোকায়ত বোধ তথা বস্তুবাদী চিন্তা। এই লোকায়ত চিন্তা আবর্তিত হয়েছে এই মর্তলোকেরই নানা প্রাপঞ্চিক বিষয়াদিকে ঘিরে। এ কথা অস্বীকারের জো নেই, আজকের দিনে আমরা যে মুক্ত, উদার, নৈর্ব্যক্তিক, নির্বারিত ও প্রগতিশীল ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলার অনুশীলন করে চলেছি তার শেকড়টা কিন্তু গ্রথিত ঐ প্রাচীন লোকায়ত চিন্তার মাঝে। এই লোকায়ত চিন্তা কোনো দেবলোকের পরমসত্তাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি; এজন্য এটা কোনো ইন্দ্রপুরীর রহস্য-ঘেরা কল্প-কথন নয় বরং তা প্রকটিত হয়েছে এই মর্তেরই চিরচেনা বস্তুসকলকে আবর্তন করে। আমাদের পরিচিত এই দৃশ্যমান

বাস্তবতায় ধরা পড়া বিষয়াদিই এই পুরোগামী চিন্তার প্রাণ। যদিও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মনীষীদের অনেকেই ভারতীয় ভাবনাকে নিছক আধ্যাত্মিকতার আকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তবু নির্লেপ অনুসন্ধানে এ অভিযোগের বিশেষ কোনো সত্যতা মেলেনি। অনেক গবেষক বলেছেন–'The materialist school of thought in India was as vigorous and comprehensive as materialistic philosophy in the modern world. Spiritualism was dominant in the thought of India but there were people in ancient India who hold views against the existing belief and observances. অতি প্রাচীনকাল থেকেই আধ্যাত্মচিন্তার পাশাপাশি বস্তুবাদী চিন্তাও ভারতীয় মানসকে সমানভাবে পরিপ্লুত করেছে। বলা যায় সমকালে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধারার বেশিরভাগ উপাদানই ভারতীয় বস্তুবাদের মাঝে লুকিয়ে আছে।

আজকের আমরা যে আউল-বাউল-কর্তাভজা, মরমিয়া, সুফি, নাথ, বৈষ্ণব, সহজিয়া, বামাচার, বলাহাড়ি, সাহেবধনী, কাপালিক, মহাযানী মত-মতবাদের সাথে পরিচিত, কালিক বিবর্তনে সেটার অনেক দিক আধ্যাত্মবাদের সাথে বিচূর্ণিত হলেও, মূলগতভাবে তা যে ঐ বস্তুবাদী ভাবনারই উপজাত তা বোধকরি অনেকেরই জানা। লোকায়ত দর্শন এই মর্তবাসী গা-ঘামানো খেটে খাওয়া মানুষদের জগৎ-সংক্রান্ত ঐহিক চিন্তা। জীবন সম্পর্কে নির্দ্ধিত অভিমত তথা নিবিড় উপলব্ধি। শুধু তাই নয় এটা পরিণত হয়েছে আমাদের সমস্ত প্রগতিশীল, উদার ও সংস্কারবিহীন বিজ্ঞানভাবনার একান্ত ভিত্তিভূমিও। বহুযুগের ওপার থেকে চলে আসা এই স্বাধীন ও ঐহিক চিন্তার শেকড়ানুসন্ধানই হবে এই প্রবন্ধের মূল কাজ। এছাড়াও আমরা দেখব পাশ্চাত্যের সমকালীন বস্তুভাবনা থেকে আমাদের পৌরাণিক এই জীবন-ঘনিষ্ঠ উপলব্ধি কোনো অংশেই অপ্রাচুর্যময় ছিল না।

দুই

লোকায়ত শব্দটির আছে নানামুখী দ্যোতনা। কেউ বলেছেন, 'লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ'। অর্থাৎ যা সাধারণ মানুষের মাঝে পরিব্যাপ্ত তাই লোকায়ত। আবার কেউ বলেছেন, আমাদের এই প্রাত্যক্ষিক জগতের নামই লোক। যতটুকু আমরা দেখতে পারি সেটুকুই লোকের পরিব্যাপ্তি। দার্শনিক এম. হিরিয়ানাও (M. Hiriyanna) বলেছেন, লোকায়ত শব্দের অর্থ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমিত জগৎচিন্তা (restricted to the world of common experience)। ধারণা দুটিকে এক করলে লোকায়ত চিন্তার অর্থ দাঁড়ায়– অতি সাধারণ মানুষদের জগৎ, জীবন ও প্রকৃতি-সংক্রান্ত বস্তুবাদী চেতনা। এটা পুরোপুরি ইহলোক সংক্রান্ত ভাবনা। যারা পরলোকের ধার ধারে না, ধর্মে-কর্মে খুব বেশি মতি নেই, মোক্ষ নির্বাণের জন্য উদ্গ্রীব হয় না তারাই লোকায়তিক। যুক্তিমদ্ বচনং গ্রাহ্যং– অর্থাৎ যুক্তিই লোকায়ত চিন্তার প্রাণ। Rhys Davids বলেছেন, সাধারণ লোকের মাঝে প্রচলিত নানা বিষয় অবলম্বনে রূপায়িত

শাস্ত্রের নাম লোকায়ত। তবে তিনি বিশেষ এই শাস্ত্রটিকে ব্রাহ্মণ্যবিদ্যারই অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লোকায়ত বিদ্যাকে তর্ক বা বিতণ্ডা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এটি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার বিরুদ্ধে একটা বিপ্লবী চিন্তা। লোকায়তিক আর প্রাকৃতজনের মাঝে বড় কোনো বিভেদ নেই। অনেক আগে ভারতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্য এই দুই ধরনের সম্প্রদায়কে অভিন্ন সূত্রে মূল্যায়ন করেছিলেন। শারীরিক ভাষ্যে তিনি বলেছেন, 'দেহমাত্রং চৈতন্য বিশিষ্টামাত্মেতি প্রাকৃতাজনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ।' অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা এই লৌকিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের দ্বারাই অসংস্কৃত প্রাকৃতজনই লোকায়তিক নামে পরিচিত। কখনও কখনও এটা স্বভাববাদ, যদৃচ্ছবাদ কিংবা ভূতবাদ নামেও সাধারণের কাছে পরিচিত।

লোকায়তিকদের নাম দেয়া হয়েছে দৃষ্টিবাদী। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী (Logical positivist)-দের মূল বক্তব্যের সাথে এঁদের কোনো তফাৎ নেই। তাঁরা যেমনি বলেছেন, 'the meaning of a proposition is a method of its verification.' অন্যদিকে লোকায়তিকরা বলেছেন, ' প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম'। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বাইরে কোনো ধরনের অনুমানকে জ্ঞানের চৌহদ্দিতে আনা সম্ভব নয়। কেননা অনুমান ভ্রান্তি ঘটায়, মানুষকে প্রতারিত করে। এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষবাদীদের সাথে লোকায়তিকদের আশ্চর্য একটা মিল হল, প্রত্যক্ষবাদীরা যেমনি তীব্র সমালোচনার মুখে তাদের প্রত্যক্ষনীতি থেকে কিঞ্চিৎ সরে এসেছিলেন, ঠিক একই রকমভাবে পরবর্তীকালের লোকায়তিক যেমন, ধীষণ, পুরন্দর প্রমুখ দার্শনিকেরা তাদের তীব্র অভিজ্ঞতা-বিষয়ক অবস্থানকে সংশোধন করেছিলেন। অর্থাৎ সংশোধিত নীতি অনুযায়ী তারা বাস্তবজগতের অনেক কিছুর বাস্তবতা মেনে নিয়ে অনুমানমূলক জ্ঞানকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। যাই হোক, ইংরেজিতে আমরা যাকে মেটিরিয়ালিজম বলি লোকায়ত চিন্তা তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। তবে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ থেকে আমাদের এই চিন্তা অনেকটা সরল হলেও বেশ পুরনো। পাশ্চাত্যের মতো আমাদের এই চিন্তার নিচ্ছিদ্র সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকলেও এটা যে পৃথিবীর অতি প্রাচীনতম প্রগতিশীল ও শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধী মানবিক ভাবনা তা বোধকরি অনেকেরই জানা। অধ্যাপক যতীন সরকার এ ধরনের বস্তুবাদী চিন্তাকে নাম দিয়েছেন সরল বস্তুবাদ (naive materialism)। তবে এটাতে বস্তুবাদের অনেকটা সরলরূপ পরিগৃহীত হলেও, বস্তুবাদের মর্মার্থটা কিন্তু এর অতিরিক্ত কিছু নয়। সে কারণে এটাকে বলা যায় মৌলিক বস্তুবাদ (radical materialism)। বস্তুত দর্শনে যে বস্তুবাদ নিয়ে আলোচনা করি লোকায়ত চিন্তার মধ্যে সেই ভাবনার সাথে যোগ হয়েছে আরো বেশ কয়েকটা উপাদান। বিশেষ করে মানুষের চিন্তার ইতিহাসে যেসব সমাজ মনস্তাত্ত্বিক চলকগুলো কাজ করে সেগুলোর ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় লোকায়ত দর্শনে। এজন্য লোকায়ত দর্শন শুধুমাত্র দর্শন-তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

থাকেনি; এর ব্যাপ্তি প্রসারিত হয়েছে মানুষের বেড়ে ওঠা সমাজবাস্তবতাকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে। পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই চিন্তা-চেতনাকে স্রেফ বস্তুবাদী আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এটা প্রমাণের জন্য বেশি একটা ঘোরালো যুক্তিতে যাওয়ার দরকার নেই। মানুষের প্রত্যক্ষে যতটুকু ধরা পড়ে লোকায়তিকরা সেটুকুকেই সত্যি বলে স্বীকার করে। তারই নাম লোক। আর যা লোক তাই সত্য।

লোকায়ত চিন্তা জগদ্বিষয়ক যৌক্তিক মানুষদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক অনুভূতি। সব ধরনের শাস্ত্রমুক্ত, স্বাধীন ও সংস্কারবিহীন প্রাচীনতম আধুনিক অনুসন্ধিৎসা হল এই চিন্তা। বিকৃত, অন্ধ ও বিধ্বংসী চিন্তার বিরুদ্ধে এ এক তুমুল বিদ্রোহ। লোকায়ত চিন্তার যে তত্ত্ববিদ্যক দিক আছে তা থেকে বোঝা যায়, বস্তুই এখানে আসল। বস্তু থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি আবার বস্তুতেই তার পরিণতি। এর পেছনে অন্য কোনো শক্তি বা সত্তার হাত নেই। পরলোক, পরপার, স্বর্গ, নরক, আত্মা এসব নিছক কল্পনা মাত্র। দেহ ও আত্মার মাঝে অহেতুক এক ভেদরেখা টানা হয়েছে। আত্মা মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ডের সমন্বিত ফলাফল। অজড়, অনিত্য, শাশ্বত আত্মা বলতে আমরা যাকে চিন্তা করি তা সর্বৈব কল্পনানির্ভর অনুমান মাত্র। সমকালীন বাউলের মুখে এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় এভাবে– 'বস্তুকেই আত্মা বলা যায়/ আত্মা কোনো আলৌকিক বস্তু নয়।/ বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে/ আত্মার বিকাশ হয়ে।/ জীবন রূপেতে সে জীবেতে রয়।/ অসীম শক্তি তার/ যে তাহার করে সমাচার/ সাধিয়া ভবের কারবার বস্তুতে যার লয়।'

নিছক অন্ধ-বস্তু কীভাবে সূক্ষ্ম চেতনার জন্ম দিতে পারে তার ব্যাখ্যাও আমরা পাই তাঁদের কাছে। তাঁরা বলেন জগতটা চতুর্ভূতের সমাহার। মাটি, বাতাস, জল এবং আগুন– এই মৌলিক চারটি বস্তুর সমন্বয়ে আমাদের এই বস্তুজগৎ গড়ে উঠেছে। যে কোনো বস্তুকে তা-সে জীবিতই হোক কিংবা মৃতই হোক, এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হতেই হবে। এই দর্শনের আদিগুরু বৃহস্পতির বিখ্যাত উক্তিটি হল– 'বস্তুই জগতের সব প্রাণের আধার' (out of mater came forth life)। চেতনা দেহেরই গুণ। সুতরাং দেহ ও চেতনা মৌলিকভাবে আলাদা কিছু নয়। দেহের বিনাশের সংগে সংগে তার চেতনারও অবলুপ্তি ঘটে। তাই আত্মা, জন্মান্তর, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি শব্দগুলো কষ্টকল্পিত ভাবনা বৈ কিছু নয়। 'প্রমাণেষু প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠং' অর্থাৎ প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ ব্যতিরেকে সবকিছুই অগ্রহণযোগ্য। অনুমান আমাদেরকে ভ্রান্তি ঘটায়। রজ্জুকে অনেক সময় সাপ বলে মনে হয়; দূরে ধোঁয়া দেখে আগুন অনুমান করলেও তা অনেক সময় ভুল হয়। লোকায়ত চিন্তার মূল বক্তব্যটা সম্ভবত একটা শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে–

'ণ স্বর্গো নাপ বর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।'

লোকায়ত চিন্তা বৈদান্তিকতার তীব্র আবেশনের বিরুদ্ধে রীতিমতো এক বিদ্রোহ। বলা যায় বহু যুগ ধরে ভারতীয় চিন্তা প্রাধিকারাবিষ্ট মানুষকে যে শুধুমাত্র শাস্ত্রাভিমুখী করেছে, তার বিরুদ্ধে এই উপলব্ধি একটা চ্যালেঞ্জ। এটা একটা সমাজবাদী ভাবনাও বটে। সব মানুষকে বর্ণ-গোত্র-জাত-পাত নির্বিশেষে এক ভাবাও যেন লোকায়ত চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক লোকায়তিক লালনের মুখে এই সাম্যের বাণী উচ্চারিত হয়েছে বলিষ্ঠরূপে–

'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে/ যেদিন হিন্দু-মুসলমান/ বৌদ্ধ খ্রিস্টান/ জাতি গোত্র নাহি রবে ॥/ শোনায়ে লোভের বুলি/ নেবে না কাঁধের ঝুলি/ ইতর আতরাফ বলি/ দূরে ঠেলে না দেবে/ আমির ফকির হয়ে এক ঠাঁই/ সবার পাওনা খাবে সবাই/ আশরাফ বলিয়া রেহাই/ ভবে কেউ নাহি পাবে।'

তবে ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে লোকায়তিকদের এই প্রগতিশীল অভিগমনটা কিন্তু মোটেও স্বস্তিদায়ক ছিল না। তাদেরকে নাস্তিক, বিতণ্ডা, আনীক্ষিকী, হৈতুক প্রভৃতি নামে গালিগালাজ করা হয়েছে। মনু সংহিতায় বলেছে– 'পাষণ্ডি বিকর্মস্থান বৈডাল ব্রতিকান শঠান/ হৈতুকান বকবৃত্তীন চ বাউমাত্র নীপি নীচিয়েত।' অর্থাৎ যারা হৈতুক, পাষণ্ড, শঠ বিড়ালতপস্বী, তাদের সাথে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। তবে শাস্ত্রীয় কড়া অনুশাসনের মাঝেও এই পরাকৃত ভাবনা কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সামনে এগিয়েছে সেটা রীতিমতো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শত বিপত্তির মাঝেও এই চিন্তা নানা পথ উপপথ অতিক্রম করে জ্ঞানের মূল স্রোতের সাথে মিশেছে। কাজেই প্রাচ্যের সব বিজ্ঞান-ভাবনার মূল কেন্দ্রবিন্দু এই লোকায়ত দর্শন। আজ এই উপমহাদেশ জুড়ে যতটুকু উদার, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও রীতি ভাবনা বজায় আছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব এই মৌলিক চিন্তার।

তিন

ভারতীয় চিন্তার আবর্তন ঘটেছে বেদকে ঘিরে। কিছু কিছু চিন্তা বেদানুগত, কিছু বেদ-বিরোধী। যেসব চিন্তা প্রবলভাবে বেদাকৃষ্ট সেগুলো হল বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ও মীমাংসা। এগুলোকে ষড়দর্শন বলা হয়। এদের মাঝে কেউ বেদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে মেনে নিয়েছে আবার কেউ-বা মৃদু আপত্তির পরও বেদকে অস্বীকার করতে চায়নি। এ-বাদে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় নামে যে দর্শন ও ধর্মগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তারা সরাসরিভাবে বেদের প্রাখর্যকে অস্বীকার করেছে। লোকায়ত চিন্তা বলতে আমরা ইতোমধ্যে যার সাথে পরিচিত হয়েছি সেটা এই নিম্নোক্ত ত্রয়ী দর্শনের কেতাবি উপাধি।

জৈন দার্শনিক হরিভদ্র সূরীর 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় লোকায়ত চিন্তা ও চার্বাক ভাবনা এক ও অভিন্ন। অষ্টম শতকে কমলশীলও লিখেছেন চার্বাক ও লোকায়ত একই গোষ্ঠীর দুটি ভিন্ন নাম। আবার মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' ও কৃষ্ণ মিশ্রের

'প্রবোধচন্দ্রোদয়' থেকেও নিশ্চিত হওয়া গেছে লোকায়ত ও চার্বাক দর্শনের মাঝে কোনোই বিভেদ নেই। দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করতেন, লোকায়ত চিন্তার মাঝ দিয়েই চার্বাক দর্শনের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। পি. টি. রাজু অত্যন্ত জোরালোভাবে মন্তব্য করেছেন লোকায়ত, চার্বাক ও বৃহস্পতি নাম- তিনটি একই ব্যক্তির।

লোকায়ত চিন্তার উৎস সন্ধানে আগে এর ঐতিহাসিক অপরিহার্যতার দিকে দৃষ্টি দেব। আগেই লক্ষ করেছি তৎকালীন আধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদকে চরমভাবে অগ্রাহ্য করে এই ধরনের দর্শনভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল। ভাববাদ হল এই জগৎ-সংক্রান্ত এমন একটা মতবাদ যেখানে মনে করা হয়, জগতের আদি উপাদান চেতনা বা ভাব। বস্তুর স্বাধীন অস্তিত্ব এখানে চরমভাবে অস্বীকৃত।

কঠ উপনিষদে ভাববাদের মূল বক্তব্যটা বুঝি প্রকাশিত হয়েছে এভাবে, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সবং প্রাণ এজাতি নিঃসতম' (এই জগতের সকল বস্তু প্রাণ থেকে এসেছে)। ভাববাদী কল্পনার পেছনে আছে একটা সুদীর্ঘ আধ্যাত্মবোধ। বস্তুবাদী চিন্তকরা বলেছেন, বাস্তব অস্বীকৃত এক উদ্ভট দর্শন হল ভাববাদ। এটি মানুষকে পা দিয়ে না হাঁটিয়ে মাথা দিয়ে হাঁটানোর এক হাস্যকর প্রচেষ্টা। এই দৃশ্যমান বাস্তবতাকে বেমালুম অস্বীকার করে সেখানে বসানো হয়েছে এক অস্পষ্ট আজগুবি কাল্পনিক শক্তির। ভাববাদ অতি সরল মানুষদের চিন্তাহীন আকুতি। ভাববাদের মাঝে লুকিয়ে আছে অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত এক মন। 'এটাকে দেখতে লাগে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেই পৌরাণিক সেনাপতির মতো। এর মাথা কেটে ফেললে মরণ হয় না; কাটা মাথা ছিটকে পড়া প্রতিটা রক্তবিন্দু থেকে জন্ম নেয় আরেকটা দৈত্যের।' এ-কথা থেকে স্পষ্ট হয়েছে ভাববাদ মানুষের মনের অত্যন্ত সঙ্গোপনে রক্ষিত এক অমোচনীয় আধ্যাত্মবোধ। তবে অবশ্যই এর একটা দীর্ঘ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা আছে। তবে তার আগে আমাদের দেখতে হবে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণে ভাববাদ মানুষকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে তার প্রকৃত তাৎপর্যটা কী?

মানুষ এই প্রকাণ্ড বিশ্বজগতে বড্ড অসহায়। তাছাড়া জগতটা নিজেও অনেকটাই রহস্যাবৃত। এর নানাবিধ জটিলতা উন্মোচনের আগে যে বহুবিধ ভয় তার মনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে তার থেকে তৈরি হয় অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা। এই অজ্ঞেয় দৈব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্তে মানবমনে জন্ম নেওয়া কল্পনার দার্শনিক অনুভূতির নাম ভাববাদ। তবে ভাববাদের আরেক ধরনের ব্যঞ্জনা আছে। যারা সমাজের উচ্চ কোটিতে অবস্থান করছে তাদের ক্ষমতার পাকাপাকি বন্দোবস্তের জন্য নানা ছলচাতুরির এক অপকৌশল হল এই রাজন্য দর্শন। সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষদেরকে কখনই এই দর্শন স্পর্শ করেনি। যার ফলে যাদের গায়ে মাটির গন্ধ আছে তারাই অহেতুক কল্পনায় সময় নষ্ট করেনি। এ-জন্য লোকায়ত চিন্তার মানুষ বস্তুবাদী ভাবনার বাইরে কোনো কল্পনাবিলাসের সংগে যুক্ত হয়নি। লোকায়ত শব্দটার

বৈভাষিক অর্থ যুক্তিটাকে অকাট্য রূপ দিয়েছে। ল্যাটিন Lucus ও লিথুনিয়ান Laucus শব্দের সংগে লোকায়ত শব্দের কোথায় একটা মিল পাওয়া যায়। এর প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় চাষের জন্য জংগল পরিষ্কারের জায়গা– a clearing of forest। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় জমি বা মাঠের সাথে প্রত্যয়টির প্রাতিশাব্দিক মিল আছে। এই ঐতিহাসিক গাঁটছড়া আমাদের অনুমান করায়, লোকায়ত দর্শন অতি সাধারণ মানুষদের আদি ও অকৃত্রিম বোধেরই সরল রূপ।

চার

ভারতীয় প্রাচীন সমাজের সাথে যেহেতু বস্তুবাদী ও ইহলৌকিক চেতনার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, সে কারণে এই সমাজকে বুঝতে গেলে নজর দিতে হবে এর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋক্‌বেদের দিকে। ঋকবেদ ভারতীয় সমাজ তো বটেই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর অন্যতম। এটা শুধু সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রন্থই নয়, এ অঞ্চলের আর্য ধর্ম তথা আর্য সভ্যতার এক অনন্য প্রতিচ্ছবিও। অধ্যাপক হেরম্যান জেকোবির মতে এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য জানিয়েছেন ঋকবেদের রচনা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার থেকে ন'শ অব্দের মাঝে। তবে বিশেষ একটা ঐতিহাসিক সত্য এর রচনাকাল নির্দেশে সহায়তা করেছে। বেদ হল আর্যদের গ্রন্থ। আর্য জাতি সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের পরাস্ত করে স্থায়ী বসবাস শুরু করলে রচিত হয় ঋক্‌বেদ। সে হিসেবে এর রচনাকালকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতক ধরে নিলে বিশেষ কোনো মতান্তরের সুযোগ থাকে না। সমাজবিজ্ঞানীরা যে সমাজকে সাম্যবাদী সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, বৈদিক সমাজ মূলত এই সাম্যবাদী সমাজেরই পরের ধাপ। বৈদিক সমাজ থেকেই বিভক্তিযুক্ত সমাজের বিষয়টা নজরে আসে। ঋকবেদের পুরুষ সুক্তের দশম মণ্ডলের দ্বাদশ ঋক্-এ শ্রেণীবিভক্তির ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে স্পষ্টত সমাজের মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে– দ্বিজ ও শূদ্র। ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসুরা বলছেন, আর্যরা ভারত আগমনের পর স্থানীয়দের পরাস্ত করার ফলে নিজেরা হয়ে পড়ে শাসক। বিজিত অনার্যরা নিপীড়িত ও শোষিত হওয়ার ফলে সমাজের চোখে হয়ে দাঁড়ায় 'নীচ', অর্বাচীন তথা অপাঙক্তেয়। এরাই শূদ্র। দ্বিজ ও শূদ্র আসলে বিজয়ী ও বিজিতদেরই নাম। খুব সংগত কারণেই বিজয়ীরা সৃষ্টি করেছে গ্রন্থ। তৈরি হয়েছে ক্ষমতা পরিচালনার পাকাপাকি ব্যবস্থা। গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছেন ব্রাহ্মণ দর্শনই ভাববাদ। আর বস্তুবাদ হল প্রজা বা সাধারণ মানুষের চিন্তা। শূদ্রদের একমাত্র কাজ ব্রাহ্মণদের খুশি করা। এ-কারণেই আমরা আগে দেখেছি সমাজের তথাকথিত এই 'নীচু' মানুষদের একমাত্র কাজ খাদ্য তৈরি করা তথা ফসল ফলানো। এরা সত্যিকার অর্থে প্রান্তিক মানুষ। ছুতোর, মেথর, মুচি, ভূঁইমালি, কলু, কাহার, বাগদী, সর্দার, বিদূষক, বিট, নরসুন্দর, তাঁতী, কামার, কুমোর, জেলে, জোলা, বেদে প্রভৃতিরাই সমাজের সেই তথাকথিত নিচু মানুষ। এদের ছিল লোকজ ধর্ম তথা

লোকায়িত মূল্যবোধ। ভণ্ডামি বা সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা এদের নেই। অন্যের অনিষ্ট তারা বোঝে না। গা-গতর ঘামানো এইসব মানুষরাই বাংলার আদি ও অকৃত্রিম ভাবনা লালনকারী। এরাই বংশ-পরম্পরায় নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলার লোকায়ত দর্শন ধারণ করে বেঁচে ছিল, এখনও আছে। বিশেষ কোনো আধ্যাত্মচিন্তা তাদেরকে স্পর্শ করেনি। কারণ এরা বুজরুকি বা অতিপ্রাকৃতিক চিন্তাধারায় বিশেষ কোনো সময় দেয়নি।

বাঙালির লোকায়ত দর্শন তথা লোকায়ত সংস্কৃতি বহু বছরের নানা উপকরণের সংমিশ্রণের ফল। যার দরুন এর মধ্যে গণতান্ত্রিক চিন্তা ছিল, পরার্থবাদী তথা মানবিক ভাবনা। সর্বোপরি আচ্ছন্ন করেছিল ঐহিকতা বা ইহজাগতিকতা। তবে মনে রাখা দরকার বহুযুগ ধরে নানা রকম চিন্তাধারার মিলন-মিশ্রণে আমরা যে মত-মতবাদগুলোর সাথে পরিচিত হয়েছি তার গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় থাকার কারণ কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ। কেননা বিশেষ কোনো শাস্ত্র কিংবা গ্রন্থ তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ফলে এটা মোটামুটি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ লিখেছেন– 'বাঙালির দর্শনকে যদি সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির দর্শন বলা যায় তবে তাতে প্রায় বলা যায় এ ধরনের মিলন-মিশ্রণ বা সিনক্রেটিজম সব যুগে হয়েছে, এবং প্রাক-বৈদিক তান্ত্রিকতা যুক্ত হয়েছে, কখনো বৈষ্ণব প্রতীকগুলোর সাহায্যে সুফি তত্ত্বের ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই সংমিশ্রণ বা সংশ্লেষণ এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, তাতে যেমন সৃজনধর্মিতা বিশেষত পুথিসাহিত্য, একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার আন্তঃধর্মীয় (ইন্টার রিলিজিয়াস) মাত্রা অর্জন করেছে তেমন তা গণমানুষের মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাড়তে পেরেছিল বলে সামগ্রিকভাবে একটা গণতান্ত্রিক ঐহিক, সামূহিক এবং উপযোগতান্ত্রিক মাত্রা ও মূল্য অর্জন করেছিল। লোকায়ত চিন্তা ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টার ফলে এটার ভিতর খুঁজে পাওয়া গেছে মানবিক চরিত্রের সব গুণ। সব রকম ভেদরেখা অতিক্রম করে সাম্যের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। অনেকে অবশ্য বলেছেন লোকায়ত চিন্তার মূলভাণ্ডারটা কিন্তু ঐ আধ্যাত্মভাণ্ডার ঋক্‌বেদেরই মাঝে। কেননা ঋক্‌বেদের ভিতর যে অগণিত দেব-দেবীকে তুষ্ট করার নিমিত্তে আরাধনা করা হয়েছে সেই আরাধ্য বিষয় কিন্তু বস্তু বা দ্রব্য। খাদ্য বা বস্তুগত সুখ চাওয়া ছাড়া ঋক্‌বেদের ভিতর অন্য কোনো বিশেষ আধ্যাত্মচিন্তা নেই। অধ্যাপক যতীন সরকার গবেষণায় দেখিয়েছেন, ঋক্‌বেদের মাঝে আছে প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক ধারার বৈশিষ্ট্যগুলো। এটা লৌকিক ঐতিহ্যের উৎসও বটে। তিনি লিখেছেন, 'প্রাকৃতিক দিক দিয়ে ঋক্‌বেদ আদিম সমাজের লৌকিক কামনামূলক সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, নিঃসন্দেহে এ সাহিত্য লৌকিক ঐতিহ্যেরই অনুভুক্ত। খাঁটি লোকসাহিত্য গণমানুষের মুখে মুখে রচিত ও লোক-পরম্পরায় শ্রুতিতে সংরক্ষিত। ঋক্‌বেদ তাই।'

বেদোত্তর যুগেও দেখা যায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব। উপনিষদ যুগে বস্তুবাদের অন্যতম ধারক ছিলেন ঋষি উদ্দালক ও ঋষি বিরোচন। জার্মান চিন্তাবিদ

ওয়ালটার রুবেন বলেছেন বস্তুবাদের সমগ্র ইতিহাসে ঋষি উদ্দালক ছিলেন অগ্রদূত। সম্ভবত তিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৬৪০-৬১০ অব্দের মানুষ। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের প্রথম দার্শনিক থেলিসেরও আগের মানুষ ছিলেন তিনি। সুতরাং বলা যায় প্রাচ্যের বস্তুভাবনার বয়স প্রতীচ্যের চেয়ে ঢের পুরনো। এখানকার সাহিত্য ও জীবনভাবনার নানা নিদর্শনের মাঝেও এসবের অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝে রচিত চর্যাপদগুলোর মাঝেও এসব ভাবনার অনেক আলামত পাওয়া যায়। এগুলো সমসাময়িক ও তার পূর্বেকার সমাজজীবনের অতি সাধারণ চিত্র। এগুলো দুর্বোধ্য ও আলঙ্কারিক হলেও মূল কথাবার্তাগুলো বেশ ঋজু। বিভিন্ন সিদ্ধাচার্য যেমন– লুইপাদ, কুক্কুরীপাদ, গুণ্ডরীপাদ, শান্তিপাদ, কাহ্নুপাদ, বীনাপাদ, দারিকপাদ, তাড়কপাদ প্রমুখ ব্যক্তি এসব রচনা করেন। যদিও এসবের ভিতর দিয়ে দুরূহ আধ্যাত্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে তবু বাংলার আউল-বাউল-সহজিয়া-বৈষ্ণব, নাথ সম্প্রদায়, সুফি চিন্তাধারার মূলভাব উঠে এসেছে এখানে। বাউল সম্প্রদায় যে মানবপ্রেমের কথা বলে চলেন তার মূলভাব পাওয়া যায় এসব পদকর্তার রচনার মাঝে। মনের মানুষকে অনুসন্ধান করা বাউলদের কাজ। এই মানুষ কোথায় থাকে? মনের মাঝে। অন্য কোথাও এর হদিস পাওয়া যায় না। তাই মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ। এটা এক ধরনের অনাধ্যাত্মিক জীবনবোধ। নিজেকে খোঁজা। বাউলরা বলছেন–

'নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন
তোমার ঘরের মাঝে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন ॥'
কিংবা 'জীবে জীবে চাহিয়া দেখি সবই যে তার অবতার
ও তুই নূতন লীলা কি দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার।'

নিজের মাঝেই পাওয়া যাবে সবকিছু। যে জীবনদেবতাকে মানুষ হন্যে হয়ে তল্লাশ করছে: তাকে পাওয়া যাবে এই আট কুঠুরির মাঝে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে এ-ধরনের কথাবার্তা রীতিরকম এক বিদ্রোহ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সূত্রপাতের পরেও আমরা যে এ ধরনের জীবনবোধের পরিচয় পেয়েছি সেটা ঐ প্রাচীন লোকায়ত ভাবনারই ফলাফল বলে ধারণা করা যায়। আমরা প্রাচীন তান্ত্রিকতার সাথে পরিচিত হওয়ার পরপরই একটা বিষয়ে ভুল করি। মনে করি তান্ত্রিকতা বুঝি নিশ্ছিদ্র আধ্যাত্মিকতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তান্ত্রিকতা হল লোকায়ত চিন্তারই আরেকটা রূপ। এর সাথে জড়িয়ে ছিল কৃষিকেন্দ্রিক জাদু অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ঘটনা। দেহতত্ত্ব সাধনা ও তান্ত্রিকতা মূলত একই বিষয়ের দুটি রূপ। দেবীপ্রসাদ লিখেছেন, 'মানবীয় প্রজননের সাহায্যে বা সংস্পর্শে প্রকৃতির উৎপাদনকে আয়ত্তে আনার পরিকল্পনা।' তার মতে মানবীয় প্রক্রিয়া আর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া একই। সন্তান উৎপাদন রহস্য ও শস্য-উৎপাদন রহস্য প্রকারান্তরে সমজাতীয়। এজন্য মানবীয় ব্যাপারগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে।

নিজের দেহ এ-জন্য লোকায়ত দর্শনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সহজিয়ারা তাই বলেছেন, 'সকলের সার হয় আপন শরীর/ নিজ দেহ জানিলে আপনে হবে স্থির '। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মূল কথাটা বলে দিয়েছেন এভাবে–'যাহা আছে দেহ ভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে '। দেহের মাঝে ব্রহ্মাণ্ড পাওয়া যায়; পাওয়া যায় আলেক সাঁই; এটাই বাউল সাধনার আসল কথা। তাই এটাকে বস্তুবাদী চেতনা না বলে পার আছে ?

পাঁচ

আগেই দেখেছি ভারতীয় জড়বাদী ধারণা বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল চেতনার থেকে বহু প্রাচীন। তবে এটা শুধু প্রাচীনই নয় অনেক আধুনিক ভাবনার প্রেরণাদায়ক ব্যাপারও বটে। পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিক কালের বস্তুবাদী ধারার প্রায় সবগুলোরই মূল বক্তব্যের সাথে লোকায়ত চিন্তার আশ্চর্য মিল আছে। একথা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে গোটা বিশ্বের মাঝে স্বাধীন, মুক্ত, চেতনশীল ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবনার উপরিসৌধের উপর দাঁড়িয়ে যে আজ নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলছে তার ভিত্তিটা ঐ শাস্ত্রবিরোধী জড় ভাবনা। কেননা শাস্ত্র মানুষকে বন্দী করেছে ছোট্ট এক এলাকায়, মানুষ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হতে হতে সংকীর্ণতার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষকে বন্দী করার কৌশল ডিঙিয়ে লোকায়ত চিন্তা সাধারণ মানুষদের জীবনবোধে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষ বুঝেছে গায়ে খাটা ছাড়া তাদের অন্য কোনো দর্শন নেই। সভ্যতা এগিয়েছে মানুষের কর্মের ভিতর দিয়ে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে বস্তুর সঙ্গে মনের সদা মিথস্ক্রিয়ায়। সেজন্য শ্রম ছাড়া অন্য কিছুই নেই। নেই কোনো মুক্তি।

'না কুছ দেখা ভাব- ভজনমে
না কুছ দেখা পোথিমে
ক হৈঁ কবীর সুনো ভাই সন্তো
জো দেখা সো রোটিমে ॥'

ভজন-পূজন-গ্রন্থাদিতে কিছু দেখা যায় না। শোন সাধুগণ, সবকিছু দেখা যায় রুটিতে।

আ সি ফ

.....

বিবর্তনের পথে ইতিহাসের বাঁকে

আমরা আনুমানিক একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল স্মৃতিচারণ এবং চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এরই উপজাত হিসেবে হাতিয়ার ব্যবহার শুরু হয় ৩৮ লাখ বছর আগে। তাতে টিকে থাকার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা তৈরি হয়– সূচনা হয় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের। কিন্তু শুধু টিকে থাকার স্বার্থেই নয়, নিজের স্বজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনের বাইরে আরেকটি প্রবণতার সূচনা হয়– অন্যকে পরাজিত করার সেই উচ্ছাস যাকে ক্রুয়েলিটি বা হিংস্রতাও বলা যায়, যা সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এক বাঁকাপথ। যেটি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মাঝে খাদ্যের প্রয়োজনে কাজে লাগত। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা অনুভব করছি অন্যকে পরাজয়ের মাধ্যমে নয় সহাবস্থানের মধ্যদিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপরও তার প্রকাশ খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

আমরা আসলে সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের একটি অংশমাত্র। ৪০ হাজার প্রজন্মের যারা অতীতে ছিলেন তারা রেখে গেছেন আমাদেরকে স্মৃতির বাহক হিসেবে। আর আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রেখে যাব আমাদের স্মৃতির ধারাবাহিকতা হিসেবে। এই উপলব্ধি আমাদেরকে একাকিত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবে, দৃষ্টি প্রসারিত করবে, সংকীর্ণতা-স্বার্থপরতা থেকে উঠে আসতে সাহায্য করবে, মহাবিশ্বকে আপন চেতনায় ধারণ করবে। বিজ্ঞান সেই ঘটনাক্রমের মধ্যকার সংযোগ রেখা যা কালিক চেতনার মধ্যদিয়ে অসংখ্য আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তৈরি করে আর সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে সেই প্রবাহ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে নতুনবোধের জগতে নিয়ে যাবে। এই কারণেই ছায়ানটের মতো একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠনের আয়োজনে ডিসকাশন প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে বিজ্ঞান বক্তৃতা দেওয়ার আগ্রহ হয়েছিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছায়ানটের সভাপতি সনজীদা খাতুনও এই কথাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি কেন তারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন।' সেদিনকে তাদের বিজ্ঞানচর্চা শুরুর প্রথম দিন বলেই অভিহিত করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট ও মানবসভ্যতার ঊষা।' খুব বেশি বোধগম্য না

হলেও মহাবিশ্বের ১৫শ' কোটি বছরের ইতিহাসকে বলে যাওয়ার সঙ্গে স্থির ছবিগুলো প্রদর্শনে এক ধরনের আবহ, ঘোর তৈরি হয়েছিল। গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম ওয়াহিদুল হককে, যিনি এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দীর্ঘসময় মাঠ পর্যায়ে কাজ করে গেছেন। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন বা সমন্বয় কতটা জরুরি তা বোঝাতে চেয়েছেন। আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, ছায়ানটের মতো অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এই ধরনের কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিলে বিজ্ঞানকে সমাজে প্রবাহিত করা অনেক সহজ হবে। ১৬ বছর ধরে এক জেলা থেকে আরেক জেলায়, এক শহর থেকে আরেক শহরে, কখনো দ্বীপাঞ্চলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমি যখন ঘুরে বেড়াই তখন মহাদেশ থেকে মহাদেশে ঘুরে বেড়ানোর অনুভূতি কাজ করে আমার মধ্যে। আর কিশোর-তরুণদের প্রশ্নের মুখোমুখি হলে এমন এক ধরনের আবেগ ঘিরে ফেলে যা আমাকে নিয়ে যায় থেলিস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এমপিডকলেস আর অতীশ দীপঙ্করের কাছে। মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে শুনতে পাই সেই সব মানুষদের রক্তের স্পন্দন যাদের কাছে এই পৃথিবী ঋণী।

'মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট ও মানবসভ্যতার ঊষা' শীর্ষক বক্তৃতানুষ্ঠানটি মূলত মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এখানে রয়েছে মহাবিশ্বের ক্রমবিকাশ, পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন ও বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তন। যেহেতু আমাদের জীবনকালের ব্যাপ্তি ১০০ বছরের বেশি হয় না তাই এই ঘটনাগুলো সাধারণ সময়ের ভিত্তিতে করতে গেলে তা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। কিন্তু তা যদি বর্ষপঞ্জির ভিত্তিতে সাজানো হয় তখন ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা অনেক সরলভাবে দেখা যায়, আবার তা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন: মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে ১৫ শত কোটি বছর আগে, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির জন্ম ১০০০ কোটি বছর আর সৌরজগতের জন্ম ৫০০ কোটি বছর আগে। উপরোক্ত সময়ব্যাপ্তিকে আনুপাতিকভাবে কমিয়ে ১ বছরের হিসাবে দেখলে মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে ১ জানুয়ারিতে, মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির জন্ম ১ মে আর সৌরজগতের উৎপত্তি ৯ সেপ্টেম্বর। যেহেতু বছরের ক্যালেন্ডার দেখতে আমরা সবাই অভ্যস্ত, এইভাবে আমরা বিশ্বের ক্রমবিকাশের চিত্র খুব সহজে তুলে ধরতে পারি। এটাকেই কসমিক ক্যালেন্ডার বা মহাজাগতিক বর্ষপঞ্জি বলে।

এখন আমরা জানি, মহাবিশ্বের উদ্ভব ১৫শ কোটি বছর আগে আর মানুষের লিখিত সভ্যতার ইতিহাস ৫ হাজার বছর। এই বিশাল সময়ের ব্যবধান আমাদের অনুভূত হয় না। কিন্তু কসমিক ক্যালেন্ডারের হিসেবে মহাবিশ্বের উদ্ভব ১ জানুয়ারি এবং মানুষের লিখিত সভ্যতার ইতিহাস মাত্র ১০ সেকেন্ড বলা হলে এটা আমাদের কাছে অনেক তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। আর হিসেবটি মনে রাখলে যেমন ক্রমবিকাশটি মনে রাখতে পারব তেমনি ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পর্কগুলো অনুধাবন করতে পারব।

মানুষ বিবর্তিত হয়েছে বিস্মিত হওয়ার জন্য

প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়েও মানুষের ঢলই নেমেছিল সেদিন, বরিশালের অশ্বিনীকুমার হলে, ২৬ জানুয়ারি ২০০৮-এ। বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ম্যাপ, চার্ট, ছবির প্রদর্শনী ছিল সারাদিন। মানুষ আসলে জন্মগতভাবে কৌতূহলী। জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী কার্ল সাগানের মতো বলতে হয়– 'মানুষ বিবর্তিত হয়েছে বিস্মিত হওয়ার জন্য আর বেঁচে থাকার পূর্বশর্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সে এই বিস্ময়ের নিবৃত্তি ঘটাচ্ছে'। সভ্যতার ইতিহাসে যেসব বিজ্ঞানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রদর্শনীতে তাদের অনেকের ছবি থাকলেও সবার মনোযোগ ছিল বিবর্তনের চার্টের ওপর। যেখানে মানুষের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর দেড় কোটি বছরের একটি ক্রমপরিবর্তনের ধারা দেখান হয়েছিল। অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানবপ্রজাতি জীববিজ্ঞানগতভাবে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তা খুব সহজভাবে নিতে পারে না মানুষ।

প্রায় ৪০০ দর্শকের উপস্থিতিতে 'মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট ও মানবজাতির ঊষা' বক্তৃতা পর্বটি শুরু হয়। মহাজাগতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যায় একের পর এক পরিবর্তন আর শত শতকোটি বছর পেরিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সর্বশেষ মানবজাতির আগমনের দীর্ঘ ধারাবাহিক ক্রমচিত্র উপস্থাপনের সময় শ্রোতারা কখনো বিস্মিত, কখনো উচ্ছ্বসিত, কখনো গম্ভীর হয়ে দেখছিলেন আর শুনছিলেন। মহাজগতে শত শতকোটি বছর পেরিয়ে জীবজগতে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় মানবপ্রজাতির আগমনে যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে, তা আর্থার সি ক্লার্ক ও স্ট্যানলি কুবরিকের ১১ মিনিটের ভিডিও ক্লিপসের মাধ্যমে প্রদর্শন যেন সেই ইতিহাসের বাঁকে শ্রোতাদের নিয়ে গেল। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটার প্রক্রিয়াটা যেন ক্ষণিকের জন্য দেখে নিতে চাইছে শ্রোতারা। শুধু তাই নয় ৪০ হাজার প্রজন্মের পরবর্তী বিস্মৃত মানুষরা তাদের আচরণের মাধ্যমে যেন সেই প্রাচীন পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইছে, নিজের ইতিহাসকে বুঝতে। এ তো সেই সংগ্রামের ইতিহাস যার মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল প্রথম চিন্তা, প্রথম স্মৃতিচারণ, প্রথম হাতিয়ারের ব্যবহার। যা পরিবর্তন ও সময়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেছিল, যার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল ইতিহাসের যাত্রা। মানুষের এই স্মৃতিচারণ এবং এর ভিত্তি তাকে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর ক্ষমতা এনে দিয়েছে। এটাই মানবজাতির অর্জন। একথাগুলোই আমি বারবার আমার বক্তৃতায় বলতে চেয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ব্যাখ্যাকার জেকব ব্রনোওস্কির উদ্ধৃতিটি মনে এসেছে, 'মানবজাতির ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল ভুলে যাওয়ার বিরুদ্ধে স্মৃতিধারণের সংগ্রাম'।

২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অশ্বিনীকুমার হলে বিজ্ঞান সংগঠন 'কসমিক কালচারে'র উদ্যোগে বরিশালে ডিসকাশন প্রজেক্ট-এর 'মহাজাগতিক প্রেক্ষাপট ও মানব সভ্যতার ঊষা' শীর্ষক বক্তৃতাটির আয়োজন করা হয়। যে প্রশ্নগুলো নিয়ে এ বক্তৃতা অনুষ্ঠান আবর্তিত হয়েছিল তা হল: পৃথিবীর বয়স কত? কতদিন বেঁচে থাকবে সূর্য? ডাইনোসরেরা বিলুপ্ত হল কীভাবে? মহাবিশ্বের প্রাচীনতম ঘটনা কী? তার আগে কী

ছিল? সত্যিই কী প্রাণীরা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে? কিভাবে পৃথিবীর প্রথম প্রাণীরা দেড়শ কোটি বছর বেঁচেছিল? কীভাবে ৫৬ হাজার বছর আগে এশিয়ার মানুষ ভেলায় করে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিল? পৃথিবীর প্রথম শহর, প্রথম বর্ণমালা, প্রথম সংবিধান কবে হয়েছিল? দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিতে গেলে অনেকটা এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। শ্রোতাদের থেকে প্রশ্নও এসেছিল অনেক– সেখানে কিশোর-তরুণরা তাদের অনুভূতিগুলোকে তুলে ধরে নানা প্রশ্ন করেন। বেশিরভাগই সেখানে কিশোর-তরুণরা থাকেন, তাদের অনুভূতিগুলোকে তুলে ধরে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার পাশাপাশি নানা প্রশ্ন করেন। কেউ জানতে চান মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে কী ছিল, তার পরিণতিই-বা কী? ডাইনোসররা বিলুপ্ত হল কীভাবে? ডায়নোসররা বিলুপ্ত না হলে মানুষ কি রাজত্ব করতে পারত? ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য কী? বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার অবস্থা কেমন? মানুষে মানুষে এত জটিলতা, এত সংঘর্ষ, হিংস্রতা; তা-কি বিজ্ঞান দিয়ে দূর করা যায় না? এই কিশোর-তরুণরা আরেকটি প্রশ্ন করেন– তাদের ভবিষ্যৎ চিত্রটি কী? আমিও থমকে দাঁড়াই আর ভাবি: বিজ্ঞান থেকে দূরে, প্রযুক্তি ব্যবহারে আসক্ত কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে মারাত্মক আতঙ্কিত একটি সমাজের গন্তব্য কোথায়? ক্রমান্বয়ে ভুল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হওয়া একটি জাতির পরিণতি কী? দেশ তো দূরের কথা, যারা তার নিজের বাসস্থানকে ভালোবাসে না, সেরকম মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন কেমন হয়? মানুষ সমাজের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট মনে করে না, প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিক তাদের আচরণ! প্রকৃতির স্বরূপ কী? সবকিছুকে খণ্ডিত করে দেখা আর ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন একটা জাতি কি সময় প্রবাহ অনুভব করে?

মানুষের অজ্ঞতা, লোভ আর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে যেখানে হাউজিং এস্টেটগুলো, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে, একটা শহরে অবকাঠামোতে মরণ-কামড় বসিয়ে দেয় তাকে নিয়ে আশা করার কি কিছু থাকে? যদি আমাদের সোসিও-সাইকো ডাইনামিকস বা সাইকোহিস্ট্রি জানা থাকত বা সামাজিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে গাণিতিকভাবে চিন্তা করতে পারতাম, তবে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু বলা যেত। ৪০ বছরের ঘটনাক্রমের নিখুঁত পরিসংখ্যানিক উপাত্ত না থাকলেও কিছু ঘটনাপ্রবাহের সমন্বয় করা গেলে ঢাকা শহরের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কী হবে তার আনুমানিক চিত্র ধারণা করা যেতে পারে। বোঝা যেতে পারে রাজনৈতিক অস্থিরতা কিভাবে একটি দেশের ইকোলজিক্যালি বিপর্যয় নিয়ে আসে, শুধু পরিবেশের ক্ষেত্রেই নয় মানসিক ক্ষেত্রেও বটে।

চরম বিজ্ঞানবিমুখতা আর ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কিত মানুষের সমাজ কেমন হতে পারে? সেই সমাজ একটা নগরকে কতটা ধ্বংসের মুখে নিয়ে যেতে পারে তা ঢাকা শহরকে দেখলে অনুধাবন করা যায়– ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা মহামারী, ভূমিধস, প্রাকৃতিকভাবে বিচ্ছিন্নতার কারণে মানসিক প্রতিবন্ধী বা মানসিকবিকৃতির বিকাশ। ২০

বছরের পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশন-ব্যবস্থা প্রায়ই কোনো উন্নতিই ঘটাতে পারেনি অথচ আবাসন বেড়েছে ভয়াবহভাবে। সেই নিষ্কাশন ব্যবস্থা কখনো কখনো ওয়াসার পানির সঙ্গে মিশে যায়। ফলে ওয়াসার পানি মূহর্তেই ঢাকার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিতে পারে জীবাণু যা মহামারী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। এদিকে পরিবেশ দূষণ এবং অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বল্গাহীন মুনাফা-বাণিজ্য সেই সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে।

মানুষ ভুলে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্পর্কের কথা। খাল-বিল, ডোবা-নালা ভরাট করে ক্ষুদ্র পোকামাকড় থেকে শুরু করে– উভচর, সরীসৃপ, পাখি এমনকি স্তন্যপায়ীদের শুধু হুমকির মুখে নয়, একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল সমগ্র জীবজগৎ যে বাস্তুসংস্থান নীতির ওপর দাঁড়িয়েছিল তা মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি। আর অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট তৈরি, অবাধে বহুতল ভবন নির্মাণ এবং তথাকথিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে কংক্রিটের কারাগার তৈরির মাধ্যমে কোটি মানুষের কফিন তৈরি করা হয়েছে। আমরা পরিণত হয়েছি নব্য-কর্পোরেট কালচারে অভ্যস্ত স্বার্থপর, বিজ্ঞানবোধহীন বিস্মৃতিপ্রবণ এক জাতিতে। যারা তাদের বাচ্চার খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না অথচ খেলা নিয়ে রীতিমতো জীবন দিয়ে দেয়। একটু খোলা জায়গা বা মাঠ পেলে তাতে ভবন নির্মাণের টালবাহানা শুরু করে। একজন গবেষক বলেছিলেন, কীভাবে একটা স্বল্প আয়তনের দেশে এতবেশি মানুষ বসবাস করতে পারে যাদের মধ্যে স্থানের পার্থক্য খুবই সামান্য তা রীতিমতো বিস্ময়কর। স্থানের এত ঘাটতির কারণে প্রকৃতি থেকে এবং নিজস্ব চিন্তনজগৎ থেকে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে তা কী ধরনের মানসিক সমস্যা তৈরি করে, আমরা কি জানি? ঢাকা শহরের মাটিকে সম্পূর্ণ আড়াল করায় বৃষ্টির বা বন্যার পানিকে না পারা যাচ্ছে জমিয়ে রাখা, না যাচ্ছে শোষণ করা। কিন্তু মাটির নিচ থেকে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন অব্যাহত আছে। ফলে ভূত্বকের নিচে একটি স্তর ফাঁকা হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। উপরের স্তর দেবে গিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে যে কোনো সময়। অর্থাৎ আমরা এক ভয়ংকর ভূমিধসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যেখানে সকালে উঠে সুনামির ফলে বেঁচে থাকা মানুষ জলোচ্ছ্বাস বা পানি ফুলে নামা-ওঠার দৃশ্যই দেখবে না, দেখবে ধসে-পড়া লাখ লাখ মৃত মানুষের এক ভয়াল নগরীকে।

কোনো বিজ্ঞানীর অর্জন পুরো মানবজাতির অর্জন

মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন অনুভব করি। হোমারীয় চারণকবিদের মতো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নিজেদের অসহায়ত্বের কথা ভাবি, কখনো লালনের মতো নিজেকে প্রশ্ন করে দেখতে পাই শিকড়ছেঁড়া সব মানুষের দল, কীভাবে বিভ্রান্তির জালে জড়িয়ে ফেলেছে। অথচ মানুষ তার আপন মাতৃভূমিতে পদচারণার সময় থেকে খুঁজে ফিরছে নিজের শিকড়; তারই ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে মানুষ জ্ঞানের ব্যাপ্তি ভূ-মণ্ডল ছাড়িয়ে সৌরজগতে

প্রসারিত করেছে, নক্ষত্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে আর কৌতূহলী হয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছে: কীভাবে সৃষ্টি হল এই মহাবিশ্ব? মানুষের অবস্থানই-বা কোথায় এই বিশালতার মাঝে? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যুগে যুগে এসেছেন ইউক্লিড, আর্কিমেডিস, হাইপেশিয়া, কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন, ... প্লাংক, আইনস্টাইন প্রমুখ মহামনীষীরা। সেই চিন্তা, উপলব্ধি আর জানার সংগ্রামের ঐতিহ্যকে কি আমরা ধারণ করতে পেরেছি? আমাদের নিজেদের ইতিহাসটা কি মনে রাখতে পেরেছি? বায়োফিজিক্স-এর জনক জগদীশ চন্দ্র বসু মনে করতেন, কোনো বিজ্ঞানীর অর্জন পুরো মানবজাতির অর্জন। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুনাফাপ্রাপ্তির উৎস নয়। তিনি আরো বলতেন, 'বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে প্রযুক্তিশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করে শিক্ষিত দেশপ্রেমিক ভদ্রলোকরা বৃথা শক্তি অপচয় করছেন।' ভারতবর্ষে রসায়নশাস্ত্র বিকাশের পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলতেন, 'বিজ্ঞানের অনুশীলন কেবল বিজ্ঞানের জন্যই করিতে হবে এবং তাহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে এমন লোকের প্রয়োজন।... ইউরোপে গত শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের এমন সব সেবক জন্মিয়াছেন, যাহারা কোনোরূপ আর্থিক লাভের আশা না করিয়া বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচর্চা করিয়াছেন'। বিজ্ঞানচর্চায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সারাজীবন ব্যয় করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যার সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরো সুন্দর...'। জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথিকৃৎ রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান তত্ত্বের জনক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের জনক মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীরা বাংলার অসাধারণ সব অর্জন! এই অর্জনে যে বিজ্ঞান চর্চার, যে ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল তা ৪৭-এর দেশবিভাগ ধ্বংস করে দেয়। শুরুটা কী উজ্জ্বল! অথচ শেষটা কতটা ক্লেদাক্ত! ভুল আর বিভ্রান্তিতে ভরা। এর অন্যতম কারণ হল স্মৃতি বা অতীতকে অবহেলা করে এ দেশের সব ধরনের ধারাবাহিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়া। এইতো সেদিনের ঘটনা ৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বাচ্চাদের ভুলভাবে পাঠ্যবইতে অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

প্রশ্রয় দিয়েছি ভুলে যাওয়াকে। এর মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছে ইতিহাস-বিচ্ছিন্নতা। এটা শুধু সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই বিপর্যয় ডেকে আনেনি; বরং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেও করেছে পথহারা। আমাদের দেশের বর্তমানকালের বিজ্ঞানের অনগ্রসরতার পেছনে এ প্রবণতাকেই দায়ী করা যায়। বিজ্ঞান হল তা-ই যার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের ঘটে যাওয়া টুকরো টুকরো অসংখ্য ঘটনার মধ্যে সংযোগ তৈরি করে, নির্মাণ করে ইতিহাস। আর তার আলোয় মানুষ ভবিষ্যৎকে এবং নিজের অবস্থানকে বোঝার চেষ্টা করে। আর সেই ইতিহাসকে ধারণ করে ভবিষ্যতে চলার একটি পথ তৈরি করে।

ফলে বিজ্ঞান-বোধগম্যহীন জাতির পরিণতি কী হতে পারে তা সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া ঢাকা শহরের অপরিকল্পিত নগরায়ন ও মৃত্যুনগরীতে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়া দেখলে অনুভব করা যায়। আমি হাঁটি আর ভাবি, ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-বোধহীন একটি জাতির আর কী পরিণতি হতে পারে নিয়তির কাছে সমর্পণ করা ছাড়া। মানুষ কি সে কারণে অনন্য যে সে শিল্পকলা জানে, অথবা সে বিজ্ঞান জানে? মানুষ অনন্য সেই কারণে যে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বয়ে বিপুল সম্ভাবনাময় জীবনধারা তৈরি করে। পরিহাসের বিষয় তা থেকে আমরা মানুষেরা আজ অনেক দূরে!

[কৃতজ্ঞতা: ডিসকাশন প্রজেক্ট-এর খালেদা ইয়াসমিন ইতি, নোমান মোত্তাকী, সীমান্ত দীপু।]

শওকত হোসেন

.....

নওয়াবদিন ইলেক্ট্রিশিয়ান/ দানিয়াল মুঈনুদ্দীন

[দানিয়াল মুঈনুদ্দীন (জন্ম ১৯৬৩) বহুল প্রশংসিত *ইন আদার রুমস, আদার ওয়ান্ডার্স* গল্পসংকলনের লেখক। পাকিস্তানের নাগরিক। দানিয়ালের বাবা গোলাম মুঈনুদ্দীন ছিলেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য, দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানের সংস্থাপন বিভাগের সচিব পদে যোগ দেন। দানিয়ালের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে। তবে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু পাকিস্তানের লাহোর আমেরিকান স্কুলে, শেষ করেছেন ডারমাউথ কলেজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাবার মৃত্যুর পর তিনি পারিবারিক খামার পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এই খামার চালানোর অভিজ্ঞতাই তাঁকে পরে গল্প লেখায় উৎসাহিত করেছে। তিনি ইয়েল ল' স্কুলেও পড়াশোনা করেন। ২০০৪ সালে টুসানের ইউনিভার্সিটি অফ আরিজোনা থেকে এমএফএ ডিগ্রি অর্জন করার পর তাঁর প্রথম গল্প *আওয়ার লেডি অফ প্যারিস* প্রকাশিত হয় *যোট্রোপ: অল স্টোরি* পত্রিকায়। মুঈনুদ্দীনের প্রথম গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এটি সেই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত একটি গল্প, প্রথম বেরিয়েছিল *নিউ ইয়র্কার* পত্রিকায় এবং পরে দ্য বেস্ট আমেরিকান শর্ট স্টোরি সংকলনে ঠাঁই পায়। বর্তমানে পাকিস্তানের ১৯৭০ দশকের পটভূমিকায় তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন।]

একটা সিগনেচার অ্যাবিলিটির কল্যাণে পয়সাকড়ির মুখ দেখেছে ও: মিটারের রিভোল্যুশনকে শ্লথ করে ইলেক্ট্রিক কোম্পানিকে ঠকানোর কায়দা। কাজটা এতটাই নৈপুণ্যের সাথে সারা হয় যে প্রতি মাসের কাঙ্ক্ষিত সঞ্চয় একেবারে শ' রুপির নোট পর্যন্ত হিসাব করতে পারে খদ্দের। পাকিস্তানের মুলতানের পেছনের এই মরুভূমিতে যেখানে দিন-রাত সারাক্ষণই জলাশয় থেকে টিউবওয়েলে পাম্প করে পানি তুলতে হয়, সেখানে নওয়াবের এমনি আবিষ্কার পরশপাথরকেও ছাড়িয়ে গেছে। অনেকের ধারণা চুম্বক কাজে লাগায় ও, অন্যরা বলে ভারি পাথর, বা পোর্সেলিনের টুকরো কিংবা মৌচাকে পাওয়া কোনও জিনিস হবে। সন্দেহবাদীরা জানিয়েছে, মিটারম্যানদের সাথে নাকি রফা আছে ওর। সে যাই হোক, কায়দাটা নওয়াবের জন্যে কাজের নিশ্চয়তা দেয়, সেটা ওর মুনিব কে.কে. হারুনির খামারের ভেতর-বাইরে দু'জায়গাতেই।

উনিশ শো সত্তরের দশকে ইসলামাবাদের আমলাদের মাঝে হারুনিদের প্রভাব থাকার সময় নির্মিত খামার থেকে বাজারে চলে যাওয়া একটা সংকীর্ণ ও খানাখন্দে ভরা রাস্তার ধারে বিছিয়ে আছে খামার। আখ আর তুলোগাছ, আমবাগান আর ক্লোভার আর গমের ক্ষেতের মাঝখানে বিছিয়ে আছে বিরান ভূমি কিংবা নোনা শাদা মরুভূমি, রোজ নওয়াবদিন ইলেক্ট্রিশিয়ানের যত্নে চালানো টিউবওয়েলের জলে সিক্ত হচ্ছে। সকালে একটা ভাঙা পাম্প মেরামতের ডাক পেয়ে নুরপুর হারুনিতে ঘুরে বেড়ানোর সকাল শুরু করে নবাব; ওর ফ্রেম থেকে বের হয়ে আসা ঝুলন্ত তারে প্লস্টিকের ফুল দিয়ে সাজানো বাইসাইকেল টলমল করে আগে বাড়ে। হ্যান্ডেলবারে ঝোলানো একটা ময়লা চামড়ার ব্যাগে রাখা তিন পাউন্ড ওজনের বল-পিন হাতুড়িই মূলত ওর সরঞ্জাম। অনেক বছর আগে টিউবওয়েলগুলোকে ছায়া দিতে লাগানো বটগাছের শীতলতায় অপেক্ষা করছিল খামারকর্মী আর ম্যানেজার। 'চা লাগবে না। দরকার নাই,' ধোঁয়া-ওঠা কাপটা হাতের ইশারায় ফিরিয়ে দিয়ে বলল নওয়াব।

বুনো কুড়োলের মতো হাতুড়িটা ঝুলছে ওর হাতে। পাম্প ও ওটার ইলেক্ট্রিক মটরের তেল-চিটচিটে ঘরে ঢুকল নওয়াব। নীরবতা। ভেতর থেকে ও চিৎকার করে আলোর ব্যবস্থা করার কথা না-বলা পর্যন্ত দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে রইল লোকজন। মেজাজ বিগড়ে যেতে শুরু করলেও সাবধানে গোলমেলে জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেল ও। চক্কর দিল ওটাকে ঘিরে, ঠেলা দিল, তারপর নিজের ইচ্ছেমতো কাজ শুরু করল। ওটা নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়ল, এক কাপ চা এনে রাখতে বলল ওটার পাশে। অবশেষে আলগা করে ফেলতে শুরু করল ওটা। লম্বা ভোঁতা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে মেশিনের পেনিট্রেলিয়া ঢেকে-রাখা ঢাকনা ভেঙে ফেলল, ঢিলে হয়ে ছিটকে ছায়ায় গিয়ে পড়ল একটা স্ক্রু। বল-পিন তুলে কায়দা করে বাড়ি মারল ও। ব্যর্থ হল ওর হস্তক্ষেপ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে খামারের এক শ্রমিককে এক টুকরো সত্যিকারের পুরু চামড়ার ফালি খুঁজে আনার হুকুম দিল, কাছের আমগাছ থেকে আঠালো আমের কসও আনতে বলল। তো এভাবেই কেটে গেল সারা সকাল আর বিকেল; একের পর এক জিনিস আটকাচ্ছে নওয়াব, পাইপ গরম করছে, তারপর বিভিন্ন তার একসাথে জুড়ছে, বিভিন্ন সুইচ আর ফিউজ বাদ দিচ্ছে। তারপর কোনওভাবে, আনাড়ি উদ্ভাবনের বেলায় স্থানীয় মেধার বাস্তবায়ন হিসেবে চলতে শুরু করল পাম্পটা।

* * *

সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প বয়সেই অসীম উর্বরতার মিষ্টি এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল নবাব। বউকে ভালোবাসে ও। মেয়েটিও নয় মাস পর পর না হলেও খুব বেশি ফারাক ছাড়াই বাচ্চা দিয়ে গেছে ওকে। বহুল প্রতীক্ষিত ছেলের আগমন না-ঘটা পর্যন্ত একের পর এক, সবগুলোই মেয়ে। ততদিনে বার বছর থেকে শুরু করে একেবারে হামাগুড়ি দেওয়া বারটি মেয়ের এক পূর্ণাঙ্গ সেট হয়ে গেছে নওয়াবের, আর

একটা বেমানান টুকরো। পাঞ্জাবের গভর্নর হলেও ওদের যৌতুক দিতে গিয়েই ফতুর হয়ে যেত নির্ঘাৎ। যত দক্ষই হোক, একজন ইলেক্ট্রিশিয়ান ও মেকানিকের পক্ষে ওদের সবাইকে বিয়ে দিতে পারার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়নি। সুদের হার যত বেশি হোক না কেন, সুস্থ মাথায় কোনও মহাজনই সবগুলো মেয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জিনিসপত্র কেনার টাকাপয়সা ধার দিতে রাজি হবে না: খাটপালঙ্ক, একটা ড্রেসার, ট্রাংক, ইলেক্ট্রিক ফ্যান, থালাবাসন, বর আর কনের জন্যে ছয় সেট করে পোশাক, হয়তো একটা টেলিভিশন, এমনি আরও অনেক কিছু।

অন্য কেউ হলে হাল ছেড়ে দিত হয়তো–কিন্তু নওয়াবদিন দেয়নি। মেয়েরা ওর মেধার বেলায় এক ধরনের অনুপ্রেরণার কাজ করে। রোজ সকালে যুদ্ধে যাওয়া কোনও সৈনিকের মতো সন্তোষের সাথে আয়নায় নিজের চেহারা জরিপ করে ও। নওয়াবের জানা ছিল আয় বাড়ানোর উৎসের প্রসার ঘটাতেই হবে ওকে–টিউবওয়েল দেখভালের জন্যে কে.কে. হারুনির কাছ থেকে যে বেতন পায় তাতে এখনই পোষাচ্ছে না। একটা পরিত্যক্ত ইলেক্ট্রিক মটর দিয়ে চালানো এক কামরার একটা ময়দাকল বসিয়েছে ও–নিজেই বাতিল করেছে ওটা। মনিবের ক্ষেতের প্রান্তে একটা পুকুরে মাছ চাষের চেষ্টা করেছিল। ভাঙা রেডিয়েটর কিনে মেরামত করে ফের বিক্রি করেছে। এমনকি ঘড়ি মেরামত করতে দিলেও মুখ ফেরায় না, যদিও উদ্যোগটা খুবই বাজে ফল দিয়েছে, টাকাকড়ির চেয়ে বরং বেশি লাথি-ঘুষি জুটেছে কপালে। কারণ ওর হাত-দেওয়া কোনও ঘড়িই আর ঠিকমতো সময় দেয়নি।

বেশিরভাগ সময়ই লাহোরে থাকেন কে.কে. হারুনি, খুব কমই খামার দেখতে আসেন। বৃদ্ধ যখনই বেড়াতে আসেন, দিনরাত সারাক্ষণ দেয়াল-ঘেরা বটগাছের বাগানের প্রাচীন খামারবাড়ির দিকে খোলা কাজের লোকদের বসার কামরার দরজায় ঠাঁই নেয় নওয়াব। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখে বিচিত্র বাঁকানো, দাগপড়া এভিয়েটর গ্লাস। অনেকটা আটলান্টিকে ঝড়-কবলিত স্টিমারের বয়লারের যত্ন নেওয়া এঞ্জিনিয়ারের মতো এ বাড়ির সাজসরঞ্জামের পরিচর্যা করে নওয়াব: এয়ারকন্ডিশনার, ওয়াটার হিটার, রেফ্রিজারেটর ও পাম্প। ওর অতিমানবীয় প্রয়াসের সুবাদেই কে.কে. হারুনিকে জমির মালিক ঠিক লাহোরে যেমন উপভোগ করে থাকেন ঠিক তেমনি যান্ত্রিক খোলসে রাখতে সফল বলা চলে ওকে: শীতল ও স্নাত, আলোকিত ও পুষ্ট।

হারুনি অবশ্যই এই সর্বব্যাপী মানুষটার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছেন, কেবল তদন্ত সফরের সময়ই তাঁর সঙ্গে থাকে না সে, বরং সকালে কি রাতে মাস্টার বেডের উপর দাঁড়িয়ে হালকা টুকটাক জিনিসে নতুন করে তার জুড়তে বা বাথরুমে ওয়াটার হিটার পরখ করতে দেখা যায় তাকে। অবশেষে এক সন্ধ্যায় চা খাবার সময় মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তটুকু হিসাব করে একটা কথা বলার অনুমতি চাইল নওয়াব। ভূস্বামী তখন আমুদে মনে সামনের কড়কড়ে রোজউডের আগুনে নখ ছুঁড়ে ফেলছিলেন। অনুমতি দিলেন তিনি।

'হুজুর, আপনি তো জানেন, আপনার জমির সীমানা এখানে থেকে সেই সিন্ধু নদ অবধি। ঠিক সতেরটা টিউবওয়েল আছে এই জমিতে। কিন্তু এই সতেরটা টিউবওয়েল দেখাশোনা করার লোক মাত্র একজন, আমি, আপনার দাস। আপনার সেবায় মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি'–পাকা চুল দেখাতে এখানে মাথা নোয়াল ও–'এখন আর যতটা দরকার সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি না। অনেক হয়েছে, হুজুর, আমার দুর্বলতা ক্ষমা করবেন। দিনের আলোয় বেইজ্জতির চেয়ে অন্ধকার ঘর আর অহঙ্কারের উপোস ঢের ভালো। আমাকে রেহাই দিন। আপনার কাছে আবেদন করছি, মিনতি করি।'

এমন ঝরঝরে ভাষায় না হলেও এ ধরনের কথাবার্তায় অভ্যস্ত বৃদ্ধ, নখ ফাইল করলেন তিনি, তারপর এই ঝড়ো হাওয়া থামার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'ব্যাপারটা কী, নওয়াবদিন?'

'ব্যাপার, হুজুর? হায় হায়, আপনার এখানে চাকরিতে আবার কী ব্যাপার হবে? সারা জীবন আপনার নিমক খেয়েছি। কিন্তু, হুজুর, এখন এই বুড়ো একজোড়া পা আর ভারি ভারি সব যন্ত্রপাতি আমার উপর পড়ায় পাওয়া আঘাতের কারণে নতুন জামাইয়ের মতো সাইকেলে চেপে আপনার এখানে চাকরিতে ঢোকার সময়ের মতো এক খামার থেকে আরেক খামারে ঘুরে বেড়াতে পারি না। আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমাকে ছেড়ে দিন।'

'কিন্তু ফয়সালাটা কী?' আসল জায়গায় পৌঁছে গেছেন বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন হারুনি। কোনও কিছুতেই কেয়ার করেন না তিনি–যদি-না তাঁর আরামের প্রশ্ন হয়। এটাই ওর বেলায় বিরাট চিন্তার বিষয়।

'মানে, হুজুর, একটা মটরসাইকেল থাকলে হয়তো কোনওভাবে অল্পবয়সী কাউকে তামিল না দেওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারতাম।'

সে-বছর ফসল ভালোই হয়েছিল। আগুনের সামনে নিজেকে উদার মনে হচ্ছিল হারুনির, ফার্ম-ম্যানেজারদের দারুণ বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে। একটা আনকোরা নতুন মটরসাইকেল পেল নওয়াব, একটা হোন্ডা ৭০। জ্বালানির জন্যে ভাতাও আদায় করে নিতে সক্ষম হল ও।

* * *

মটরসাইকেল মর্যাদা বাড়িয়ে দিল ওর, লোকের চোখে ওজনদার করে তুলল ওকে; ফলে লোকে ওকে চাচা ডাকতে শুরু করল, দুনিয়াদারি বিষয়ে পরামর্শ চাইতে লাগল ওর কাছে, যার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানা নেই ওর। এখন আরও অনেক দূর পাল্লার পথ পাড়ি দিতে পারছে ও, আরও বেশি কাজ করতে পারছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন প্রতিটি রাত বউয়ের সাথে কাটাতে পারছে, বিয়ের গোড়ার দিকে গ্রামে নওয়াবের বাড়ির বদলে পরিবারের সাথে এলাকার একমাত্র মেয়েদের স্কুলের কাছে ফিরোজায় থাকার অনেক অনুনয়বিনয় করেছিল সে। ফিরোজার কাছে একটা সরু খালের মাথার কাছ থেকে একটা দীর্ঘ সোজা রাস্তা কে.কে. হারুনির জমিনের উপর

দিয়ে সেই সিন্ধু নদ পর্যন্ত চলে গেছে। এইসব জমিন এক রাজকুমারের মালিকানায় থাকতে বানানো একটা পুরনো মহাসড়কের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। প্রায় দেড়শো বছর আগে, এক রাজপুত্র এই প্রত্যন্ত এলাকায় কোনও বিয়ে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় খুব গরম বোধ হচ্ছিল তাঁর, তখন রোজউড গাছ লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি পথিকদের ছায়া বিলানোর জন্যে। নির্দেশ দেওয়ার কথা কয়েক মিনিটের ভেতরই সে-কথা ভুলে গিয়েছিলেন তিনি, এবং কয়েক যুগের ভেতর এক সময় বিস্মৃত হয়েছেন নিজেও, কিন্তু গাছপালা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, এখন বিশাল আকারের, কয়েকটা মরে গেছে, বাকলহীন দাঁড়িয়ে আছে, শাদা, পাতাবিহীন। নতুন মেশিনে চেপে এই পথ ধরে উড়ে চলে নওয়াব, প্রত্যেকটা নব ও ব্রেস থেকে ঝুলতে থাকে ব্যাগ আর ফিতে, ফলে কোনও ঢিবিতে টক্কর লাগলেই মনে হয় বাইকটা বুঝি অসংখ্য ক্ষুদে বিলুপ্ত ডানা ঝাপ্টাচ্ছে; কানে প্রায় তালা-লাগা অবস্থায় হাসিমুখে যে টিউবওয়েলই মেরামত করতে যাক না কেন পৌঁছানোর গতির কারণে ঝলমল করতে থাকে ও।

আকাশ থেকে দেখলে নওয়াবের দিনগুলোকে মনে হবে প্রজাপতির মতোই লক্ষ্যহীন বুঝি: সকালে সিনিয়র ম্যানেজারের বাড়িতে গিয়ে আন্তরিকভাবে সম্মান দেখায় তাকে, তারপর এবড়োখেবড়ো মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে কোনও না কোনও টিউবওয়েলে; তারপর রোজউড গাছের নিচ দিয়ে তীব্র বেগে চলে যায় ফিরোজা শহরে, শহরের আশপাশে শোরগোল তোলে শব্দের বুলেট, শহরের ভেতর আলস্যের সাথে ঘুরে বেড়ায়, ওর নিজস্ব স্বার্থে গোপনে কাজ সারে–চাচাত ভাইয়ের সব্জির ক্ষেত থেকে আধপাকা মৌসুমের গোড়ার দিকের মিষ্টি তামাক বিলির চুক্তি সারা, কিংবা হ্যাচিংয়ের আগে মুরগির ঝাঁকের অর্ধেক অংশ শুমারি করা–তারপর ফের নুরপুর হারুনিতে ফিরে যাওয়া, আবার বাইরে আসা। এইসব দিনের মানচিত্র একটার উপর আরেকটা বসানো হলে একটা জটলায় পরিণত হবে, কিন্তু রোজ সকালে ঠিক সূর্য ওঠার সময় একই জায়গা থেকে বের হয়ে আসে ও, আবার রোজ সন্ধ্যায় সেখানেই ফিরে আসে, ক্লান্ত, ধূলিমলিন, বাইকের সুইচ অফ করে উঠোনের দিকে চলে-যাওয়া কাঠের দরজার চৌকাঠের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যায়, ঠাণ্ডা হওয়ার সময় ক্লিক ক্লিক শব্দ তোলে এঞ্জিন। রোজ সন্ধ্যায় বাইকের কিকস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সবগুলো মেয়ের বেরুনোর অপেক্ষা করে ও, ওকে ঘিরে দাঁড়াবে ওরা, ওর উপর লাফঝাঁপ দেবে। এই সময়ে প্রায়ই ওর চেহারায় একই অভিব্যক্তি থাকে–ছেলেমানুষি নিষ্পাপ আনন্দের ছাপ, ওর চেহারার গাম্ভীর্য, বলিরেখা আর দাড়ির জঙ্গলের সাথে বেখাপ্পা ঠেকে সেটা। স্ত্রী রাতের খাবার হিসাবে কী রান্না করেছে ধরতে পারে কিনা দেখতে মুখ তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকবে, তারপর ওর কাছে যাবে। সব সময় একই ভঙ্গিতে আবিষ্কার করে তাকে, ওর জন্যে চা বানাচ্ছে, চুলোর আগুনে হাওয়া দিচ্ছে।

* * *

'কী খবর, জানের জান, আমার মুরগির বাচ্চা,' একদিন সন্ধ্যায় রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত শ্যাওলায় কালো দেয়ালঅলা অন্ধকার কুঁড়েতে ঢোকার সময় সোহাগ করে বলল ও। 'হাঁড়িতে আমার জন্যে কী আছে?' ডেকচি ওল্টাল ও, দোমড়ানো মাটির মেঝেয় কেতলি দিয়ে ওটাকে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল । একটা কাঠের চামচ দিয়ে ঘাটতে শুরু করল ।

'বেরোও! বেরোও!' চামচ কেড়ে নিয়ে বলল ওর স্ত্রী, ওটা তরকারিতে ডুবিয়ে ওকে স্বাদ চাখতে দিল ।

অনুগতের মতো মুখ খুলল ও, যেন বাচ্চা ওষুধ খাচ্ছে। তেরটি বাচ্চা পেটে ধরলেও ওর স্ত্রীর এখনও সুঠাম, শক্ত শরীর, টাইট জোব্বার ওপাশে মেরুদণ্ডের হাড় দেখা যায়। ওর পুরুষালি চেহারা এখনও ত্বকের নিচে আভা বিলোয়, এক ধরনের পাকা হলদে রঙ যোগায় ওকে। এখন চুল পাতলা হয়ে পাক ধরলেও গ্রামের তরুণীর মতো কোমর অবধি একটামাত্র বেণী করে। স্টাইলটা ওকে না মানালেও ওর মাঝে নওয়াব এখনও বিশ বছর আগে বিয়ে করা মেয়েটিকেই দেখতে পায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল ও, মেয়েদের এক্কাদোক্কা খেলা দেখছে, ওর স্ত্রী ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় পাছা বাড়িয়ে দিল, পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘষা লাগল ওর সাথে ।

প্রথমে নওয়াব, তারপর ওর মেয়েরা এবং সবার শেষে ওর স্ত্রী খেল। উঠোনে বসে ঢেকুর তুলে সিগারেট খেতে লাগল ও। সবে দিগন্তে উদয় হওয়া নতুন চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। জানতে ইচ্ছে করে চাঁদটা কিসের তৈরি? ভাবল ও। তবে বেশি ভাবতে গেল না। আমেরিকানরা চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়ানোর কথা বলার সময় রেডিও শুনেছিল ও। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল ওর ভাবনা। ওর আশপাশের কুঁড়েগুলোর বাসিন্দারাও রাতের খাবার শেষ করেছে, অন্ধকার হয়ে আসা ছাদের মাথার উপর গোবরের ঘুটের আগুনের ধোঁয়া ঝুলছে, কাঁচা তামাকের গন্ধের মতো মসলার কড়া গন্ধ আসছে। নওয়াবের বাড়িতে অসংখ্য বুদ্ধিদীপ্ত কায়দাকানুন আছে–তিনটা ঘরের সবকটাতেই পানির ব্যবস্থা, রাতে একটা ডাক্ট ঘরে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আনে, এমনকি একটা শাদাকালো টেলিভিশনও আছে, ওর স্ত্রী ফুলের নকশা এম্ব্রয়ডারি-করা একটা ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে রাখে ওটা। একটা গিয়ার মেকানিজম বানিয়েছে নওয়াব, রিসেপশন ঠিক করতে ঘরে বসেই ছাদের অ্যান্টেনা নড়াচড়া করা যায়। বাচ্চারা ভেতর বসে টেলিভিশন দেখছে, আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার যোগাড়। ওর স্ত্রী বাইরে এসে বোনা বিছানার ঝুলন্ত দড়ির উপর পা ঝুলিয়ে ভদ্রভাবে বসল ।

'আমার পকেটে একটা জিনিস আছে–জানতে চাও' কী?' এক ধরনের ঠোঁট বাঁকানো হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকাল ।

‘এই খেলা আমার জানা আছে,’ বলে হাত বাড়িয়ে চোখের চশমা ঠিক করে দিল ওর স্ত্রী। ‘তোমার চশমা সব সময় এমন বেঁকে থাকে কেন? মনে হয় একটা কান অন্যটার চেয়ে উপরে।’

‘খুঁজে পেলে ওটা তোমার।’

বাচ্চারা এখনও টিভিতে মগ্ন নিশ্চিত হতে চোখ ফেরাল সে, তারপর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পকেট হাতড়াতে শুরু করল। ‘আরও নিচে...নিচে...’ বলল নওয়াব। কুর্তার নিচে আঠালো ভেস্টের পকেটে কাগজে মোড়ানো কাঁচা চিটাগুড়ের একটা পোটলা খুঁজে পেল ওর স্ত্রী।

‘আরও অনেক আছে আমার কাছে,’ বলল সে। ‘তাকিয়ে দেখ একবার। বাজারে এই জিনিস পাবে না। আখ মাড়াইয়ের মেশিন মেরামত করার জন্যে দাশতিরা পাঁচ কিলো দিয়েছে আমাকে। কাল বিক্রি করে দেব। আমাদের জন্যে কয়েকটা পরোটা বানাবে? সবার জন্যে? সুন্দর করে?’

‘আগুন নিভিয়ে দিয়েছি।’

‘আবার ধরাও। নইলে তুমি এখানে বসে থাকো, আমি জ্বালাচ্ছি।’

‘কোনওদিনই পারবে না। আমি অবশ্য যেভাবেই পারি শেষ করব,’ উঠে দাঁড়ানোর সময় বলল সে।

কড়াইয়ে ঘি রান্নার গন্ধ পেয়ে অল্পবয়সী বাচ্চাগুলো ভিড় জমাল, চিটাগুড় গলতে দেখল ওরা। অবশেষে এমনকি বড় মেয়েরাও এল, যদিও গর্বের সাথে একধারে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

হাঁটু গেড়ে বসে আগুনে ফুঁ দেওয়ার সময় ওদের উদ্দেশে ইশারা করল নওয়াব। ‘এসো রাজকন্যারা, তোমাদের চালাকিতে কাজ হবে না। জানি, তোমরাও খেতে চাও।’

শুকনো রুটিতে বাদামি স্ফটিকায়িত সিরাপ ঢেলে খেতে শুরু করল ওরা। খানিক পরে নওয়াব ওর মটরসাইকেলের কাছে এসে ক্যারিয়ার থেকে আরেক টুকরো গুড় খসিয়ে নিল, মেয়েদের চ্যালেঞ্জ করল কে সবচেয়ে বেশি খেতে পারবে।

* * *

ওর পরিবারের ছোট গুড়-উৎসবের কয়েক সপ্তাহ পর এক সন্ধ্যায় নুরপুর হারুনির শস্যগুদামের পাহারাদারের সাথে বসে ছিল নওয়াব। মাত্র তিরিশ বছর আগে মাড়াইখানার কিনারা বরাবর লাগানো বটগাছটা চল্লিশ বা পঞ্চাশ ফুট ব্যাসের সামিয়ানা তৈরি করেছে, দোকানে যারা কাজ করে তাদের সবাই যত্নের সাথে ওটার দেখভাল করে, ক্যানে করে পানি দেয়। বুড়ো পাহারাদার গাছের নিচে বসে থাকে, নওয়াব ও অন্য তরুণরা গোধূলিতে ওর সাথে এসে বসে, ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে, ক্ষেপানোর চেষ্টা করে ওকে, পরস্পরের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করতে থাকে। বুড়োর মুখে গল্প শোনে ওরা, যখন কেবল মেঠোপথ এইসব নদীর মতো খাড়ির ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল

তখনকার কথা; গোত্রগুলো ফুর্তি করার জন্যে গরুমোষ চুরি করত, এ-কাজ করার সময় উত্তেজনা যোগ করতে একে অন্যকে খুন করত ।

বসন্তের আবহাওয়া এলেও পা গরম রাখতে ও ওখানে সমবেত দলটাকে একটা কেন্দ্র যোগাতে এখনও একটা টিনের প্যানে আগুন জ্বেলে রাখে পাহারাদার। ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেছে, প্রায়ই যেমন যায়, আকাশের বুক বেয়ে উঠে-আসা চাঁদটা পরোক্ষে দৃশ্যপট আলোকিত করে তুলেছে; চুনকাম-করা দেয়ালে ঠিকরে যাচ্ছে, চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যন্ত্রপাতির উপর ম্লান ছায়া ফেলছে: লাঙ্গল আর প্ল্যান্টারস, ড্র্যাগ, মই ।

'এই যে, বুড়োমিয়া,' পাহারাদারকে বলল নওয়াব। 'তোমাকে বেঁধে স্টোরে আটকে রাখব যাতে মনে হয় ডাকাতি, তারপর গ্যাসব্যারেলে আমার ট্যাংক কানায় কানায় ভরে নেব ।'

'এখানে আমার জন্যে কিছুই নেই,' বলল পাহারাদার। 'বিদেয় হও, মনে হয় তোমার বউয়ের ডাক শুনতে পাচ্ছি ।'

'বুঝতে পারছি, জনাব, তুমি একা থাকতে চাও ।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল নওয়াব, পাহারাদারের সাথে করমর্দন করল, সমীহের সাথে বুড়োর হাঁটু স্পর্শ করে মাথা নোয়াল ও, ঠিক যেভাবে সামন্ত কে.কে. হারুনির বেলায় করে–পুরনো রসিকতা, গত দশ বছর পাহারাদারকে আর মজা দিতে পারছে না ।

'সাবধান, বাছা,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল পাহারাদার, ডগায় লোহার ঢিপি-পরানো ছড়ির উপর ভর দিল সে ।

মটরসাইকেলের কিক স্টার্টারের উপর লাফিয়ে উঠল নওয়াব, একটা মসৃণ স্পর্শে বাতি জ্বালল, তারপর মাড়াইখানার গেট দিয়ে ঝড়ের মতো বের হয়ে খামারের কেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে রাস্তায় উঠে-আসা পোয়ামাইল ড্রাইভওয়েতে চলে এল। ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, ভালো লাগছে, জানে, বাড়িতে ঘরগুলো গরম থাকবে, বসন্তকাল এসে গেলেও চোরাই ইলেক্ট্রিসিটিতে দিন-রাত চলতে থাকা দুই বারের হিটারে পরিবার বাড়তি উষ্ণতায় বিলাসিতা করছে। অন্ধকার মূল সড়কে বাঁক নিয়ে গতি বাড়াল ও, দুর্বল হেডলাইটের ওপর চাপ পড়ল, প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেয়ে দ্রুততার সাথে হাজির হচ্ছে বাধাগুলো, মনে হচ্ছে একটা চলন্ত লণ্ঠনের আগুনের ভেতর দ্রুত ছুটে চলেছে ও। রাস্তার উপর বসে থাকা মথ-শিকারি নাইটজারগুলো অন্ধকারে আওয়াজ করছে, ওর চাকার নিচে পড়ার দশা হচ্ছে প্রায়। খানাখন্দের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবার সময় হাত শক্ত করে ফেলছে নওয়াব, বাইক নিয়ে যুদ্ধ করছে, পেগের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে গতি উপভোগ করছে। নিচু জমির ভেতর, যেখানে আখগাছে প্রচুর পরিমাণ পানি দেওয়া হয়েছে, কুয়াশা জমেছে, শীতল হাওয়া ঘিরে ধরল ওকে। গতি কমাল ও, খালের পাশ

দিয়ে চলে যাওয়া একটা ছোট রাস্তায় বাঁক নিল, খালের মাথার বাঁধের উপর দিয়ে জল গড়ানোর আওয়াজ পাচ্ছে।

একটা বাঁধের পাশ থেকে এগিয়ে এল এক লোক, জমিনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নওয়াবকে থামার ইশারা করছে।

'ভাইজান,' এঞ্জিনের ভটভট আওয়াজ ছাপিয়ে বলল লোকটা। 'আমাকে একটু শহরে পৌঁছে দাও। একটা কাজ ছিল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

এত রাতে কী আজব কাজ কে জানে, ভাবল নওয়াব। মটরসাইকেলের পেছনের বাতি ওদের চারপাশে জমিনে লালচে আভা তৈরি করছে। বসতবাড়ি থেকে অনেক দূরে রয়েছে ওরা। মাইলখানেক দূরে রাস্তার ধারে ঘাপটি মেরে আছে দাশতিয়ান গ্রাম–এর আগে আর কিছুই নেই। লোকটার মুখের দিকে তাকাল ও।

'কোত্থেকে এসেছ?' সরাসরি ওর দিকে তাকাল লোকটা, তার চোখমুখ শক্ত হয়ে থাকায় বেশি ভার লাগছে, কিন্তু অটল।

'কাশমোর থেকে। গত এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের ভেতর তুমিই প্রথম এলে এদিকে। দয়া করো। সারাদিন হেঁটে মরেছি।'

কাশমোর, ভাবল নওয়াব। নদীর ওপারের হতদরিদ্র এলাকা থেকে এসেছে। প্রতি বছর এই গোত্রগুলো নুরপুর হারুনি ও আশপাশের খামারের আম পাড়তে হাজির হয়; বলতে গেলে বিনে পয়সায় কাজ করে ওরা, মৌসুম শেষ হওয়ামাত্র বিদায় হয়ে যায়। মৌসুমের শেষের দিকে একটা ভোজের আয়োজন করে পুরুষরা, ছোটখাট ভোজ, একশো জন বা তারও বেশি ভাগাভাগি করে মোষ কেনে একটা। একবার তাতে যোগ দিয়েছিল নওয়াব, ওর সাথে এমন আচরণ করেছে ওরা যেন একসাথে বসে বিক্ষিপ্ত মাংস-ছিটানো লোনা ভাত খেয়ে ওদের ধন্য করেছে ও।

লোকটার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল ও, চিবুক নেড়ে পেছনের সিটের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ঠিক আছে তবে, পেছনে উঠে পড়ো।'

পেছনের ওজনের সাথে টাল সামলে খানাখন্দে ভরা খাল-পথ ধরে মটরসাইকেল চালানো আরও কঠিন হয়ে পড়ল। রোজউড গাছের নিচ দিয়ে এগিয়ে চলল নওয়াব।

* * *

খালের মাথা থেকে আধামাইলটাক আগে বাড়ার পর নওয়াবের কানের কাছে চিৎকার করে উঠল লোকটা, 'থাম!'

'কী সমস্যা?' প্রবল হাওয়ার কারণে শুনতে পায়নি নওয়াব।

ওর পাঁজরে কী যেন ঠেসে ধরল লোকটা।

'আমার কাছে বন্দুক আছে। গুলি করে দেব।'

সন্ত্রস্ত নওয়াব পিছলে ব্রেক কষে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে, মোটরসাইকেলটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল কাছ থেকে, ফলে উল্টে গেল ওটা, জমিনে

আছড়ে পড়ে গেল ডাকাত। কার্বুরেটর ফ্লোট খুলে গেল হাঁ করে, মিনিটখানেক প্রবল গর্জনে চলল এঞ্জিন, চাকা লাফাতে লাগল, তারপর একসময় ঘরঘর করে থেমে গেল এঞ্জিনটা, হেডলাইট নিভে গেল ।

'করছ কী?' হড়বড় করে বলে উঠল নওয়াব।

'উঠে না দাঁড়ালে গুলি করব কিন্তু,' এক হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসে বলল ডাকাত, বন্দুকটা নওয়াবের দিকে তাক করে রেখেছে।

আকস্মিক নেমে আসা পশমি অন্ধকারে উল্টে-পড়া মোটরসাইকেলের পাশে আবছা অবয়বের মতো দাঁড়িয়ে রইল ওরা, পায়ের কাছে উৎকট গন্ধের গ্যাসোলিন উগড়ে দিচ্ছে ওটা। ওদের পাশে নালার ভেতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে, মৃদু গরগর আওয়াজ তুলছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে নওয়াব লক্ষ করল হাতের তালুর একটা ক্ষত চাটছে লোকটা, বন্দুকটা রয়েছে অন্য হাতে।

লোকটা বাইক ওঠানোর জন্যে আগে বাড়তেই তার দিকে এক কদম এগোল নওয়াব।

'বললাম না, গুলি করে দেব।'

অনুরোধের ঢঙে দুই হাত জোড় করল নওয়াব। 'তোমাকে মিনতি করছি, ছোট ছোট মেয়ে আছে আমার, তেরটি মেয়ে। সত্যি বলছি, তের জন। তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আমি। তোমাকে ফিরোজায় পৌঁছে দেব। কাউকে কিছু বলব না। বাইকটা নিয়ে যেয়ো না—এটাই আমার রুটি-রুজির উপায়। আমি তোমার মতোই একজন মানুষ, তোমার মতোই গরিব।'

'চোপ রাও।'

কিছু না ভেবেই চোখে ধূর্ত বুদ্ধির একটা ঝলক নিয়ে বন্দুকের দিকে লাফ দিল নওয়াব, ব্যর্থ হল। মুহূর্তের জন্যে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল ওরা, অবশেষে আলগা হয়ে সরে দাঁড়াল ডাকাত, পিছিয়ে গিয়েই গুলি করল। দুই হাতে দুই উরুর মাঝখানটা চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল নওয়াব, নিদারুণ বিস্মিত, এমন অবাক হয়েছে যেন লোকটা ওকে বিনা কারণে চড় কষেছে।

বাইকটা টেনে সরিয়ে নিয়ে তাতে উঠে বসে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল লোকটা, লেভারের উপর শরীরের ভর ছেড়ে দিয়ে উপর-নিচে ওঠানামা করছে; কিন্তু ঘরঘর করলেও চালু হল না এঞ্জিন। তেলে ভেসে গেছে ওটা। থ্রটল পুরো খুলে দিয়েছিল লোকটা, ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। গুলির শব্দে দাশতিয়ানের কুকুরের দল ডাক ছাড়তে শুরু করেছে, থেকে থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে সেই আওয়াজ।

জমিনে পড়ে-থাকা অবস্থায় নওয়াবের প্রথমে মনে হয়েছিল লোকটা ওকে মেরে ফেলেছে। রোজউড গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা-যাওয়া ফিকে চাঁদের আলোয় আলোকিত আকাশ গামলাভর্তি দোল খাওয়া জলের মতো এপাশ ওপাশ দুলছে। পড়ার সময় একটা পা শরীরের নিচে বেঁকে আটকে গেছে ওর। সোজা করে নিল সেটা।

ক্ষতস্থান স্পর্শ করতেই আঠালো ঠেকল হাতটা। 'হায় খোদা, মারে, আল্লারে,' মৃদু কিছুটা বিলাপের সুরে গুঙিয়ে উঠল ও। লোকটার দিকে তাকাল ও, ওর দিকে পেছন ফিরে আছে; আক্রমণযোগ্য। পাগলের মতো পা হাঁকাচ্ছে স্টার্টারে। বড়জোর ছয় ফুট দূরে হবে। ব্যাটাকে ওটা নিয়ে যেতে দিতে পারে না নওয়াব–ওই বাইক নয়, ওর মুক্তি।

ফের উঠে টলমল পায়ে আগে বাড়ল ও, কিন্তু আহত পা তাল হারাল, পড়ে গেল ও। মোটরসাইকেলের পেছনের বাম্পারে বাড়ি খেল ওর কপাল। বন্দুক বাড়িয়ে পেছনে ফিরে আরও পাঁচবার গুলি করল ডাকাত, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ; ওর মুখের দিকে অবিশ্বাসভরা চোখে তাকিয়ে রইল নওয়াব, রিভলভারের মুখে বারবার অগ্নিশিখার ঝলক দেখতে পেল। লোকটা কোনওদিন অস্ত্র চালায়নি। এক চোরাইকারবারীর কাছ থেকে কেনার চেষ্টা করার সময় লাইসেন্সবিহীন এই রিভলভারটা মাত্র একবার ব্যবহার করেছে। শরীর বা মাথা বরাবর নিশানা করতে পারছে না, কোমর ও পায়ে গুলি করে চলেছে। অনেক দূর দিয়ে চলে গেল শেষ দুটো বুলেট, রাস্তার ধূলি ছিটাল। মোটরসাইকেলটা গড়িয়ে বিশ ফুট সামনে নিয়ে গেল ডাকাত, হাঁপাচ্ছে। ফের স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল। দাশতিয়ানের দিক থেকে একটা মশাল রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। বাইকটা মাটির উপর ফেলে ক্ষেত ঘিরে রাখা এক সার আগাছার দিকে ছুটে গেল লোকটা।

রাস্তার উপর শুয়ে রইল নবাব, নড়তে চাইছে না। বুলেটগুলো আঘাত করার সময় বেশি লাগেনি, হুলের ঘাইয়ের মতো মনে হয়েছে; কিন্তু এখন ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে যন্ত্রণা। প্যান্টে উষ্ণ লাগছে রক্ত। চারদিক দারুণ সুনসান ঠেকছে। অনেক দূরে কুকুরের দল ডেকেই চলেছে। চারপাশে ডাকছে ঝিঁঝিপোকার দল। এত বেশি যে, সব মিলে একটা মাত্র শব্দে পরিণত হয়েছে। নালার ওপাশে একটা আমবাগানে কিছু কাক ডাকতে শুরু করল। ওরা রাতে ডাকছে কেন, বোঝার চেষ্টা করল ও। হয়তো গাছের উপর ওদের বাসায় সাপ ঢুকে পড়েছে। সিন্ধু নদের বসন্তের বানের টাটকা মাছ কেবল বাজারে এসেছে। মনে পড়ল, রাতের খাবারের জন্যে কিছু মাছ কেনার কথা ভেবেছিল ও, হয়তো কাল রাতে। ব্যথা আরও প্রবল হয়ে ওঠায় মাছ ভাজার গন্ধের কথা ভাবল ও।

গ্রাম থেকে দু'জন লোক দৌড়ে ছুটে এল, একজন অন্যজনের তুলনায় কমবয়সী। দু'জনই খোলা বুক। বয়স্ক ভূঁড়িঅলা একটা অনেক পুরনো সিঙ্গল ব্যারেল্ড শটগান নিয়ে এসেছে, ওটার বাট তার দিয়ে কোনওমতে আটকানো।

'হায় আল্লাহ, ওকে মেরে ফেলেছে। কে লোকটা?'

ওর দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কমবয়সী লোকটা। 'এ যে দেখছি নুরপুর হারুনির ইলেক্ট্রিশিয়ান নওয়াব।'

'আমি মরিনি,' মাথা না তুলেই জোরের সাথে বলল নওয়াব। এদের ও চেনে, বাপ আর ছেলে–ছেলের বিয়ের সময় আলোর যোগাড়যন্ত্র করেছিল ও। 'বেজন্মটা এই আগাছার ভেতরেই আছে।'

বন্দুকটা কাঁধের সাথে ধরে সাবধানে সামনে এগিয়ে গেল বাবা। একটা কিছু নড়ে উঠতেই গুলি করল। খোলা মাঠে লুটিয়ে পড়ল ডাকাত। চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মারে, বাঁচাও,' হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হল, কোমর ধরে রেখেছে হাতে। তার কাছে গিয়ে বন্দুকের বাট দিয়ে ঠিক পেটের মাঝখানে বাড়ি মারল বাবা, তারপর বন্দুক ফেলে কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে রাস্তায় নিয়ে এল তাকে। রক্তাক্ত শার্ট তুলতেই ডাকাতের পেটে আধা ডজন বাকশট লেগেছে দেখা গেল–টর্চের আলোয় কালো ক্ষুব্ধ ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে বের হয়ে আসছে। দুর্বলভাবে থুতু ফেলে চলেছে ডাকাত।

ছেলেটা উঠে গিয়ার দিয়ে মোটরসাইকেলটাকে টেনে রাস্তায় নিয়ে এল, যতক্ষণ-না এঞ্জিন জীবন্ত হয়ে উঠল। চিৎকার করে বাহনের ব্যবস্থা করার কথা বলে সবেগে চলে গেল সে। ছেলেটার তাড়াহুড়োয় ক্লাচে চাপ না দিয়েই গিয়ার-বদলানো আওয়াজ শুনে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল নওয়াব।

'সিগারেট লাগবে, চাচা?' একটা প্যাকেট বাড়িয়ে ধরে নওয়াবকে জিজ্ঞেস করল গ্রামবাসী।

সামনে-পেছনে মাথা নাড়ল নওয়াব। 'ধেৎ, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।'

নীরবতায় বিস্মৃত একটা ভাবনা খোঁচাতে লাগল নবাবকে। জরুরি কিছু। তারপর মনে পড়ে গেল।

'ব্যাটার রিভলভার খুঁজে বার করো, ভোলে। পুলিসের কাছে জমা দিতে হবে।'

'তোমাকে একা রেখে যেতে পারব না,' বলল লোকটা; কিন্তু খানিক বাদে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল।

বুড়ো তখনও আগাছায় তল্লাশি চালাচ্ছিল, এমন সময় খালের মাথায় পিকআপের হেডলাইট উদয় হল, রাস্তার উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। গোটা ঘটনার ব্যাপারে সন্দিহান ড্রাইভার বাপ-বেটা নওয়াব ও মটরসাইকেলটাকে ওটার পেছনে তোলার সময় একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। ফিরোজার একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে চলে এল ওরা। সামান্য একজন ফার্মাসিস্ট চালায় ওটা, তবে রূঢ় ও নিশ্চিত হাবভাব ও অল্প কিছু ওষুধেই সব রকম অসুখ-বিসুখ সারানোর সাফল্যের কারণে বিরাট খদ্দেরগোষ্ঠী রয়েছে তার।

* * *

ক্লিনিকে বীজাণুনাশক আর দৈহিক তরলের গন্ধে ভকভক করছে, ভারি টকটক একটা গন্ধ। একটা ফ্লুরোসেন্ট লাইটে ম্লান আলোকিত একটা কামরাতেই চারটা খাট রাখা। বাপ-বেটা ওকে ভেতরে নিয়ে যাবার সময় কষ্টের একটা পর্যায়ে সতর্ক দোমড়ানো চাদরে রক্তের ছোপ, মরচের মতো দাগ লক্ষ করল নওয়াব। ক্লিনিকের দোতলায় থাকে ফার্মাসিস্ট, লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরেই নেমে এসেছে। তাকে দেখে সম্পূর্ণ অবিচলিত ঠেকল; কিছু যদি হয়ও, সেটা বিরক্ত করার কারণে ক্ষিপ্ত।

'এই দুটো খাটে শুইয়ে দাও ওকে।'

'আস সালাম আলাইকুম, ডাক্তার সাহেব,' বলল নওয়াব, ওর মনে হল অনেক দূরের কারও সাথে কথা বলছে। ফার্মাসিস্টকে দেখে দারুণ গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ লোক মনে হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক কায়দায় তার সাথে কথা বলছে নওয়াব।

'কী হয়েছে, নওয়াব?'

'লোকটা আমার মটরবাইক ছিনতাই করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তা হতে দিইনি।'

নওয়াবের শালোয়ার টেনে খুলে ফেলল ফার্মাসিস্ট, একটা ন্যাকড়া নিয়ে রক্ত মুছল, তারপর বেশ কর্কশভাবে হাতড়াতে লাগল। এদিকে আর্তনাদ ঠেকাতে খাটের দু'পাশ শক্ত করে আঁকড়ে থাকল নওয়াব। 'বেঁচে যাবে,' বলল ফার্মাসিস্ট। 'ভাগ্যবান লোক তুমি। বুলেটগুলো অনেক নিচ দিয়ে গেছে।'

'ওটা কি...'

ন্যাকড়া দিয়ে চাপ দিল ফার্মাসিস্ট। 'তাও না, খোদার শুকরিয়া।'

ডাকাত ব্যাটা নিশ্চয়ই ওর ফুসফুসে গুলি করেছে, কারণ নিঃশ্বাসের সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'ওকে আর পুলিসের কাছে নিতে হবে না তোমাদের,' বলল ফার্মাসিস্ট। 'ব্যাটা মরা মানুষ।'

'প্লিজ,' মিনতি করল ডাকাত, ওঠার চেষ্টা করছে। 'দয়া করুন। আমাকে বাঁচান। আমিও তো মানুষ।'

পাশের ঘরে চলে গেল ফার্মাসিস্ট, প্যাডে ওষুধের নাম লিখে গ্রামবাসীর ছেলেটাকে পাশের রাস্তার এক ডিসপেন্সারে পাঠাল।

'ওকে ডেকে তুলে বলবে নওয়াবদিন ইলেক্ট্রিশিয়ানের জন্যে লাগবে ওষুধগুলো। বলবে ওর টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চিত করব আমি।'

প্রথমবারের মতো ডাকাতের দিকে তাকাল নওয়াব। বালিশের উপর রক্ত, বারবার নাক টানছে, যেন নাক ঝাড়ার দরকার হয়ে পড়েছে তার। সরু বেশ লম্বা গলাটা কাঁধের উপর বাঁকা হয়ে ঝুলছে, যেন জোড়া ছুটে গেছে। অল্পবয়সী ছেলে নয়, নওয়াব যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে বয়স্ক,

গাঢ় চামড়া, চোখজোড়া কোটরে বসে গেছে, ধূমপায়ীর হলদে উঁচু দাঁত, শ্বাস নেওয়ার জন্যে পাক খাওয়ার সময় বের হয়ে পড়ছে।

'জাহান্নামে যাও,' ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে বলল নওয়াব। 'তোমার মতো লোকেরা দোষ স্বীকারে ওস্তাদ। আমার বাচ্চাদের রাস্তায় ভিক্ষা করতে হত।'

শুয়ে রইল ডাকাত, হাঁপাচ্ছে, শরীরের পাশে হাত নাড়ছে। ফার্মাসিস্ট দূরে কোথাও গেছে মনে হচ্ছে।

'ওরা বলছে আমি মরতে বসেছি। আমার দোষ মাফ করে দাও। লাথিগুঁতো খেয়ে বড় হয়েছি, কোনও দিন ঠিকমতো খেতে পাইনি। আমার নিজের কিছু কখনওই ছিল না, না জমি, না বাড়ি বা বউ বা টাকা-পয়সা। কিছুই না, কোনওদিনই না। মুলতানের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বছরের পর বছর ঘুমিয়েছি। আমার মায়ের দোয়া পাবে। আমাকে একটু দোয়া করো, আমাকে বিনা ক্ষমায় মরতে দিয়ো না।' আরও জোরে কাশতে কাশতে নাক টানতে শুরু করল সে। তারপর হিক্কা তুলতে লাগল। বীজাণুনাশক নওয়াবের কাছে জোরালো ও ভালো লাগছে এখন। মেঝেয় যেন ঝিলিক মারছে, চারপাশের দুনিয়া প্রসারিত হয়ে গেছে।

'কক্ষণও না। তোমাকে আমি মাফ করব না। তোমার জীবন পেয়েছিলে। আমার নিজের জীবন ছিল। আগাগোড়া আমি ছিলাম ঠিক পথে, তুমি ভুল পথে। এবার নিজের দিকে একবার দেখ, তোমার ঠোঁটের কোণে রক্তের বুদ্বুদ উঠছে। মনে করো এটা বিচার নয়? আমার স্ত্রী আর বাচ্চারা সারাজীবন কাঁদত, আর তুমি কয়েক দান তাস খেলা আর কয়েক বোতল বিষ খাওয়ার জন্যে আমার মটরবাইকটা বিক্রি করে দিতে। এখানে শুয়ে না থাকলে এখনই নদীর ধারের কোনও একটা জুয়ার আসরে হাজির হতে।' লোকটা বলল, 'দয়া করো, দয়া করো,' প্রতিবার আগের চেয়ে ক্ষীণ; তারপর ছাদের দিকে তাকাল সে। 'এটা ঠিক না,' ফিসিফিস করে বলল সে। কয়েক মিনিট পরে খিঁচুনি খেয়ে মারা গেল। ততক্ষণে ফিরে-আসা ফার্মাসিস্ট নওয়াবের ক্ষত পরিষ্কার করছিল, তাকে সাহায্য করার জন্যে কিছুই করল না।

তারপরও নওয়াবের মনে ব্যাপারটা আটকে রইল, লোকটার কথা আর তার মৃত্যু, উজ্জ্বল কোনও জিনিস ঘিরে লাফাতে থাকা পাখির মতো, ঠোকরাতে চায়। তারপর আর ভাবতে গেল না ও। মটরসাইকেলের কথা ভাবল, রক্ষা পেয়েছে, ওটা রক্ষার গৌরবের কথা ভাবল। ছয়টা গুলি, ছয়টা কয়েন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, একটাও মারতে পারেনি ওকে– নওয়াবদিন ইলেক্ট্রিশিয়ানকে নয়।

সেলিম জাহান

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-চিন্তা: একালের নিরীখে

ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে স্ব-নির্ভর পল্লীসমাজ ছিল এ-ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। এ-ব্যবস্থার দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল : এক. এ সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের প্রয়োজন মেটাত এবং দুই. এ সমাজে গ্রামপতি ও গ্রামবাসীদের মধ্যকার সম্পর্কটি ছিল রক্ষণ ও আনুগত্যের। এ সমাজকাঠামো থেকে কয়েকটি জিনিস বেরিয়ে আসে, যেমন, এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবসায়িক বন্ধন ছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু সে বন্ধনকে ছাপিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে একটি আত্মীয়তার বন্ধন; এখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সম্পর্ক শোষণের ছিল না, বরং সেখানে শাসক শাসিতের স্বার্থ যথার্থভাবে রক্ষা করতেন এবং শাসিত শাসকের অনুগত ছিল, এখানে ধনের আধিক্য দ্বারা যেমন নেতৃত্ব লাভ করা যেত না, তেমনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণেও সম্পদের কোনো মুখ্য ভূমিকা ছিল না। ভারতীয় সমাজের এ রূপটিকেই রবীন্দ্রনাথ আদর্শস্থানীয় ও কাম্য বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাচেতনায় এ-জাতীয় একটি সমাজকাঠামোয় পৌঁছুনোর প্রয়োজনীয় কর্মধারা প্রাধান্য পেয়েছিল।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-চিন্তাচেতনার কয়েকটি দিক বেরিয়ে আসে। তাঁর দৃষ্টিতে, মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই এবং পল্লীসমাজের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয় ও প্রতিবেশী সম্পর্ক। একে সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে দিলে মানব-সম্বন্ধের মাধুর্য অন্য কোনো আধারে রক্ষা করা যাবে না, এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। মানুষের সঙ্গে মানুষের কিছু সম্পর্ক থাকে, যাকে বলা চলে প্রয়োজনের সম্পর্ক অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্ক। সেখানে একজন মানুষ অন্য মানুষের কাছে মূলত একটি কার্যসাধনের কল। আবার অন্য এক সম্বন্ধ আছে, যাতে প্রয়োজনও হয়তো মেটে। কিন্তু প্রয়োজনের বেশি কিছু পাওয়া যায়। মানুষে মানুষে এ দ্বিতীয় সম্বন্ধের ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজকে চিহ্নিত করেছেন এবং সে সমাজ মুখ্যত পল্লীসমাজ।

এ আত্মীয় বা প্রতিবেশী সমাজ একদিন এমন ছিল যে যখন এখানকার গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিরা, জমিদারশ্রেণী ও গ্রামপতিরা গ্রামত্যাগী হতেন না, পল্লীই ছিল তাঁদের

বাসস্থান। ধনীর ও পল্লীপতির একটি দায়িত্ব সেদিন ধর্মে স্বীকৃত ছিল; সে অনুশাসন সকলে সমানভাবে মানতেন, এমন নয়। তবু গ্রামসমাজে যাঁরা বিত্তবান, তাঁদের বিত্ত নানাপ্রকার দানের ভেতর দিয়ে সমাজের সেবায় নিযুক্ত হত। তাঁরাও সমাজের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্মান ও আনুগত্য পেতেন তাঁদের কর্মের কারণে, বিত্ত বা বৈভবের কারণে নয়। দেশের সমাজের অভ্যন্তরেই সে ব্যবস্থা ছিল, যার দ্বারা সমাজ নিয়ত রক্ষা পেত ও পুষ্ট হত।

এ-দেশের সমাজের গতিময়তা সম্পর্কে এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় ইতিহাসে চিরদিনই রাষ্ট্র ও সমাজ দুটো ভিন্নতর সত্তা ছিল, এখানে রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতির মধ্যে দূরত্ব ছিল, রাষ্ট্র সমাজকে গ্রাস করতে পারেনি। রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ চলেছে, এক রাজবংশের পতন ও অন্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটেছে, রাজধানীতে পালাবদল দেখা গেছে, বিদেশি নানা জাতি, নানা শক্তি সেখানে পর্যায়ক্রমে প্রভুত্ব করেছে, কিন্তু এসবই উপরতলার ইতিহাস, ভারতীয় সমাজ তথা পল্লীসমাজের সংগঠন ও সম্পর্ককে তা কোনোভাবেই বদলায়নি।

এ সমাজকাঠামোর সংগঠন ও সম্পর্কের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এ-সমাজের ক্রমাগত অনুন্নয়ন ও অবক্ষয়ের কারণ খুঁজেছেন। তিনটি কারণকে এ-ক্ষেত্রে মৌলিক করে তিনি চিহ্নিত করেছেন– সে কারণগুলো বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এর প্রথম কারণটি হচ্ছে বিদেশি বণিক ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্বনির্ভর পল্লীসমাজ বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে এ সমাজে উৎপাদনব্যবস্থার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর পরিবর্তে বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটানোর কাজে নিয়োজন, এ স্বনির্ভর সমাজের স্বনির্ভর রূপটুকু হারানো এবং এ সমাজ থেকে সম্পদের স্থানান্তর। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ ঘটছিল কিছু হাতে। এর দুটো ফলাফল দেখা গিয়েছিল। প্রথমত, আত্মীয় ও প্রতিবেশী সমাজে ব্যবসায়িক সম্পর্কটি বড় হয়ে উঠছিল এবং দ্বিতীয়ত, গ্রামপতি ও সাধারণ মানুষের সম্পর্কের আগেকার মানবিক ভিত্তি নষ্ট হয়ে তা ধনকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়াল। সেই সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণে রাজ্যপরিচালন কেন্দ্রগুলো নগরকেন্দ্রে পরিণত হল, যার পরিণতিতে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বণিকশক্তির একটি যোগাযোগ ঘটল। তৃতীয়ত, উপরোক্ত দুটো কারণে গ্রামের যাঁরা ধনবান ও বিদ্বান, তাঁরা হলেন নগরবাসী। গ্রামের উদ্বৃত্ত ধন আর গ্রামে নিযুক্ত রইল না, পুঞ্জীভূত হল শহরে। রবীন্দ্রনাথের মতে, এইখানেই গ্রামসমাজের দুর্দশার, অবক্ষয়ের ও অনুন্নয়নকে রোধ করে আত্মীয় ও প্রতিবেশী সমাজভিত্তিক স্বনির্ভর পল্লীসমাজ গড়ে তোলার মধ্যেই এ-দেশের উন্নতি নিহিত।

এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই তিনি পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পল্লীর প্রাঙ্গণ এবং স্থাপন করেছিলেন শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মতো প্রতিষ্ঠান। জীবনের ঠিক মধ্যবিন্দুতে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম

ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন শান্তিনিকেতন ও সুরুলের গ্রাম। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সংগঠন নিয়ে বীরভূমের ঐ পল্লী পরিবেশে চলল চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁর অক্লান্ত সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'পল্লী সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।' এ সঞ্জীবন কাজটি করতে গিয়ে তিনি একটি দীর্ঘমেয়াদি, স্থায়ী পরিকল্পনার রূপরেখা গভীরভাবে ভেবেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন-চিন্তা বিকাশের প্রথমদিকে তিনি মনে করতেন, যে স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান; ঐতিহাসিকভাবে তার রূপরেখা যে স্বনির্ভর পল্লীসমাজ এ-দেশে ছিল, ঠিক তার মতোই হবে। অর্থাৎ এ সমাজ মানুষে-মানুষে আত্মীয়তা ও প্রতিবেশী সম্পর্কভিত্তিক হবে এবং সেই সঙ্গে এ সমাজের নেতার সঙ্গে অনুগামীদের সম্পর্ক আমাদের পল্লীসমাজের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ-নিরপেক্ষ রক্ষণ-আনুগত্যভিত্তিক হবে। প্রথম বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি চিরকালই অভিন্ন মতপোষণ করতেন; সেটা তাঁর মানবতাবাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কিংবা মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনই তার মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য এ-জাতীয় একটি বিশ্বাসের কারণে হতে পারে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে প্রথমদিকে তাঁর ধারণা ঐতিহ্যগত ধারণা থেকে ভিন্ন ছিল না। তিনি নিজে পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটি মানবিক সম্বন্ধ থাকে।' যদিও সে গৌরবে প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় কি না, সেম্পর্কে কিছু বলেননি। প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' প্রবন্ধের জবাব দিতে গিয়ে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রজার স্বার্থ জমিদারের হাতে অত্যন্ত নিরাপদ, কারণ জমিদার প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে নীতিগতভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু খুব অল্পকালের মধ্যেই 'নেতা ও তার অনুগামীদের সঙ্গে এ-জাতীয় একটি সম্পর্ক দেয় পরিবর্তিত অবস্থায়ও সম্ভব'– এ বিভ্রান্তিটি খুব সম্ভবত তাঁর কেটে যায়। কারণ রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন যে ঐ রকম একটি সম্পর্কের জন্য জমিদার বা গ্রামপতিকে যথার্থ অর্থে ধার্মিক, নীতিবান, বদান্য, এককথায় কিছুটা অতিমানব হতে হবে, সেটা খুব সম্ভবত তাঁর নিজের মতো জমিদার ছাড়া অন্য সাধারণ জমিদারদের হওয়া ছিল অসম্ভব প্রায়। দ্বিতীয়ত, ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি এসেছিল যে, পল্লীসমাজে ধনী বা গ্রামপতিদের অবস্থিতি ও তাদের দান–দাক্ষিণ্যের দ্বারা পল্লীসমাজ একটি আত্মতোষণমূলক পর্যায়েই স্থবির হয়ে থাকবে, কিন্তু এ-জাতীয় দয়াদাক্ষিণ্যে গ্রামের দুর্দশাও দূর করা যাবে না, কিংবা পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের গতিময়তাও সৃষ্টি করা যাবে না,বরং এ-জাতীয় একটি ব্যবস্থার অবস্থিতির ফলে গ্রামবাসীরা তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই হাতে, একথা বিশ্বাস করার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং তারা কখনোই নিজেদের সমবেত শক্তির ওপর নির্ভর করবার জন্য প্রস্তুত হবে না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে এ-দেশের পল্লীসমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য একটি পথের দিকেই রবীন্দ্রনাথ দিকনির্দেশ করেছিলেন, সেটি হচ্ছে সমবায়ের পথ। গ্রামের মানুষের বাঁচবার

উপায় যে তাদেরই হাতে, সমবায় নীতির দ্বারা এ সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা প্রত্যেকের কর্তব্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সমবায় শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ একটা বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। পরিহাস করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কো-অপারেটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নিচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেয়ার বেশি কিছু এগোয় না।' রবীন্দ্রনাথের কাছে সমবায়ের পথ ছিল সত্যের পথ। সে সত্যকে তিনি দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। প্রথমত, সমবায়ই মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ও সম্মানবোধের জন্ম দিতে পারে। যে-কোনো উন্নয়নের জন্যেই সেসব গুণাবলির অবস্থিতি অপরিহার্য শর্ত। আত্মশক্তিতে একবার বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে বিচ্ছিন্নভাবে যারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল, তারাও নিজ শক্তিকে সমবেত করে এগিয়ে যাবার পথ তৈরি করে নেবে। দ্বিতীয়ত, সমবায়ের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত আত্মীয় বা প্রতিবেশী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। একদিকে এর মাধ্যমে যেমন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড, যথা : উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি সহযোগিতা ও যৌথ প্রয়াস সম্ভব, তেমনি অন্যদিকে এর মাধ্যমে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করা অসাধ্য নয়। কৃষ্টি হোক, স্বাস্থ্য হোক, আনন্দের উপায় হোক, সমস্যা সমাধানের জন্য মনের ভেতর মিলনের একটা ক্ষেত্র সমবায়ের মাধ্যমে করা যায়। সমবায় নীতিকে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের মূলনীতি হিসেবে দেখেছেন, কারণ মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে সমবায় একটি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সব রকমের ঐশ্বর্যের সৃষ্টি– এ-কথাটা রবীন্দ্রনাথ মানতেন। সুতরাং গ্রামীণ দারিদ্র্যের অবসান, গ্রামের মানুষকে স্বাধীনভাবে সমাজজীবনের দৃঢ়তর ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লীসমাজের উন্নতির একমাত্র উপায় হিসেবে সমবায়কে তিনি চিহ্নিত করেছেন।

তবে সমবায়কে রবীন্দ্রনাথ একটি আচার হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন একটি মতবাদ হিসেবে যার ভেতর থেকে বহু কর্মধারা সৃষ্টি হতে পারে, যার ভেতর কর্মের ও উদ্দেশ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বহু রূপভেদ সম্ভব। সমবায়ের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর, প্রতিবেশী সমাজভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ গড়ে তোলাই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল এবং এর জন্যে যে সমবায়ের রূপরেখা তিনি দিয়েছিলেন, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল :

ক. দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সবরকমের প্রয়োজন সাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। কতকগুলো পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী গড়ে উঠবে।

খ. প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রধান গ্রামের সব কাজের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলবেন, যাতে মণ্ডলীগুলোই স্বায়ত্তশাসনের স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

গ. নিজের পাঠশালা, শিল্প শিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রত্যেক মণ্ডলীকে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক

মণ্ডলীর একটি করে সাধারণ মণ্ডল থাকবে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।'

ঘ. জোতদার ও রায়তকে জোট বাঁধতে হবে এবং কৃষিক্ষেত্রে এক-একটা মণ্ডলী বা এক-একটা গ্রামের সকলকে একত্র হয়ে নিজেদের সব জমি একত্রে মিলিয়ে দিয়ে চাষবাস করতে হবে। এতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হওয়ায় উৎপাদনশীলতা বাড়বে ও উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যয় দক্ষ হবে।

ঙ. শিল্পক্ষেত্রে ও সমবায় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্প স্থাপন, তাতে কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও লভ্যাংশ বণ্টন করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে সেই সব শিল্পই স্থাপন করতে হবে, যা পল্লীর মানুষের সর্ব অর্থে উন্নতি সাধন করবে।

চ. গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাতে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হয়, তাদের স্বাস্থ্য যাতে সুরক্ষিত হয়, তাদের জীবনপ্রণালী যাতে মানুষের মতো হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

এই পুরো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়, যেমন, এর সাফল্যের পূর্বশর্ত কী, পল্লীসমাজ উন্নয়নে নগরকেন্দ্রের ভূমিকা কী হবে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ কী-জাতীয় হবে, বৃহৎ শিল্প ও প্রযুক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের সহাবস্থানের রূপরেখা কী হবে ইত্যাদি। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রাম-উন্নয়নের পরিকল্পনার পাশাপাশি এসব প্রশ্নের অত্যন্ত যুক্তিবহ ও ব্যবহারিক উত্তর দিয়ে গেছেন, যে উত্তরগুলো তাঁর পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সম্পূরক বলে বিবেচিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের কয়েকটি পূর্বশর্ত তিনি চিহ্নিত করে গেছেন। যেমন প্রথমত, তাঁর মতে, এর জন্যে প্রয়োজন হবে বুদ্ধির সাহস ও জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হবে ব্যবহারিক জ্ঞান– শুধু পুঁথিগত বিদ্যে নয়, চিন্তার বিস্তার ও সাধারণ মানুষের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের কলেজে যারা ইকনমিক্স্, এথ্নোলজি পড়ে, তারা অপেক্ষা করে থাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতের– পাশের গ্রামের লোকের আচার-বিচার বিধিব্যবস্থা জানার জন্যে।' তিনি আরও বলেছেন, 'আমাদের দেশে আমরা পরবাসী, অর্থাৎ আমাদের জাতের অধিকাংশের দেশ নয়। সে দেশে আমাদের অদৃশ্য, অস্পৃশ্য।' দ্বিতীয়ত, এর জন্যে প্রয়োজন হবে নিজস্ব চেষ্টার ওপর নির্ভরতা ও সব রকমের পরনির্ভরতা কমানো। রবীন্দ্রনাথের মতে, এর জন্যে শিক্ষিত সমাজকে, যুবসমাজকে গ্রামের ভার গ্রহণ করে তাকে ব্যবস্থাবদ্ধ করতে হবে। এটা করার জন্যে একটি কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যে, তাদের প্রস্তুত করার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাবও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, জনগণের সরকার-নির্ভরতা কমাতে হবে। তাঁর মতে,

মধ্যবিত্তসহ সাধারণ ভারতবাসী ক্রমেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। এতেই সাধারণ মানুষের আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস ও সম্মানবোধ সবই নষ্ট হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সরকার-বাহাদুর নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়াতেই আমরা নিজের দেশকে যথার্থভাবে হারাই।' এর কারণ রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। যার কারণেই রবীন্দ্রনাথ 'রাষ্ট্রতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রের' মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র নামীয় একটি হৃদয়হীন যন্ত্রের হাতে সমাজ উন্নয়নকে ছেড়ে দেয়া যায় না। তৃতীয়ত, এর সাফল্যের জন্যে পল্লীসমাজে তিনটে বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে– শিক্ষা, কৃষি ও যন্ত্র। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের দ্বারা ও উন্নতর প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

আমাদের দেশে যেভাবে নগর গড়ে উঠেছে, তাতে নগরে যোগ হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বণিক শক্তির; রাষ্ট্রযন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের মধ্যে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল আমাদের গ্রামগুলো। নগরগুলো আমাদের দেশের শক্তির ক্ষেত্র। কিন্তু গ্রামগুলো প্রাণের ক্ষেত্র– এ-কথা বলে রবীন্দ্রনাথ এ সমাজে নগর ও গ্রামের অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন। নগরের সে শক্তির উৎসমন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতা ও বাণিজ্য। নগর তাই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, গ্রামের সহযোগিতাবৃত্তি সেখানে যথোচিত উৎসাহ পায় না। নগর তার শক্তির দাপটে গ্রামকে শোষণ করেছে দীর্ঘকাল ধরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীভিত্তিক সমাজ পরিকল্পনায় নগরের একটি স্বাভাবিক স্থান চিহ্নিত করেছেন। সার্বিক সমাজের মূল ভিত্তি হবে স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম, যার আর্থিক উন্নয়নের পথ তৈরি হবে বিজ্ঞান ও সমবায়কে ভিত্তি করে। গ্রামের সঙ্গে যোগ থাকবে শহরের, কিন্তু সে যোগ হবে না আধিপত্য ও অধীনতার, শোষক ও শোষিতের। সে যোগের ভেতর দিয়ে অবিরত চেষ্টা বলবে এক নতুন সমন্বয়ের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'নগর আপন নাগরিকতার অভিমান সত্ত্বেও গ্রামগুলোর সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করবে। কতকটা যেন বড়ো ঘরের সদর-অন্দরের মতো। সদরে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর বেশি বটে, কিন্তু আরাম ও অবকাশ অন্দরে; উভয়ের মধ্যে হৃদয় সম্বন্ধের পথ খোলা।' সেই সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলেছেন যে, 'আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করিনে যে, গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সে রকম সংস্কার যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত।' রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন স্বনির্ভর পল্লীসমাজের ওপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে বাইরের জগতের সঙ্গে দেবার ও নেবার পথ উন্মুক্ত রাখবার আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেছেন। যোগাযোগের মূলসূত্র রবীন্দ্রনাথের মতে হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত ও বিশ্বের মধ্যে একটা অবারিত আতিথ্যের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

প্রথম জীবনে বৃহৎ যন্ত্র, বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে বৃহৎ যন্ত্র ও শিল্প এমন এক সমাজ তৈরি করে, যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় নগরে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শাসনযন্ত্রে। এতে মানবিক সম্পর্ক গুঁড়িয়ে যায় এবং মানুষ নিজেই হয়ে যায় একটা যন্ত্র বা যন্ত্রের দাস। কিন্তু গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পরে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তিকে বাদ দিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব নয়, উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তি তাঁর স্বনির্ভর পল্লীসমাজের চিন্তার সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক নয়। তাই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যে যখন তিনি সমবায়ের কথা বলেছেন, তখন সমবায়ভিত্তিক কৃষি ও শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শিক্ষা ও ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখও তিনি করেছেন। বৃহৎ শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তির গুরুত্ব তিনি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের পরে। বাংলাদেশের মন ও অঙ্গ যন্ত্র-ব্যবহারে মূঢ় বলেই আমাদের দুর্দশা– এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। আমাদের দেশের তাঁতিরা যে উন্নত প্রযুক্তির অভাবে উৎপাদনশীলতা না বাড়াতে পারার কারণে মরেছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং যথার্থ প্রযুক্তিশিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মাধ্যমে মন ও মানসিকতা তৈরির গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। তবে প্রযুক্তি বিষয়ে তাঁর শেষ কথা হচ্ছে, 'আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে শুধু তার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করাটা মানুষের কর্তব্য নয়, বরং মনুষ্যত্বের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে নতুনভাবে নির্মাণ করাই জরুরি।'

শেষ যে কথাটি বলা প্রয়োজন, তা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সমবায়ী ছিলেন, সমাজতন্ত্রী নন। রাশিয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, 'অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি, এখানে তারাই একমাত্র' অথবা 'অসাম্য চলতে পারে না চিরদিন, কারণ অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে'। সেই সঙ্গে এটাও বলেছেন, 'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমতো ধরতে পেরেছে, তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদের মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না।' তবে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে রুশদের পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছেন এই বলে যে, 'মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনের দিকে নয়।' সুতরাং পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা মাঝামাঝি অবস্থা রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষাতেই, 'এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করি নে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই।' অর্থাৎ অর্থনীতির সকল ক্রিয়াকাণ্ডে সমবায় নীতি গ্রহণ। আসলে রবীন্দ্রনাথের মনমানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে খুব বেশি হলে মৌল মানবতাবাদী হওয়া (Radical Humanist) সম্ভব,

কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি ঐ পর্যন্তই বলতে পারেন, 'বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়, আমরা যেন ট্রস্‌টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারবো, কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো।' ঐ বক্তব্যকে মৌল মানবতাবোধসম্পন্ন একজন সমবায়ীর উক্তি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই একজন সমাজতন্ত্রীর উক্তি বলে মানা যায় না।

মূ ল্যা য় ন/ প্র ব ন্ধ

হা সা ন অ রি ন্দ ম

....

আহমদ ছফার প্রবন্ধ: অন্তর্গত দায়ভার

আমাদের ভাষায় যুক্তিবাদী নির্মোহ ভাবনার চর্চা খুব সুলভ নয়। লেখকেরা প্রায়ই কোনো না কোনো বিশেষ আবেগ কিংবা ভালোমানুষি দ্বারা প্রভাবিত হন। এই প্রেক্ষাপটে আহমদ ছফা (১৯৪৩–২০০১) বাঙালি পাঠকের বিস্ময়দৃষ্টি আর সমীহ আদায় করে নেন। তাঁর কর্ম ও জীবনযাপন হয়তো ছকে বাঁধা ছিল না বলে তাঁর পক্ষে মোহমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ ও প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, তিনি ভিন্নজাতের মানুষ ছিলেন বলেই সাধারণ শৃঙ্খলে নিজেকে বন্দি করেননি। তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থ বা গোষ্ঠীর নিকট দায়মুক্ত ছিলেন, ফলে চিত্তে ও চেতনায় মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে বৃহত্তর দায়বোধ লালন করতেন। তাঁর চিন্তাপ্রধান রচনা প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-উপন্যাসেও সেই দায়বোধ দুর্লক্ষ নয়।

সন্দেহ নেই, আহমদ ছফা সাহিত্যে সৌন্দর্যের অন্বেষণ করেছেন; তবে তিনি মুখ্যত 'শিল্পের জন্য শিল্প' ফলানো জাতের লেখক নন। তরুণ বয়স থেকেই প্রথা ভাঙবার সাহস ছিল তাঁর। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর বাংলা বিভাগে পড়েও সে বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি নেয়ার মায়া ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'যদ্যপি

আমার গুরু'-তে ছফার অভিযোগ-মেশানো কৈফিয়ত, 'খুব ভালো ছাত্র না হলেও আমার বুদ্ধি-বিবেচনা নিতান্ত তুচ্ছ পর্যায়ের ছিল না। মাতৃস্তন্যে শিশুর যেরকম অধিকার, শিক্ষকদের স্নেহের ওপরও ছাত্রদের সেরকম অধিকার থাকা উচিত। সেই স্নেহ আমি শিক্ষকদের কাছে পাইনি। তার পরিণতি হল এই যে আমি বাংলা বিভাগ ছেড়ে দিলাম এবং প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে বিএ পাস কোর্সে পাশ করলাম।'[১] পরে তিনি এমএ পাশ করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে, এবং তার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আঠারোশো থেকে আঠারোশো আটান্ন সাল পর্যন্ত বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ এবং বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি এবং রাজনীতিতে তার প্রভাব'[২] বিষয়ে পিএইচডি গবেষণার অনুমতি পান তিনি। রাষ্ট্রনীতি, জাতীয়তাবোধ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি একবারে তরুণ বয়স থেকেই বিশেষ সচেতন ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। প্রকৃত সত্যের কাছে যাওয়া ও তাকে অকপটে প্রকাশ করার একটি সহজাত তাড়না ছিল তাঁর ভেতর। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদসাহিত্য– সকল ক্ষেত্রেই আহমদ ছফা সচ্ছন্দে বিচরণ করলেও তাঁর প্রবন্ধসমূহ গভীর বোধ, বিশ্লেষণধর্মিতা, অকপট ভঙ্গি ও দূরদৃষ্টি গুণে বাংলাসাহিত্যের অনন্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ একজন চিন্তাশীল সাহসী প্রাবন্ধিক হিসেবেই মুখ্যত আহমদ ছফা বহুকাল এই জাতির প্রশংসা লাভ করে যাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। অবশ্য গল্প উপন্যাস বা অন্যান্য রচনাতেও তিনি মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীর প্রতি এক ধরনের দায়িত্ববোধের ছাপ রেখেছেন; সেখানে শাসকগোষ্ঠী, রাষ্ট্রযন্ত্র বা জনপ্রিয় সস্তা আবেগকে উপেক্ষা করবার এবং প্রয়োজনে বিপক্ষে দাঁড়াবার দৃঢ়তা তাঁর ছিল। প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের অন্যতম সংগঠক ছিলেন ছফা। জার্মান কবি গ্যেটের ফাউস্টের অনুবাদ এবং ব্রার্ট্রান্ড রাসেলের সংশয়ী রচনার তরজমা করে ছফা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও পরবর্তী পর্যায়ে অনুবাদকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। যিনি বাঙালি মুসলমানের পক্ষে মৌলিক চেতনা লালন করতেন তাঁর পক্ষে মুখ্যত একজন অনুবাদক পরিচয়ে পরিচিত হতে না-চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশের চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান যাঁরা তাঁদের মধ্যে দৃশ্যত দুটি ধারা লক্ষগোচর হয়। একদিকে বাঙালি মুসলমানের পশ্চাৎপদতার কথা মনে রেখে মুসলমান জাতি হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস, অন্যদিকে দেখা যায় রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথের উত্তরসূরী হিসেবে এ ভূখণ্ডের অধিবাসীর চেতনাগত অগ্রগতির শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা। প্রথম ধারার লেখকেরা প্রায়ই জাতিচেতনা দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। অন্যদিকে প্রগতিশীল ধারার অনেকেই বাঙালি মুসলমানের অন্তর্গত বেদনা-স্বপ্নের প্রতি সুবিচার না করে আঘাতের মাধ্যমে তাকে জাগাতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে আহমদ ছফা প্রায় নির্জন পথের পথিক, ক্ষেত্রবিশেষে পথের কারিগর তিনি। তিনি কিছুমাত্র সম্প্রদায়প্রীতি লালন বা প্রকাশ না করেও বাঙালি মুসলমানের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁকে বা তাঁর ভাবনা ও

প্রচেষ্টাকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ(১৮৬১-১৯০৭), শেখ আবদুর রহিম(১৮৫৯-১৯৩১), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী(১৮৭৫-১৯৫০), মীর মশাররফ হোসেন(১৮৪৭-১৯১২), কিংবা কাজী আবদুল ওদুদ(১৮৯৪-১৯৭০), আহমদ শরীফ(১৯২১-১৯৯৯) কারো সাথে মেলানো যায় না । তাঁর লেখা 'বাঙালী মুসলমানের মন' প্রবন্ধে তিনি উক্ত জনগোষ্ঠীর চেতনার গভীরে ঢুকে তাদের পশ্চাৎপদতা, আবেগ ও ব্যথাকে বুঝতে চেয়েছেন । এ প্রবন্ধে তিনি মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমান-সৃষ্ট সাহিত্যের দুর্বলতা ও তার কারণ চিহ্নিত করেন । তিনি মনে করেন, লোকশ্রুতি ও দূরকল্পনার ওপর নির্ভর করার কারণে পুথিসাহিত্য দুর্বল হয়েছে । ছফার দৃষ্টিতে, 'পুঁথিসাহিত্যে অগ্রসরমানতার চাইতে প্রতিক্রিয়ার জের অধিক । মনের হীনম্মন্যতাবোধ থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ।' তবে তাঁর দৃষ্টিতে আলাওল, দৌলত উজীরের কাব্য যথেষ্ট উৎকর্ষমণ্ডিত । এ প্রবন্ধে তিনি আরবি, ফার্সি ও উর্দু ভাষার প্রতি এক শ্রেণীর বাঙালির অন্ধ অযৌক্তিক অনুরাগের চিত্র ও তার ফলাফল চিহ্নিত করেছেন । এটি একটি জনপ্রিয় ধারণা যে ইংরেজ শাসনের কারণেই মুখ্যত বাঙালি মুসলমান দেড়শ-দু'শ বছর পিছিয়ে পড়ে । কিন্তু সে বিশ্বাসের সাথে ছফা অনেকটাই দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, 'মুসলমান জনগণের অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিকতর ভালো ছিল কি? নবাবী আমলেও এদেশীয় ফার্সি-জানা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হত, তাদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কত জন ছিলেন এবং কতজন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, এসকল বিষয় বিচার করে দেখেন না বলেই অতি সহজে অপবাদের বোঝাটি ইংরেজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা দায়িত্বমুক্ত মনে করেন ।' বাংলাভাষার প্রথম সফল ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে তিনি দেখেন মোহমুক্ত চোখে । তাই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, 'তিনি বাংলার অন্য মানুষদের চাইতে ভালোভাবে জানতেন যে বাঙালী মিশ্র জাতি । তাদের মধ্যে আর্য রক্তের ধারা খুবই ক্ষীণ । কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর চরিত্রে এক ধরনের আর্যামির ভড়ং দেখা যায় । এটা একটা প্রহেলিকা যা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোনোদিন মুক্ত হতে পারেননি ।' আমরা দেখেছি কাজী আবদুল ওদুদ, আহমদ শরীফ প্রমুখ বঙ্কিমকে অসাম্প্রদায়িক বলে প্রতিভাত করতে চেয়েছেন । কিন্তু এক্ষত্রে আহমদ ছফা তাঁদের অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করতে পারেননি ।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কাছের মানুষ– একথাই সচরাচর বলা হয়ে থাকে, ধারণাটি জনপ্রিয়ও বটে । তবে রবীন্দ্রনাথকে আহমদ ছফা একেবারে নিজের দৃষ্টিতে অবলোকনের চেষ্টা করেছেন । তাই তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-সাধনার প্রতি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি ফেললে ক্রমশ মনে এ বিশ্বাস সঞ্চারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দূরের মানুষ ।' বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে আপন করতে, তাঁকে জানতে সাধনা শ্রম ও নিষ্ঠা আবশ্যক । 'আজীবন সুন্দরের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দুর্মর প্রচেষ্টারই তো নাম রবীন্দ্রনাথ । এ বিষয়ে তার ঐকান্তিকতা ধর্মপ্রচারকের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না ।' আহমদ ছফা মনে করেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা যথাযথ হতে পারে

তখনই যদি কৈশোর থেকে তাঁর মানসগঠনের দিকে স্মরণ রাখা হয়, বিশেষত তিনি ব্রাহ্ম ধর্মজাত একধরনের অধ্যাত্মবাদী পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বালক বয়স থেকেই। গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য প্রভৃতি কাব্যে তিনি যেন তাঁর পিতার মুখের কথাকেই ছন্দোবদ্ধ রূপে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন দেশের জীবনবীক্ষা তিনি আত্মস্থ করলেও রবীন্দ্র-চেতনায় ভারতীয় জীবনবোধই চিরকাল প্রকটিত ছিল।

আহমদ ছফা যে কৃত্রিম ভালোমানুষি বা কোনোপ্রকার ভাণের ধার দিয়েও যেতেন না রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনায় তা আরও স্পষ্ট হয়। বিশ্বকবিকে নিয়ে তাঁর অপর একটি প্রবন্ধ 'জীবিত থাকলে রবীন্দ্রনাথকেই জিজ্ঞেস করতাম'। এখানে তিনি অকপটেই একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, 'আমি মুসলমান চাষা-সম্প্রদায় থেকে আগত একজন মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে কিছু লেখেননি কেন?' মাত্র দু'পৃষ্ঠার এই রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রায় ডজনখনেক প্রশ্নসূচক বাক্য রচনা করেছেন। এসব প্রশ্ন নিঃসন্দেহে বিদ্বেষজাত নয়, একে স্নেহপরায়ণ অভিভাবকের প্রতি অভিমানপ্রসূত জিজ্ঞাসা মনে হয়। যাকে এত ভালোবেসেছেন তাঁর অবহেলা আর উপেক্ষা আবিষ্কার করে ছফার ভেতরকার অশ্রুপাত শেষে এরূপ স্পর্শকাতর প্রশ্নে রূপ নিয়েছে। আর আহমদ ছফা কোনোক্রমেই সেই অভিমান ঢেকে রাখবার মতো মানুষ ছিলেন না। তবে অনুমান করা যায়, প্রশ্ন উত্থাপন করে বিতর্ক সৃষ্টি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাই প্রবন্ধটি এত ক্ষুদ্র, আবশ্যকতার বাইরে তিনি এখানে একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি ।

এদেশের মানুষের আত্মমর্যাদা ও গৌরবের জায়গাগুলো নতুন ও নিজের মতো করে খুঁজে বের করে আহমদ ছফা সেখানে আলোক প্রক্ষেপণ করেছেন। সেই আলোয় ঝলকিত একটি নাম দীনেশচন্দ্র সেন(১৮৬৬-১৯৩৯)। দীনেশচন্দ্রের স্মরণ প্রসঙ্গে তিনি ইচ্ছে করেই বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ক বক্তব্য দিয়ে কথা শুরু করেছেন। পূর্ববঙ্গের মানুষ বলেই বঙ্কিমচন্দ্র দীনেশচন্দ্র সেনকে সাহিত্যের লোক হিসেবে সামান্যমাত্র গণ্য করেননি। আহমদ ছফার ভাষায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীনেশ সেনকে অপমান করার জন্য তাঁর কাছ থেকে শিল্প-সাহিত্য আলোচনার বদলে ধান-চাল এবং সোনামুগের দাম জানতে চেয়েছিলেন। দীনেশ বাবুকে তিনি ভাবের ভাবুক বলে মনে করতে পারেননি।' এই বঙ্গের মানুষ সম্পর্কে পশ্চিমের বহু লোকের যে উন্নাসিকতা, দীনেশচন্দ্র তার শিকার হয়েছেন এমনকি তাঁর পৌত্র সমর সেনের কাছ থেকেও। বঙ্কিম বা সমর সেদিন যে-দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করে থাকুন-না কেন দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একেবারে তুচ্ছ ব্যক্তি নন। বঙ্কিমের মতো শাস্ত্র বা ধর্ম নয়, মানুষই ছিল দীনেশচন্দ্রের উপজীব্য। 'বাঙলার পল্লীসমাজ, বাঙলার লোকসাহিত্য, বাঙলার লোকসংস্কৃতি– এ সমস্ত জিনিসকে তাঁর মতো এত হৃদয় দিয়ে কেউ গ্রহণ করেনি।' বঙ্কিমের হিন্দু জাতীয়তার বিপরীতে দীনেশ চেয়েছিলেন বাঙালিকে যথার্থ বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। ছফা মনে করেন বঙ্কিমের রাষ্ট্রচিন্তা অদূরদর্শী বলে

তা মরা জন্তুর দাঁতের মতো তা পড়ে থাকবে, পক্ষান্তরে 'দীনেশ বাবু যে পথে একটি রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ কামনা করেছিলেন সে-পন্থাটি অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক, অনেক বেশি মানবিক।' আহমদ ছফা দীনেশের প্রবন্ধ ও সম্পাদনা কর্মকাণ্ড ঘেঁটে এই মহান সত্য উদঘাটন করে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

জাতি হিসেবে আমাদের বড় দোষ ও বড় গুণ একটিই– তা হল আমরা ভয়াবহ রকম আবেগদুষ্ট। এটি আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার কারণ। এই আবেগ আমাদের দৃষ্টিকে প্রায়ই অস্বচ্ছ করে দেয়। ফলে যে-কোনো বিষয়েই খুব আমাদের কম মানুষের পক্ষেই যথাযোগ্য বা নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সাদাকে আমরা সবাই হয়তো সাদা, কালোকে না-হয় কালো বলি। কিন্তু সাদা আর কালো মিশিয়ে একটা ছেয়ে-জাতীয় রঙ তৈরি করলে আমাদের এক দল কালো আর একদল সাদা বলি, ছেয়ে বা অ্যাশ কেউ বলি না; যে বলে সে বড় নিঃসঙ্গ– দুই পক্ষই তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তেড়ে আসে তার দিকে। দুর্ভাগ্য, ছফা সেই নিঃসঙ্গ নির্মোহ লোক– যিনি জনতুষ্টির আশায় কিছু বলেন না, ফলে সত্য বলার অপরাধে শক্তিমান গোষ্ঠীগুলো তাকে প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে। আমাদের প্রধান লেখক বুদ্ধিজীবী ইতিহাসকারগণ মোহমুক্ত হতে পারেননি বলে মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদের সংখ্যা, যুদ্ধে ভারতের ভূমিকার তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রজন্মান্তরের নাগরিকের পক্ষে যথাযথ জ্ঞান লাভ অসম্ভব হয়েছে। অথচ এসব বিষয়ে আহমদ ছফা যেখানে যতখানি লিখেছেন তা মোহহীন বলে দ্বিপ্রহরের চৈত্রসূর্যের মতো দীপ্তিমান। প্রসঙ্গ তুলতে চাইছি তাঁর লেখা 'শেখ মুজিবুর রহমান' শীর্ষক প্রবন্ধটির। এখানে একদিকে ছফা বলেছেন, বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম কাব্য গীতাঞ্জলি, বলাকা কিংবা সোনার তরী নয়– সেই কাব্য–'আর দাবায়ে রাখবার পারবা না।' আবার সেই ছফার-ই উক্তি–'শেখ মুজিব সময়ের সন্তান, পিতা নন।', 'বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা কিংবা দূরদর্শিতা কখনো তার মধ্যে অধিক দেখা যায়নি। রাজনীতি বলতে ক্ষমতা, ক্ষমতা দখলের উপায়, এটুকু তালিম তিনি শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের কাছ থেকে ভালোভাবে পেয়েছেন। চোখের সামনে যা দেখা যায়, যা স্পর্শ করা যায়, তার বাইরে কোনোকিছুকে তলিয়ে দেখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা এবং অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি এ-দুটোই ছিল শেখ মুজিবের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।' তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে ছফার একটি উক্তি, 'উষ্ণহৃদয় মুজিব চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও বিরোধী দলের নেতার মতো বক্তৃতা দিতে পারেন এবং হয়তো মনে করেন, এখনো পর্যন্ত ভুখানাঙ্গা মানুষের মনে কণ্ঠস্বরের যাদুমন্ত্রে আশার আলো জ্বালিয়ে তুলতে পারবেন।'

শেখ মুজিবকে নিয়ে আহমদ ছফার অপর একটি প্রবন্ধ 'তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান'। এখানেও আগের মতোই তাঁর নির্মোহ দৃষ্টি সবল থেকেছে। তাই প্রবন্ধের প্রথম প্যারার প্রথম বাক্য: 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ' আর পরবর্তী অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য, 'বস্তুত শেখ মুজিব সমালোচনার

ঊর্ধ্বে কোনো ব্যক্তি নন।' তবে শেষ পর্যন্ত আহমদ ছফা নামক নির্মোহ মানুষটিকে আমরা খানিকটা আবেগতাড়িত হতে দেখি। এ আবেগ মহান পুরুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও বিস্ময়বোধ থেকে। তিনি দূরদৃষ্টির সাহায্যে শেখ মুজিবকে যেভাবে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক মানবস্বর্ণ রূপে প্রত্যক্ষ করেন তা নির্ভুল বলেই আমাদের বিশ্বাস–'দিনের পর দিন যাবে জনগণের অন্তর্লালিত এই শ্রদ্ধা ঘণীভূত হয়ে নিকষিত সোনার রূপ ধারণ করবে। হৃদয়ে চেপে বসবে, কেউ ঠেকাতে পারবে না।' উল্লেখ্য এই প্রবন্ধের উপসংহারটি আরও বেশি ভালোবাসায় সিক্ত। লক্ষণীয়, তিনি একবারও এখানে শেখ মুজিব নামের আগে বঙ্গবন্ধু বা জাতির পিতা ব্যবহার করেননি, কিন্তু যারা তা করছেন তাদের চেয়ে এই মহান বাঙালির প্রতি ছফার ভক্তিশ্রদ্ধা মোটেই কম ছিল না। তিনি ভাণ করতে কিংবা সুবিধা নিতে জানেন না বলে তার প্রকাশটা এমন চাঁছাছোলা।

আহমদ ছফার দৃষ্টিতে এদেশের কৃষকসমাজের সত্যিকার নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। তিনি ক্ষমতার মোহ নিয়ে রাজনীতি করেননি। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার্থে তিনি প্রয়োজনে তাঁর আদর্শের সঙ্গেও আপস করেছেন। ভাসানীর কোনো কোনো কর্মকাণ্ডে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে হতে পারে। বস্তুত কোনো মানুষই পুরোপুরি ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নন, কথাটি প্রযোজ্য ভাসানীর ক্ষেত্রেও। তাঁর ত্রুটিসমূহ ছিল সামাজিক বিচ্যুতির রাজনৈতিক রূপায়ণ। ছফার মতে দয়া, মমতা, সংবেদনশীলতা, আপসহীনতা সব মিলিয়ে ভাসানী যে মার্গের রাজনীতিবিদ কেবল শেখ মুজিবই হয়তো তাঁর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন।

আহমদ ছফার রচনার প্রধান উপজীব্য বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশের মানুষ। তিনি পলাশীর যুদ্ধ থেকে অদ্যাবধি বাঙালি জাতির অবস্থান নির্দেশ করেন 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধে। বস্তুত আমাদের রাষ্ট্র-চেতনা না থাকায় পলাশীর যুদ্ধে সাধারণ মানুষ ছিল নির্বিকার। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছফার দৃষ্টিতে এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। কারণ এই প্রথম জাতির সর্বস্তরের অধিকাংশ মানুষ একজোট হয়ে একটি স্বাধীন স্বদেশভূমি নির্মাণের জন্য লড়াই করেছে। তবে তিনি যৌক্তিকভাবেই দেখিয়েছেন কেবল ভাষাকে অবলম্বন করে একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হতে পারে না। এই সঙ্গে প্রয়োজন একটি অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার একটি ঐক্য। অন্যথায় কেবল ভাষার ওপর ভিত্তি করে যথার্থ জাতিরাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব নয়। ধর্ম-সংক্রান্ত বিভেদ আমাদের ঐক্য বিনষ্টির কারণ যেন না হতে পারে সেজন্য ছফা মনে করেন, 'শুধু আশি শতাংশ নয়, শতকরা একশ ভাগ মুসলমানও যদি এদেশে বসবাস করে থাকে তারপরেও আমাদেরকে একটি সেকুলার সমাজ, একটি সেকুলার রাষ্ট্র তৈরি করার চ্যালঞ্জটা গ্রহণ করতে হবে।' কিন্তু ধর্মপ্রাণ মধ্যযুগীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীকে সেকুলার সমাজ গঠনে আগ্রহী করে তুলবার মতো প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব আমরা পাইনি বলে আহমদ ছফা দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

বস্তুত এদেশের মানুষের যে-সব সংকট আহমদ ছফার চোখে পড়েছে তার কোনোটির বিষয়েই তিনি নিশ্চুপ-নির্বিকার থাকেননি বা থাকতে পারেননি। বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ ফারাক্কা বাঁধ বিষয়েও তিনি সরব হয়েছেন। এখানে তিনি ফারাক্কা সম্পর্কে সাধারণভাবে অজানা অনেক তথ্য তুলে ধরেন। ভারতের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র, আমাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকগণের নির্বিকারত্বকে সমালোচনা করেন তিনি। এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবন্ধের শেষে বাংলাদেশের জনগণের নিবিড় ঐক্য ও অধিকার-সচেতনতা আবশ্যক বলে লেখক মন্তব্য করেন। শক্তিশালী প্রতিবেশির সাথে আমাদের কূটনৈতিক পন্থাকে সমালোচনা করে খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক শব্দচয়নে তিনি লিখেছেন, "কেউ বলছেন, আমরা ব্যাঘ্র প্রতিবেশির সঙ্গে বসবাস করছি। বাঘকে 'বড় মামা' সম্বোধন করে তার মনে দয়া সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের আর করণীয় কিছু থাকতে পারে না। এগুলো কি মানুষের মতো কথা?"

আহমদ ছফা যেভাবে যতদিন ধরে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ করেছেন সে অভিজ্ঞতা মোটেই সুলভ নয়। একই কারণে ছাত্র-শিক্ষক বা রাজনৈতিক দল এই তিনের বাইরে থেকে তিনি সেখানকার অনাচার সম্পর্কে যে মূল্যায়ন তুলে ধরেন তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর *গাভীবিত্তান্ত* উপন্যাস ও *যদ্যপি আমার গুরু* শীর্ষক গদ্যগ্রন্থদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্যাটায়ারধর্মী উপন্যাস গাভীবিত্তান্তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র অনাচার ও উৎকেন্দ্রিকতাকে তুলে ধরেন, যেখানে তাঁর বিস্তৃত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা ও সাহসের ছাপ স্পষ্ট। যদ্যপি আমার গুরুকে বলা যায় আমাদের সাহিত্যের এক তুলনারহিত গ্রন্থ। রচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক হলেও এতে সমসাময়িক শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে ছফার নিজস্ব পর্যবেক্ষণও দুর্লক্ষ নয়। 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস: একটি রাজনৈতিক পাপ' প্রবন্ধে আহমদ ছফা আইয়ুব-মোনায়েমের সময় থেকে এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কীভাবে সন্ত্রাসের বীজ উপ্ত হল তা নির্দেশ করেন। দেশ স্বাধীনের পর সে সন্ত্রাস আমরা তো দূর করতে পারিইনি বরং তা আরও গভীর, বিস্তৃত ও মদমত্ত হয়ে উঠেছে। দেশ স্বাধীনের পর এই বিষয়টিকে ছফা একটি 'মারাত্মক ঘটনা' বলে অভিহিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে নিরুপদ্রব রাখতে শিক্ষকমহলের আন্তরিক বা সাহসী চেষ্টা নেই, পাশাপাশি কাজ করেছে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের স্বার্থতাড়িত দুরভিসন্ধি। শিক্ষাঙ্গনের এই চিররুগ্‌ণ অবস্থাকে সবাই মেনে নিয়ে যার যার মতো ফায়দা লুটে গিয়েছে। আহমদ ছফা মনে করেন, নেতৃবর্গের ধারণা সন্ত্রাস বন্ধ করলে দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার পথ হবে সুদূরপরাহত, আর আমাদের রাজনীতি তো পুরোপুরি ক্ষমতাকেন্দ্রিক। প্রচলিত ছাত্ররাজনীতিতে ন্যায়নীতি মেধা-মননের সামান্যতম চর্চা নেই। বরং সেখানে 'খারাপ কাজকে খারাপ কাজ বললে, খুনীকে খুনী বললে ঘাড়ের উপর মাথা টিকে থাকেবে এই

ভরসা খুবই কম।' যেহেতু রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের দ্বারা পরিস্থিতি উন্নতির কোনো আশাই নেই, তাই ছফা এখানে সাধারণ ছাত্রদের সামনে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার একটি দিক-নির্দেশনা দান করেন। প্রাক্তন ছাত্র, সাংবাদিক, বার কাউন্সিল এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের সহায়তায় তিনি সন্ত্রাস নির্মূলের যে ফরমুলা প্রদান করেন তার মর্ম এ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা অনুভব করে বাস্তবায়নের জন্য সাহস ও আন্তরিকতা দেখালে তাতে সাফল্য আসা অসম্ভব নয়।

'আমলাতন্ত্র নিজেরাই একটি পার্টি' প্রবন্ধে ছফা অল্পকথায় এদেশের আমলাতন্ত্রের একটি স্কেচ করেছেন। রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র দুর্বল হলে আমলাতন্ত্র ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, কারণ রাষ্ট্রের কাঠামোটি তাদের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ-প্রসঙ্গে আহমদ ছফার মন্তব্য, 'কাবাবে যেমন হাড্ডি, মাছে যেমন কাঁটা তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলার অবস্থান একটি তর্কাতীত সত্য। অস্থিতিশীল রাষ্ট্রসমূহে আমলাতন্ত্রই সর্বাধিক ক্ষমতার মালিক হয়ে থাকে। যার হাতে অধিক ক্ষমতা দুর্নীতি করার প্রবণতাও তার ততোধিক।' এদেশের সাধারণ মানুষ যেমন ন্যায়বিচার পায় না তেমনি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে একটি শ্রেণী থেকে যায় বিচারের ঊর্ধ্বে। কবিবন্ধু ফরহাদ মজহারের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে আহমদ ছফা লিখেছেন, 'জেলখানাতে কোনো সরকারি আমলার সঙ্গে ফরহাদের দেখা হয়নি। অর্থাৎ আমলারা এমন এক জাত যতই অপরাধ করুক তাদের জেলে যেতে হয় না। জবাবদিহি করতে হয় না।'

আহমদ ছফা বাংলাদেশকে বাঙালি সংস্কৃতির পীঠস্থানরূপে দেখতে চেয়েছেন। বহুবিধ কারণে এ বঙ্গের মানুষের যে পিছিয়ে-পড়া তা তিনি মানেন কিন্তু তাকেই চূড়ান্ত অবস্থা বলে গ্রহণ করতে রাজি নন। তাই তাদের গৌরবের জায়গাগুলো নির্দেশপূর্বক নিজের মতো করে সে-সব বিষয় মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি লালন, জীবনানন্দ, জসীমউদ্‌দীন, মানিক মিয়া, দীনেশ সেন, তিতাস একটি নদীর নাম, সুলতান, খোয়াবনামা, ভাসানী-মুজিবকে তাঁর লেখার উপজীব্য করতে আগ্রহী হন।

ছফা যেমন বাঙালিত্বের উজ্জীবন ও উৎকর্ষ প্রত্যাশা করেছেন তেমনি এ ভূখণ্ডের অধিবাসীর অধিকাংশের ধর্ম ইসলামকে আঘাত করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরং সেখান থেকে কল্যাণকর দিকগুলো জাতিগঠনের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে তিনি যেহেতু সাম্প্রদায়িক বোধ তিলমাত্র লালন করেন না, তাই এসব প্রসঙ্গ সরাসরি উল্লেখ করেন নি এবং সেখানে সাবধানতাও অবলম্বন করেছেন। তাঁর এরূপ মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক প্রবন্ধে। যেমন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের একজন বড় মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধের মাঝখানে আমি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতির নাম করতে পারলে খুশি হতাম। কে কিভাবে নেন এই ভয়ে খাজা মঈনুদ্দীনের গুণগ্রাম ব্যাখ্যান করা থেকে বিরত থাকলাম।' তিনি মাদ্রাসাশিক্ষার দীনতা নির্দেশ করলেও তার নির্মূল

চাননি। বরং আরবি-ফারসি শিক্ষা যেন আধুনিক ও কার্যকরী হয় সেই প্রস্তাবই তিনি করেন।

আহমদ ছফার নির্বাচিত প্রবন্ধের ভূমিকায় মোরশেদ শফিউল হাসান বলেছেন, 'তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মতো প্রবন্ধগুলোও সংবেদনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, চিন্তার ঐশ্বর্যে গরীয়ান। আমাদের এই ভূখণ্ডের গত অর্ধ-শতাব্দীর চিন্তা-চর্চার শ্রেষ্ঠ প্রসূন হিসেবে অভিহিত করা যায় আহমদ ছফার প্রবন্ধসমূহকে। যেমন তাঁর সমকালে, তেমনি আগামীতে, এমনকি যাঁরা হয়তো অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহমত নন তাঁদেরকেও, আমাদের সময় ও সমাজকে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের জন্য আহমদ ছফার প্রবন্ধের শরণাপন্ন হতে হবে।'[৩] ছফা সম্পর্কে এই বক্তব্যকে আমার কাছে সামান্যতম অত্যুক্তি বলে মনে হয়নি। আহমদ ছফা আমাদের পক্ষে কত গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্য বক্তব্যসম্ভার রেখে গিয়েছেন, তা পুরোপুরি উপলব্ধি করাও সময়সাপেক্ষ। দুর্ভাগ্য এই যে, যাদের সম্পর্কে জানলে ও জাতিকে জানালে আমাদের অন্ধকার-মুক্তি ত্বরান্বিত হয় এদেশের সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী সে দায়িত্ব নিতে অনীহ। ফলে ছফার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আলোচনায় আমরা নেই। এবারের বইমেলায় পর্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ করা গেল সস্তা বিনোদনমূলক লেখকদের নিয়েই মাতামাতি। দৈনিক ও গতানুগতিক ম্যাগাজিনগুলোও হয়তো তাদের ব্যবসার খাতিরে সেসব খ্যাতিলিপ্সুদের ধামাধরা হয়, তাদেরকে রঙিন করে প্রচ্ছদে আনে, সাক্ষাৎকার ছেপে কাটতি বাড়ায়, আবার এ ধারার লেখার পক্ষে ছাফাইও গায়। হয়তো আহমদ ছফার মতো লোকেদের বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝবার মতো জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবৃত্তি আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি, সাহিত্য এখনও এদেশের শিক্ষিত লোকের কাছে কার্যত বিনোদনের একটি উপায় রয়ে গিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১.আহমদ ছফা, *যদ্যপি আমার গুরু*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০৭, পৃ.১২।

২.প্রাগুক্ত, পৃ.১০।

৩.আহমদ ছফা, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ.৭। বর্তমান

প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহ এ গ্রন্থ থেকে গৃহীত ।

মো. নূরুল আমিন

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমম্ভাবনা

বাংলাদেশের অর্থনীতির বিশাল সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে পর্যটন শিল্প। পর্যটন শিল্পের বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা অনাবিস্কৃতই থেকে গেছে। কাজে লাগাতে পারছি না আমরা অর্থনীতির এই বিশাল সম্ভাবনাময় খাতকে। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাহাড়; বিশ্বের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর পর্যটন অর্থনীতির সম্ভাবনাকে আরো বেশি সম্ভাবনাময় করেছে। কুয়াকাটা, সুন্দরবন, বান্দরবান, রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটন অর্থনীতির আরেক সম্ভাবনা। প্রকৃতি বাংলাদেশকে পর্যটন শিল্পের যে অপার সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে তার সঠিক পরিচর্যা করে, আরো সুন্দর ভাবে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে পারলে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে। হতদরিদ্র গরিব দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে হাত পাততে হবে না। পর্যটকদেরকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক নিসর্গ উপভোগের সেবা দিয়ে হাজার হাজার কোটি ডলার আয় করে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে দাঁড়তে পারব। পর্যটন অর্থনীতি শক্তিতে বাংলাদেশ বিশ্ববাসীর কাছে নতুন পরিচয়ে এগিয়ে যাবে। পর্যটন শিল্পের বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্যে সরকারের নীতিমালা ও পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাইভেট সেক্টর দ্রুত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো এগিয়ে নিচ্ছে। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ করার মতো করে সাজাতে হলে প্রাইভেট সেক্টরকে সরকারের সহায়তা দিতে হবে। প্রাইভেট সেক্টরই আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, স্টুডিও এ্যাপার্টমেন্ট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক তৈরি করে পর্যটকদের পছন্দসই সেবা দিতে পারবে। সরকার নিজস্ব জমিতে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে সেখানেও প্রাইভেট সেক্টরকে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে নিতে পারে। প্রাইভেট সেক্টর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে যে উন্নয়ন কাজ করছে সেখানেও উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রাইভেট সেক্টর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে হোটেল, স্টুডিও এ্যাপার্টমেন্ট করতে চাইলে সরকার সেখানে সহায়তার হাত বাড়িয়ে পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে পারে। বিশ্বে পর্যটন নগরীগুলোকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলেছে

প্রাইভেট সেক্টর। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশেও পর্যটন নগরীকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রাইভেট সেক্টরকে দেয়া হলে বাংলাদেশ হবে আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রস্থল। দুবাই, থাইল্যান্ড সাগরের মাঝে অবকাঠামো তৈরি করে বিদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে হাজার হাজার ডলার আয় করছে। আমরা প্রকৃতির দেয়া বিশাল বিচ, প্রবাল দ্বীপ নিয়ে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব না এটি ঠিক নয়। কক্সবাজাররের মতো দীর্ঘ সৈকত, সেন্টমার্টিনের মতো প্রবাল দ্বীপ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং দুবাইয়ে থাকলে তারা এগুলোর আয় দিয়েই দেশ চালানোর উদ্যোগ নিত। আমাদেরও সময় এসেছে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগানোর। অনেক দেশ ষড়যন্ত্র করছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প যেন না দাঁড়ায়। আমি মনে করি, সরকার ও প্রাইভেট সেক্টরকে যৌথভাবে এ ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এতে সরকারের রাজস্ব বাড়বে। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুতভাবে চালানো যাবে। এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার ও কুয়াকাটাসহ সমুদ্র সৈকত-গুলোকে আমাদের সরকার যদি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন নগরী হিসেবে গড়ে তোলেন তাহলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশ পর্যটন বিশাল খাতে পরিণত হবে। বাংলাদেশের ন্যায় এশিয়ার আরো ছোট ছোট দেশ শুধু পর্যটন শিল্পকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে অর্থনীতিতে যেমন শক্তিশালী হয়েছে, তেমনি বিশ্বমানচিত্রে খ্যাতি অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। অথচ তাদের চেয়ে বাংলাদেশ বিশাল সমুদ্র সৈকতের অধিকারী হয়েও আমাদের সঠিক পরিকল্পনার অভাবে আমরা স্বাধীনতার পর থেকে ৪০ বছরেও সেখানে পৌঁছেতে পারিনি। তবে বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতে বিশাল সম্ভাবনা বিরাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার শুধু সমুদ্র সৈকতগুলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে বিশ্ব মানচিত্রে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারে। তখন আর আমাদের ভঙ্গুর অর্থনীতি সচল রাখতে বিদেশের সাহায্য লাগবে না। সরকার এবং দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ঐক্যমতের ভিত্তিতে সমুদ্র সৈকতগুলোকে যদি আধুনিক করে গড়ে তুলতে পারে তাহলে আমরা অদূর ভব্যিষ্যতে নয় বরং অতি নিকটতম ভবিষ্যতেই অর্থনীতিতে শক্তিশালী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। এশিয়ার মধ্যে নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও হংকং প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী নয়। কিন্তু তারা সুপরিকল্পিত কার্যকর পলিসি গ্রহণ করে তাদের পর্যটন খাত তথা সমুদ্র সৈকতগুলো অবিস্মরণীয় করে সারা বিশ্বের ধনীদের আকৃষ্ট করেছে। তারা একদিকে যেমন পরিচিতি লাভ করেছে তেমনি অর্থনীতিতে শীর্ষ পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের এত বিশাল সম্ভাবনার সমুদ্র সৈকত থাকার পরও আমরা যুগযুগ ধরে সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছি, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের সম্পদ কম, জনসংখ্যা বেশি। তাই আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর উত্তম ব্যবহার করা বর্তমানে অপরিহার্য। আমার দৃষ্টিতে আমাদের বিশাল পরিমাণ সমুদ্র সৈকত একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। শুধু সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে

আমাদের অযত্নে পড়ে থাকা সমুদ্র সৈকতগুলোকে আধুনিক এবং উন্নত করলে দেশের জন্য বিশাল লাভ হবে। আমার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ হল– সরকার শুধু সহযোগিতা করবে আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথা উদ্যোক্তারা এর পৃষ্ঠপোষকতা করবে। সরকার এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে যদি সমন্বয় এবং আন্তরিকতা থাকে তাহলে অতিদ্রুত দেশের সমুদ্র সৈকতগুলো বিশাল পরিমাণ বৈদেশিক আয়ের বড় ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশ এবং জনগণের স্বার্থে সরকারকে এর জন্য একটি সর্বজনসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করে তা দ্রুত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সরকারের যেমন প্রচুর রাজস্ব বাড়বে তেমন বেসরকারি খাতও আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তাই সমুদ্র সৈকতগুলোকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিশাল ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে, সমুদ্র সৈকত এলাকায় আধুনিক ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে; নিরাপত্তার নিশ্চয়তা শতভাগ রাখতে হবে, প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো নিশ্চিত বাস্তবায়ন করলে বেসরকারি উদ্যোক্তারাই অবহেলিত সমুদ্র সৈকত এলাকাগুলোকে মডার্ন করে গড়ে তুলবে। এতে করে নদী ভাঙ্গন স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে। দেশের ভূমির পরিমাণ বাড়তে থাকবে। সরকার যদি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে অত্যাধুনিক পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আমার হিসাবে বাংলাদেশ প্রতি বছর এই খাতের অর্জন দিয়ে পুরো দেশকে সুন্দর ও স্বাবলম্বী করে সাজাতে পারবে। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকত তখন বিশ্ব পরিমণ্ডলের লক্ষ কোটি ভ্রমণপিপাসুদের জন্য নজরকাড়া নগরীতে পরিণত হবে। এই বিশাল সমুদ্র সৈকতের আয়ের প্রধান আকর্ষণ শুধু বিদেশিরা হবে না, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের যে সমস্ত মাল্টিমিলিয়নিয়ার ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারাও তখন হালাল রুজির জন্য সৈকতে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে। আমাদের সম্পদ সীমিত হলেও আল্লাহর দেয়া অসীম সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক দৃশ্য আজ বিশ্বপরিসরে ব্যাপক আলোচিত। শুধু আমরা সৎ নিয়তে বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন করলে আমি উচ্চ কণ্ঠে বলতে পারি শুধু এই বিশাল সৈকতের আয় দিয়ে আরেকটি বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

কা বে রী গা য়ে ন

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ‘সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি’ ধারণা: একটি তত্ত্বীয় পর্যালোচনা

পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজে ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে গণসংস্কৃতি (Mass Culture) নিয়ে অধ্যয়নের প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। বিনোদন-শিল্পের (Entertainment Industry) উন্নতি, গণমাধ্যমের বিকাশ, নাৎসি এবং অন্যান্য স্বৈরশাসক কর্তৃক সংস্কৃতির অপব্যবহার, চলচ্চিত্র ও রেকর্ড-শিল্পে গ্ল্যামার ও চাকচিক্যের অপ্রতিরোধ্য প্রাদুর্ভাব– এসব কিছুর কারণে ‘পশ্চিমা মার্ক্সবাদ’ চর্চাকারীদের মধ্যে সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল ধারাগুলো মূল্যায়নের এই প্রয়োজনীয়তা ও প্রবণতার জন্ম হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২৩ সালে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত, পরবর্তী সময়ে ‘ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল’ নামে পরিচিত, ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ-এর প্রধান দুই তাত্ত্বিক থিওডর ডব্লিউ অ্যাডোরনো (Theodor W. Adorno) এবং ম্যাক্স হর্কহেইমার (Max Horkheimer) তাঁদের *The Dialectic of Enlightenment* গ্রন্থে (জার্মান সংস্করণ ১৯৪৪, ইংরেজি সংস্করণ ১৯৭২) পুঁজিবাদী সমাজে সংস্কৃতির ধরন ও গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যায় ‘সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি’ নামক ধারণাটি উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থে প্রকাশিত ‘The culture industry : enlightenment as mass deception’ প্রবন্ধটি সংস্কৃতি ইন্ড্রাস্ট্রি প্রসঙ্গে অ্যাডোরনো এবং হর্কহেইমারের বক্তব্যের ‘Classic Denunciation’ বলে বিবেচিত [Editor’s Introduction; During 1993: 29]। এই প্রবন্ধে অ্যাডোরনো এবং হর্কহেইমার বলেছেন, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যয়টি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরে, যা প্রকৃত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য লালন ও পালন করার ক্ষমতা হারিয়েছে, একই সঙ্গে হারিয়েছে অস্তিত্বের প্রকৃত অবস্থা উপস্থাপনের ক্ষমতা। তাঁদের মতে, সমাজের এই অক্ষমতার কারণ হল এই যে সংস্কৃতির ক্ষুদ্র কারিগরি পর্যায় (Artisanal stage), যা নির্ভরশীল ছিল ব্যক্তিগত প্রয়াসের ওপর, পুঁজি বিনিয়োগের ওপর নয়, এবং পুঁজি বিনিয়োগ হলেও তার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য, বিশাল শিল্পায়িত স্তরে (Industrial Stage) পর্যবসিত হয়েছে। তাঁরা দেখিয়েছেন, আধুনিক সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে নিরাপদ, প্রমিত মানসম্পন্ন পণ্য, যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৃহত্তর প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যাভিসারী। কাজটি করা হয় যতটা সম্ভব

প্রলুব্ধকররূপে এবং বাস্তবসম্মতভাবে জীবনের 'গড়চিত্র' তুলে ধরে, যার লক্ষ্য ছিল নিছক বিনোদন বা চিত্তবিক্ষেপ। এভাবে, হলিউড চলচ্চিত্র, রেডিও, গণহারে উৎপাদিত সাংবাদিকতা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মধ্যে যে পারস্পরিক পার্থক্য দেখা যায় তা শুধুই উপরিকাঠামোগত ব্যাপার (Super structural)। অধিকন্তু, তাঁদের মতে, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যয়টি এতটাই ফলপ্রসূ হয়েছে যে, 'শিল্প' ও 'জীবন' আর পুরোপুরি বিভাজ্য থাকে না– অর্থাৎ 'উচ্চ শিল্প' বলে যে একটি ব্যাপার আপাত লক্ষণীয়, যা গণসংস্কৃতির বিপরীতে অবশ্যই অবস্থান করে সংস্কৃতির সে দুটো রূপ অ্যাডোরনোর মতে, 'Two halves of a whole that do not add up' [Editor's Introduction, During 1993: 29]। এর অর্থ হল, সংস্কৃতির সামগ্রিক সত্তার পরস্পরবিরোধী দুই রূপ কখনোই অভিন্ন বিন্দুতে অস্তিত্ববান হতে পারে না।

বর্তমান নিবন্ধে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের উদ্ভব, সমাজ-ব্যক্তি-সংস্কৃতি অধ্যয়নে এর সামগ্রিক তাত্ত্বিক আবহের প্রেক্ষিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট তাত্ত্বিকদের, বিশেষত অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমারের, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণার রূপরেখা পর্যালোচনা, অর্থাৎ সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের সার্বিক তাত্ত্বিক অবস্থান, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, পুঁজিবাদী সমাজে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির ভূমিকা এবং সমকালীন সমাজের গণসংস্কৃতি বিশ্লেষণ উক্ত ধারণার প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ও সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণা

জার্মানিতে ভাইমার রিপাবলিকের প্রথম দিকে (১৯২৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি) আনুষ্ঠানিকভাবে ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা থেকে পরে গড়ে ওঠে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল। রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য এবং জার্মানিসহ মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে মার্ক্সীয় তত্ত্বের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াস হিসেবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাকে দেখা যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে এটি পশ্চিমা মার্ক্সবাদেরই ধারা বলে বিশেষভাবে বিবেচিত [Bottomore, 1984: 12]। কিন্তু এই ধারাটি সুনির্দিষ্ট একটি স্কুলের রূপ পায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় জার্মানি থেকে সাময়িক বিদায় নেওয়ার পর। আমেরিকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে এই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নামটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে মহাযুদ্ধ শেষে, ১৯৫০ সালে, ফ্রাঙ্কফুর্ট তাত্ত্বিকদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর [Jay, 1973]।

ইনস্টিটিউটের মূল তাত্ত্বিকেরা ছিলেন ম্যাক্স হর্কহেইমার (১৮৯৫–১৯৭১), হার্বার্ট মার্কিউসে (১৮৯৮–১৯৭৯), অ্যাডোরনো (১৯০৩–১৯৬৯), ফ্রেডরিক পোলক (১৮৯৪–১৯৭০), জুর্গেন হ্যাবারম্যাস (জন্ম ১৯২৯), ওয়াল্টার বেঞ্জামিন এবং এরিখ

ফ্রম প্রমুখ সমালোচক। এর প্রথম দিকের সদস্যরা– অ্যাডোরনো, হর্কহেইমার, মার্কিউসে প্রমুখ সমাজ-চিন্তাবিদ সমালোচনাত্মক তত্ত্ব (Critical Theory) নামে একধরনের মার্ক্সীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান, যা পরে শ্রেণী, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও মতাদর্শ পাঠে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। টম বটমোরের ভাষায়, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল হচ্ছে এমন একটি 'জটিল প্রপঞ্চ' এবং সামাজিক চিন্তনের একটি সুসংবদ্ধ ধারা, যা প্রধানত সমালোচনাত্মক তত্ত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

এই ইনস্টিটিউটের কাজে দার্শনিক চিন্তনের ধারায় সংস্কৃতিক প্রপঞ্চ নিয়ে আলোচনা হর্কহেইমার (১৯৩০ সাল থেকে ইনস্টিটিউটের পরিচালক), অ্যাডোরনো (১৯৩১ সাল থেকে ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, ১৯৩৮ সাল থেকে ইনস্টিটিউটের সদস্য) এবং মার্কিউসেকে (১৯৩২ সাল থেকে ইনস্টিটিউটের সদস্য) ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, সমালোচনাত্মক তত্ত্বে অ্যাডোরনোর মূল অবদান হল সংস্কৃতিবিষয়ক সমালোচনা। ১৯৪৪ সালে হর্কহেইমারের সঙ্গে যৌথভাবে লেখা *Dialectic of Enlightenment (1972)* বইটি প্রকাশের পর ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই বইয়ের একটি প্রবন্ধে (The Culture Industry : Enlightenment as mass deception) সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যয়টি প্রথম আলোচিত হয়।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সামগ্রিক তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল

প্রথম থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অনুপ্রেরণা ও তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল মার্ক্সবাদ। এই ইনস্টিটিউট ও মস্কোর মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলস ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মার্ক্স-অ্যাঙ্গেলস সম্পূর্ণ রচনাবলির প্রথম খণ্ড [Held, 1980: 30]। এই প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কার্ল গ্রানবার্গ (Carl Grunberg) ছিলেন অর্থনীতিক-সামাজিক-ইতিহাসবিদ। অস্ট্রো-মার্ক্সিস্টদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল [Bottomore, 1984: 12] গ্রানবার্গের সহকর্মীদের মধ্যে যেমন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য (যথা, কার্ল উইটফোগেল, যিনি এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির মতো বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা করেছেন *Economy in China* গ্রন্থে), তেমনি ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক সদস্য। প্রকৃতপক্ষে, ইনস্টিটিউট কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, বস্তুত এটি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ অনুসরণকারী পণ্ডিতদের এক মহামিলনকেন্দ্র। ইনস্টিটিউটের অন্যতম সদস্য হেনরি গ্রসম্যানের ভাষায়, 'সবার জন্য উন্মুক্ত একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান' [Jay, 1973: 14]।

সমাজ-ব্যক্তি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি অধ্যয়নে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের চিন্তাবিদদের সামগ্রিক চিন্তা-কাঠামো বুঝতে হলে দুটো বিষয়ে নজর দিতে হবে: প্রথমত, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের অধ্যয়ন-আলোচনার পরিধি এবং দ্বিতীয়ত, তাদের বিচিত্র কর্মজগৎ। ১৯৩০ এবং

১৯৪০-এর দশকে এ ইনস্টিটিউটের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল: পুঁজিবাদের তত্ত্বসমূহ, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, যান্ত্রিক যুক্তির (Instrumental Reason) বিকাশ, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি এবং গণসংস্কৃতির প্রযুক্তি ও কলাকৌশল, আলোকায়নের দ্বান্দ্বিকতা (Dilectics of Enlightenment) এবং জ্ঞানের প্রধান ধারা হিসেবে দৃষ্টবাদ (Positivism as the dominant mode of cognition) ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁরা কান্ট, হেগেল, মার্ক্স, ওয়েবার, লুকাস ও ফ্রয়েডের বিপুল রচনাসমগ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসন-অবস্থানকালে হর্কহেইমারের পরিচালনায় ইনস্টিটিউটের প্রধান প্রধান সদস্য সুসংবদ্ধভাবে তাঁদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসার ঘটান এবং তাদের ঐ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের চিন্তার একটি বিশেষ ধারা ক্রমে স্পষ্ট আকার লাভ করতে থাকে [Bottomore, 1984: 13]।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সংগীত নিয়ে পড়াশোনা করে অ্যাডোরনো মূলত নন্দনতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্যের কাঠামোর ওপর কাজ করেছেন। অ্যাডোরনোর রচনার প্রায় অর্ধেকের বিষয়বস্তুই হচ্ছে সংগীত। তিনি একদিকে যেমন বেটোভেন, মাহলার, ওয়াগনার, শোয়েনবার্গ, স্ট্রাভিনস্কি প্রমুখের সংগীতবিষয়ক কর্ম বিশ্লেষণ করেছেন, অন্যদিকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সংগীতযন্ত্র– যেমন, বেহালা, স্যাক্সোফোন ইত্যাদি নিয়েও গবেষণা করেছেন। তাঁর সংস্কৃতিবিষয়ক সমালোচনার সংখ্যা অনেক, তবে অটো স্পেঙ্গলার ও সরকটাইন ভেবলেনকে নিয়েই অধিকতর ভেবেছেন। তিনি কাফকা, বেকেট ও লুকাসের ওপর প্রচুর লিখে নন্দনতত্ত্বের মতো এক বিশাল ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কুসংস্কার এবং কর্তৃত্ববাদের মন্বন্তর সম্পর্কে মৌলিকভাবে আলোকপাত করেছেন, যার সাক্ষ্য তাঁর *Authoritarian Personality* (১৯৫০) নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষায় অনূদিত তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে *Minima Moralia* (1974), *Negative Dialectics* (1973), *Philosophy of Modern Music* (1973), *Prisms* (1969) এবং হর্কহেইমারের সঙ্গে লেখা *Dialectic of Enlightenment* (1972)।

প্রথমে মনোবিজ্ঞান এবং পরে দর্শনশাস্ত্রে পড়াশোনা শেষ করে হর্কহেইমার সামাজিক দর্শন বিষয়ে কাজ করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক দর্শন হচ্ছে মানবভাগ্য ব্যাখ্যা করার একটি প্রধান উপায়। যুক্তির ওপর তাঁর বিশেষ আগ্রহ। হর্কহেইমারের প্রধান রচনাগুলো হলো: *Critical Theory : Selected Essay* (1972), *Eclipse of Reason* (1947), *Art and Mass Culture* (1941), *The End of Reason* (1947) এবং অ্যাডোরনোর সঙ্গে লেখা *Dialectic of Enlightenment* (1972)।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের আরেকজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক হচ্ছেন হারবার্ট মার্কিউসে। তিনি ছিলেন মূলত দর্শনের ছাত্র, কিন্তু বহু বৈচিত্র্যময় বিষয়ে কাজ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: *Reason and Revolution : Hegel and the Rise of Social Theory* (1947), *Eros and Civilization : A Philosophical Inquiry*

into Freud (1951), *Soviet Marxism : A Critical Analysis* (1958), *One-Dimensional Man* (1964) এবং ১৯৩০-এর দশক থেকে লেখা *Negations Essays in Critical Theory* (1968)।

এ স্কুলের অন্যান্যের মধ্যে ফ্রেডেরিক পোলক [*Experiments in Economic Planning in the Soviet Union 1917–1927* (1929)] বাজার অর্থনীতি থেকে পরিকল্পিত সোভিয়েত অর্থনীতিতে উত্তরণের ক্ষেত্রে, এরিক ফ্রম [*The Crisis of Psychoanalysis* (1970)] মনঃসমীক্ষণকে অধিকতর সামাজিক মাত্রা সমন্বিত করতে, এবং হেনরি গ্রসম্যান [*The Law of Accumulation and Collapse in the Capitalist System* (1929)] পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক প্রবণতা বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এভাবে অধ্যয়ন-আলোচনা এবং বহু বৈচিত্র্যময় কর্মের মধ্যে দিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সামাজিক তত্ত্ব পর্যালোচনার একটি প্রধান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

অ্যাডোরনো ও হর্কমেইমারের 'সংস্কৃতি তত্ত্ব'

পুঁজিবাদী সমাজে সংস্কৃতি ও তার বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণে অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার উপস্থাপিত সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রপঞ্চটি অনুধাবনের জন্য আর্ট, সংস্কৃতি আবশ্যক। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের বেশিরভাগ তাত্ত্বিক মনে করেন, যেখানে পুঁজি অতিমাত্রায় ঘনীভূত এবং যেখানে অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরস্পর সুসংবদ্ধ, সেখানে ব্যক্তিসত্তা বৃত্তাবদ্ধ। এ অবস্থানকে তাঁরা বলেছেন, আমলাতন্ত্রের কাছে কুক্ষিগত পৃথিবী, 'A world caught up in administration' [Held, 1980: 77]। এই পৃথিবীকে বোঝার উদ্দেশ্যে তাঁরা এমন করণপ্রণালী নির্ণয় করার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, যে প্রণালীতে বিভিন্ন ভাব এবং বিশ্বাস জনপ্রিয় সংস্কৃতির মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় এবং যার মাধ্যমে একান্ত ব্যক্তিগত জগতের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়। কেননা, বাইরের শক্তি তার অবসর নিয়ন্ত্রণ করে, তার অহম্‌বোধকে প্রভাবিত করে।

হর্কহেইমার, অ্যাডোরনো এবং মার্কিউসে মনে করেন, সংস্কৃতি বিশ্লেষণের জন্য এর গঠন ও গ্রহণপদ্ধতি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সমাজের সার্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প-সংস্কৃতির উৎস, আঙ্গিক, আধেয় এবং কার্যপ্রণালী অনুধাবন একান্ত আবশ্যক। এজন্য সমাজের শ্রম, উৎপাদন এবং বণ্টন-ব্যবস্থাও বিশ্লেষণ করা দরকার। সমাজ তার সাংস্কৃতিক জীবনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চসমূহ সামগ্রিক সমাজ-আর্থনীতিক সত্তাকে অন্তরে ধারণ করে। কিন্তু সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব কেবল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ (উদাহরণস্বরূপ, পাশ্চাত্য সংগীত অপেরা, চেম্বার মিউজিক ইত্যাদি) এবং সমাজজীবনের মধ্যকার সাধারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এটি অবশ্যই সাংস্কৃতিক আঙ্গিকসমূহের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং তাদের গ্রহণীয় করে তোলার নির্মাণ-কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উন্মোচন করবে।

হর্কহেইমার এবং অ্যাডোরনোর মতে, সাধারণভাবে, সংস্কৃতির তত্ত্বে থাকবে উৎপাদন প্রক্রিয়া, পুনরুৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় এবং ভোগসংক্রান্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ। এ কথা বলা বাহুল্য যে, সংস্কৃতির এ রকম তত্ত্ব কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয়নি, এ রকম ভাবাও হয়নি যে কখনো তা 'সমাপ্ত' হয়ে যাবে। বরং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তাত্ত্বিকেরা নন্দনতত্ত্ব, সংস্কৃতির সমালোচনা, গণসংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যের তত্ত্ব নির্মাণে বিপুল অবদান রেখেছেন।

আর্ট ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট তাত্ত্বিকদের সংস্কৃতিতত্ত্ব সম্পর্কে আরও খানিকটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদীরা সংস্কৃতিকে সমাজের উপরিকাঠামো হিসেবে দেখেছেন এবং অবকাঠামোর ভিত্তিতে উপরিকাঠামোর আঙ্গিক ও আধেয়'র বিশ্লেষণে উপনীত হয়েছেন। তাঁদের বিপরীতে ফ্রাঙ্কফুর্ট-তাত্ত্বিকেরা বলেছেন, সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চসমূহকে সাদামাটা 'অবকাঠামো-উপরিকাঠামো' মডেলে দেখবার অবকাশ নেই। সমাজের সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংস্কৃতিকে গতানুগতিক ধারায় দেখার বিরোধিতাও তাঁরা করেছেন। অ্যাডোরনো বলেছেন, সংস্কৃতিকে শুধু সংস্কৃতি দিয়ে বোঝা যায় না। হর্কহেইমার এবং অন্যান্যরা মনে করেন, সমাজের সাংগঠনিক ভিত্তি থেকে ধারণা, লোকাচার, রীতিনীতি ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আর্টের উত্তরাধিকার ও প্রয়োগ থেকে সংস্কৃতির উদ্ভব [Held, 1980: 80]। সংস্কৃতি সম্পর্কে মার্কিউসের বক্তব্য হর্কহেইমারের কাছাকাছি। তাঁর ভাষায়:

> '...culture...signifies the totality of social life in a given situation, insofar as both the areas of identical reproduction (...'spiritual world) and material production (civilization) form a historically distinguishable and comprehensible unity...' [Marcuse, 1968: 94]

অন্য কথায় বলতে গেলে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কিউসে বস্তুবাদী সংস্কৃতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। বস্তুবাদী সংস্কৃতি জীবিকা নির্বাহের প্রকৃত আচরণ-কাঠামো, প্রায়োগিক মূল্যবোধ পদ্ধতি এবং পারিবারিক জীবনের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক স্তরসমূহ, শিক্ষা এবং কাজ– এই সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর, বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও কলা, আর্ট, ধর্ম– এসব উচ্চ মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সদস্যরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিক, শৈল্পিক সংস্কৃতিকে কেবল কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীস্বার্থের প্রতিফলন হিসেবে যেমন বিবেচনা করা যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ স্বাধীন পর্যায়ের সৃষ্টি হিসেবেও বিবেচনা করা যায় না। যে পদ্ধতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চসমূহ অন্যান্য স্তরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় যুক্ত হয়, সেগুলোকে পরীক্ষা করার ব্যাপারেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন।

ফর্মের কারণে আর্টকে প্রায়শই 'আপেক্ষিক স্বাধীন' সত্তা হিসেবে ধারণা করা হয়েছে। আর্ট অনিবার্যভাবে বাস্তবতার সঙ্গে জড়িত এবং এ কারণেই কতক বাস্তব অসংগতির সৃষ্টি। ফলে আর্ট কিছু অসংগতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; শুধু তাই নয়, আর্ট অনেক অসংগতির প্রকাশও ঘটায়। যেসব কাজ বিদ্যমান উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে বিনিময় ও আত্তীকরণকে ঠেকিয়ে রাখে এবং যেসব কাজ তা করে না সেসবের মধ্যে প্রায়শই এক ধরনের বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাঁরা বিশ্বাস করেন, আর্টের অনেক মৌলিক কাজের মধ্যেই ইতিকরণ এবং নেতিকরণ উপাদান একাকার হয়ে আছে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে সমাজ নিজেকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছে, তেমনি সমালোচনাত্মক ভাবমূর্তিও বজায় রেখেছে। অ্যাডোরনো যেমনটা লিখেছেন:

> '...culture, in the true sense, did not simply accommodate itself to human beings: but it always simultaneously raised a protest against petrified relations under which they lived [Adorno, 1975, quoted in Held, 1980: 81]

আর্টিস্টিক সংস্কৃতি 'সমগ্রের বিরুদ্ধ নির্দিষ্টের' দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ উপস্থাপন করে; নান্দনিকতা সীমাতিক্রমী মুহূর্তকে ধারণ করতে পারে অথবা বিদ্যমান আধিপত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে [Held, 1980: 81]। বুর্জোয়া আর্ট আইডেনটিটির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। বাস্তবতার ইমেজ ও বিদ্যমানতার অভিন্নতা দেখানোর প্রয়াস পায়। এটি নিজেকে সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে উপস্থাপন করে। অ্যাডোরনো উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, বেটোভেনের কিছু মিউজিক বিষয়গত ও বিষয়ীগত, অংশ ও সমগ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রকাশ করে। এটি প্রতিনিধিত্ব করে সমন্বিত সমাজধারণার এবং ফরাসি বিপ্লবের প্রতিজ্ঞার। একক অংশ, নোট বা স্তবকগুলো, পৃথক সত্তা হিসেবে বিরাজ করে, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশই কেবল সমগ্র আধেয়'র অভ্যন্তরে এবং সিম্ফনি গঠনের মধ্যে পূর্ণভাবে অর্থময় হয়ে ওঠে। অ্যাডোরনোর মতো হর্কহেইমারও মনে করেন, প্রাক-পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই কেবল আর্ট পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়েছিল [Horkheimer, 1941: 291–292, quoted in Held, 1980: 84]।

আর্ট সম্পর্কে বেঞ্জামিনের অবস্থান ভিন্নতর। আর্টের সূত্রপাত বলতে তিনি Cult-এর Ceremonial object-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, শুরু দিকে আর্ট ছিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ, তখন অস্তিত্বই ছিল তার মূল বিবেচ্য। এই আর্টের মূল বৈশিষ্ট্য এর Aura বা জ্যোতির্বলয়, বেঞ্জামিনের ভাষায়: 'A unique phenomenon of a distance however close it may be.'। তাঁর মতে, আর্টের এই জ্যোতির্বলয়ে নিহিত ছিল জাদুময় কর্তৃত্ব ও মৌলিকত্ব [Benjamin, 1969: 221]। বেঞ্জামিন মনে করেন, আর্টের ঐ জ্যোতির্বলয়ের ক্ষয়ের কারণ আর্টকে মানুষের আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাওয়ার চেষ্টা এবং তার যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের ইচ্ছার মধ্যে নিহিত। আর্টের যান্ত্রিক

পুনরুৎপাদন আর্ট সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয়। আর এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিই সংস্কৃতির পথ প্রশস্ত করে।

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি কী

গণসংস্কৃতি ও গণযোগাযোগ সম্পর্কে ফ্রাঙ্কফুর্ট তত্ত্ববিশারদের দৃষ্টিভঙ্গির সূত্র যদিও অ্যাডোরনোর সংগীতবিষয়ক প্রথম দিকের রচনাগুলোতে পাওয়া যায়, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে ফ্রাঙ্কফুর্ট-তাত্ত্বিকদের ধারণামূহ মধ্য-তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের প্রবাসজীবনে সুস্পষ্ট অবয়ব পায়। এই কালপর্বে ইনস্টিটিউটের সদস্যরা সংস্কৃতি ও গণযোগাযোগ মাধ্যমসমূহের দ্রুত বিস্তার, ভোগবাদী সমাজের বিকাশ, বাণিজ্যিক সম্প্রচার-ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক ক্ষমতার আবির্ভাব ও রুজভেল্টের রাজনৈতিক প্রচারণামূলক কাজে রেডিওর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার এবং সিনেমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করেন। এ ছাড়া, তাঁরা ম্যাগাজিন, কমিক বই, সস্তা কল্পকাহিনী এবং গণহারে উৎপাদিত সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় (যেখানে তাঁদের সহযোগীরা চলচ্চিত্র-শিল্পে কাজ করছিলেন) অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন, কীভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থ গণসংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং কীভাবে ভোগবাদী সমাজে ও গণমাধ্যমগুলোতে বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির প্রতি আসক্তি বাড়ে। অন্যদিকে, মার্কিউসে, লোয়েনথাল ও অন্যরা ওয়াশিংটনে মার্কিন সরকারের যুদ্ধতথ্য-কার্যালয় এবং গোয়েন্দা সার্ভিসে কর্মরত অবস্থায় দেখেছেন, কীভাবে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার অস্ত্র হিসেবে গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হয়। এভাবে এই তাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতি, বিজ্ঞাপন, গণযোগাযোগ মাধ্যম ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য বাহন ব্যবহারের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের নবতর ধরনের প্রতি মানুষের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করে। তথ্য পরিবেশন ও জনপ্রিয় বিনোদনের নামে উৎপাদিত ভোগবাদী মতাদর্শের (যা মানুষের কাছে পৌঁছায় মিডিয়া চশমার ভেতর দিয়ে) মাধ্যমে সমকালীন সমাজ ব্যক্তির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে [Kellner, 1989: 130]।

অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার 'জনপ্রিয় সংস্কৃতি', 'গণসংস্কৃতি' প্রত্যয়গুলোর বিরোধিতা করার জন্য সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যয়টি গ্রহণ করেছেন। গণসংস্কৃতির পণ্যগুলো সাধারণ মানুষের (Masses) কিংবা জনসাধারণ (People)-এর কাছে থেকে উৎপন্ন হয়– এই দৃষ্টিভঙ্গিটির বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। তাঁদের কাছে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির অর্থ হল 'বানানো সংস্কৃতি', যা বাইরে থেকে আরোপিত এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও মতাদর্শে দীক্ষিত (Indoctrinate) করার হাতিয়ার মাত্র [Kellner, 1989: 130–131]। কেননা হর্কহেইমারের ভাষায়, সংস্কৃতি আজকের দিনে আর প্রকৃত চাহিদা থেকে উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় সেইসব প্রয়োজন মেটাতে যা 'Evoked and

Manipulated' [Horkheimer, 1941: 302–303; quoted in Held, 1980: 91]। এভাবে, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যয়টির মধ্যেই একটি দ্বান্দ্বিক বক্রাঘাত (Dialectic irony) সুপ্ত আছে বলে কেলনার [Kellner, 1989: 130] মনে করেন। কেননা সনাতন অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ইন্ডাস্ট্রি-বিরোধী এবং ব্যক্তিগত সৃজনশীলতার প্রকাশধর্মী; অথচ 'সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি' প্রত্যয়ে সংস্কৃতিকে মানবিকীকরণ কিংবা মানবমুক্তির উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না, বরং একে মতাদর্শগত আধিপত্য বিস্তারের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করা হয়। অ্যাডোরনো তাঁর 'Culture industry reconsidered' [Adorno, 1975; quoted in Held, 1980: 91] শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি কথাটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার ব্যাপার নয়। প্রকৃতপক্ষে, সাংস্কৃতিক মাধ্যমসমূহের সৃষ্টিক্ষেত্রগুলো শিল্প-উৎপাদনের প্রথাবদ্ধ ধরনসমূহের মতো নয়। চলচ্চিত্র-শিল্পের মতো কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপাদনের ব্যক্তিক কাঠামো (যেমন, Creation ও Composition) অক্ষুণ্ন থাকে। সুতরাং সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রত্যয়টি নিজের ভেতরের উৎপাদনকে বোঝায় না। বরং এটি সাংস্কৃতিক সত্তাসমূহেরই নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ (Standardization), ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ (Pseudo-individualization) কিংবা প্রান্তিক পার্থক্যায়ন (Marginal differntiation) এবং প্রচার ও বণ্টন-কৌশলের যুক্তিসিদ্ধকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি বিকাশের ফলে একদিকে যেমন চিরায়ত নান্দনিকতা এবং প্রমিত বিজ্ঞাপন নান্দনিকতার মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকে তেমনি অন্যদিকে স্বাধীন আর্টের (Autonomus art) বোধগম্যতা এবং বৈধতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্থানীয় এবং লোকসংস্কৃতির তাৎপর্যও নষ্ট হয়। কেননা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এসবকে পৌনঃপুনিকভাবে উপস্থাপন এবং সাম্প্রতিক ফ্যাশনের সঙ্গে সুসংবদ্ধ করার মাধ্যমে সেগুলোর অন্তর্নিহিত শক্তি এবং বিদ্রোহী চেতনা ধ্বংস করা হয়। স্থানীয় ও লোকজীবনের সংগীত ও সুরগুলো ডিস্ক ও রেকর্ডে পরিণত হয়, কিন্তু এসবের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি যায় পাল্টে। মার্কিউসের ভাষায়, সেগুলো তখন কেবলই অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, বাংলাদেশে লালনের গান, এখন শুধুই টিভির অনুষ্ঠান, গড়াই নদীর তীরবর্তী এলাকার জনসাধারণের জীবনবোধের অনুরণন নয়। সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির আবির্ভাব অকস্মাৎ ঘটেনি, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল; যার মাধ্যমে প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক সংগঠন, প্রশাসনিক চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রভাব বিস্তৃত হয় [Kellner, 1989: 131]। । এই প্রক্রিয়ার কুফল থেকে সংস্কৃতি মুক্তি পায় না। এ প্রসঙ্গে দেবেশ রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> শিল্প-সাহিত্য যখন ইন্ডাস্ট্রির টেকনোলজির আওতায় চলে আসে তখন এডরনো বলেছেন, "It is the triumph of invested capital"। এডরনো তার বিষণ্ন বিজ্ঞানে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কীভাবে রেডিওর

টেকনোলজি ব্যবহারের ভিতর দিয়ে গোয়েবলস বিজ্ঞাপনকে একটি শুদ্ধ শিল্পে পরিণত করেছিলেন ও কীভাবে সেই ১৯৩০-এর দশকে জার্মানীর সর্বত্র একই রেডিয়োতে ফুয়েরারের একই কথা প্রায় একটি দৈববাণীর মর্যাদা পেতে থাকে আর সেই পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে হিটলার হিটলার হয়ে ওঠেন। এডরনো তাঁর চোখে যা দেখেছিলেন, আমরাও আমাদের চোখেও তাই দেখছি। রোনাল্ড রেগান যখন লিবিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন আক্রমণের সিদ্ধান্ত, আক্রমণ, কামান দাগা আর রেগানের বক্তৃতা মার্কিনী টিভিতে একই সঙ্গে দেখানো হচ্ছিল। নোয়াম চোমস্কি তাতে মন্তব্য করেছিলেন, পৃথিবীতে এর আগে কখনও যুদ্ধের মতো সাংঘাতিক ঘটনাকে টিভির প্রাইমটাইমের সঙ্গে মিলিয়ে ঘটানো হয়নি। রেগান লিবিয়া আক্রমণের লাইভ প্রোগ্রাম দেখিয়ে যার সূচনা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ তাকে সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোটবাহিনীর ইরাক আক্রমণ দেখানো হল মাসাধিককাল চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। চব্বিশ ঘণ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা দেখতে লাগল কীভাবে ইরাক ভূখণ্ডকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, ভূখণ্ডের যে পরিবর্তন ঘটতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগে, তা ঘটে যাচ্ছে কয়েকটি ঘণ্টায়, কয়েকটি দিনে, রাত্রির আকাশে বোমাবর্ষণের দীপাবলী দৃশ্যত কত সুন্দর। কীভাবে ইরাকের শিশুরা শুকনো বালিতে তাদের ছোট ছোট শরীরের অশেষ রক্ত ঢালছে, কীভাবে ইরাকের মানুষ মাথার উপর আচ্ছাদনহীন হয়ে পড়ছে, তারপর মাথাহীন বা ধড়হীন হয়ে পড়ছে। টিভির কাহিনীচিত্র, সিরিয়াল, সোপ অপেরায় প্রতিহিংসা এখন প্রতিদিনের চেনা ভাষা হয়ে উঠছে। মানুষের রক্ত আর মানুষের কাছে তত অপরিচিত ঠেকে না। মৃত্যুহানা ক্ষেপণাস্ত্র হয়ে উঠে দৃশ্যের সুন্দর। টেকনোলজি যখন দর্শককে সেই জায়গায় নিয়ে গেছে তখনই একটি আসল যুদ্ধ, আসল বোমাবর্ষণ, হাজারে হাজারে নরহত্যাও মাত্র দৃশ্যই থাকতে পারে, দৃশ্যই হয়ে যেতে পারে, দৃশ্যই হয়। [রায়, ১৯৯৪: ২০থ–২১]

ডেভিড হেল্ড [Held, 1980: 77–109] তাঁর বইতে যে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন তা থেকে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যেতে পারে: প্রথমত, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি একই সঙ্গে মনোযোগ ধরে রাখে এবং যে মনোযোগ সে আকর্ষণ করে তা যেন তার উৎপাদনকে বিতর্কিত না করে সেটিও নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি-কাঠামোর মধ্যে বিরাজমান বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সত্তা যে 'Patterned and predigested' বাণিজ্যিক বিনোদন প্রদান করে তা তার লাখ লাখ গ্রাহকের মনোযোগী অথচ নিষ্ক্রিয়, শমিত ও নির্বিচার গ্রহণের দিকে লক্ষ রেখেই করা হয়। হর্কহেইমার ও অ্যাডোরনো

এসব সত্তাকে স্টাইলের অপলাপ বলে আখ্যায়িত করেন, কেননা খুব কমই তারা শিল্পের গতানুগতিক আঙ্গিকে নতুন মাত্রা যোগ করে। তৃতীয়ত, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির কারণে, আর্টিস্টিক সংস্কৃতির উপাদানসমূহ ক্রমশই বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মার্কিউসের মতে, এটি হচ্ছে শিল্পের 'Second alienation– alienation from alienation– that is disappearing today'। চতুর্থত, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির স্টাইল আসলে স্টাইলকেই নিধন করে। বাস্তবতার নির্যাসের সঙ্গে এর উৎপাদনসমূহ তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ। এসবের কোনো প্রকৃত আধেয় নেই, মূলত এরা অনুকারী। পঞ্চমত, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি বহির্জগতের সম্প্রসারণের এক হাতিয়ারে পরিণত হয়। এর উৎপাদনসমূহ বাস্তবতার শক্তিশালী ব্যাখ্যার জন্ম দেয়, একে আরও প্রভাবশালী ও সুদৃঢ় করে। এটি তার গ্রাহকের জন্য রূপরেখা প্রস্তুত করে, শ্রেণীবিন্যাস করে এবং তালিকা তৈরি করে। এটি প্রায়শই সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একধরনের কৃত্রিম সামঞ্জস্য উপস্থাপন করে। ষষ্ঠত, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির মিডিয়া 'Plots, 'Goddies', 'Heroes' এসব বিষয় সামাজিক সম্পর্কের প্রচলিত কাঠামোতে যে অর্থ বহন করে সেই অর্থ ভিন্ন খুব কম ক্ষেত্রেই অন্য তাৎপর্য বহন করে। চলচ্চিত্র, রেডিও সম্প্রচার, জনপ্রিয় সংগীত ও ম্যাগাজিনে আবেগ আছে কিন্তু সাধারণভাবে সে আবেগগুলো হল সমগ্র ও অংশ, বিষয় ও ব্যক্তি এবং কাঠামো ও আধেয় শনাক্তকরণ এবং ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ– এই দুই বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিত্রায়িত করা যায়। এই দুই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই বৈশিষ্ট্য যা স্বাধীন শিল্পের সঙ্গে এর পার্থক্য ঘটিয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির ভূমিকা

অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমারের মতো সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির আওতায় ব্যক্তি-মানুষ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ করে [Adorno and Horkheimer, 1972: 120]। পুঁজিবাদী-ব্যবস্থার কেন্দ্রে যেসব একচেটিয়া করপোরেশন অবস্থান করে তাদের নিয়ন্ত্রণে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ব্যক্তিকে পুঁজিবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। কেলনারের ভাষায়, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন-প্রক্রিয়া কারখানা-উৎপাদনের মডেলে বিন্যস্ত, যেখানে সবকিছুই নির্দিষ্ট মানে 'Standardized, streamlined, coordinated and planned down to the last detail' [Kellner, 1989: 132]। অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের 'Radical critique' উপস্থাপন করেছেন। অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'Totalitarian capitalism'-এর বৈশিষ্ট্যসূচক 'Standardization, homogenization and conformity'-এর প্রক্রিয়াকেই সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি প্রতিফলিত করে।

তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির লক্ষ্য পুঁজিবাদী অবস্থানকে দৃঢ়তর করা। ডেভিড হেল্ডের ভাষায়, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি নিজে পুঁজিবাদের ভেতর সমন্বিত, এবং

বিনিময়ে ভোক্তা শ্রেণীকে পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে [Held, 1980: 91]। এমনসব পণ্য তৈরি করা এর লক্ষ্য, যা লাভজনক এবং ভোগের উপযোগী। নিজের পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করাই তার উদ্দেশ্য। অন্য কথায় বলা যায়, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি হল 'Natural corollary of capitalist industrial production' [Held, 1980: 93]। পুঁজির বৃত্তে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির পণ্য উৎপন্ন হয় 'Extra-artistic technique (Techniques of mechanical reproduction)'-এ, এবং তা সৃষ্টি করে 'Diversion, distractions, amusements'– এক কথায় যাকে বলে বিনোদন। আর এ বিনোদনের উদ্দেশ্য কান্টের শিল্প-উদ্দেশ্যের মতো purposiveness without purposes নয়, বরং পুঁজিবাজারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি– purposelessness for purposes [Held, 1980: 92–93]।

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি অন্য আরেকটি উপায়ে পুঁজির স্বার্থ সংরক্ষণ করে। পুঁজিবাদী সমাজে মানুষের চিত্ত-বিক্ষেপ ও বৈচিত্র্যের যে চাহিদা তা প্রকৃতপক্ষে নিত্যদিনের দুর্দশা ও দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যাওয়ারই নামান্তর। প্রচলিত উৎপাদন-ব্যবস্থার যুক্তিসিদ্ধ ও যন্ত্রায়িত শ্রম-প্রক্রিয়ায় তারা এতটাই আবদ্ধ হয়ে যায় যে, তাদের উপলব্ধি করতে হয়, 'They are not masters of their own destiny' [Held, 1980: 93]। উৎপাদন-ব্যবস্থার পৌনঃপুনিক সংকট, অব্যাহত বিস্তৃতি, পশ্চাদপসরণ ও মন্দার ফলে জীবন, চাকরি, পরিবারের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও বার্ধক্য সম্পর্কে সৃষ্টি হয় মানসিক চাপ, ভীতি ও উদ্বেগ। এভাবে পুঁজিবাদ সেই ক্ষমতাবানের প্রতি নির্ভরতার জন্ম দেয়, যারা কাঙ্ক্ষিত চাহিদাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে– এই ক্ষমতাবানই হল সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি, যার মধ্যে আত্মগোপনের আশ্রয় পাওয়া যায় [Adorno, 1974: 83; quoted in Held, 1980: 93]।

অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমারের মতে, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যে গণপ্রতারণা বিদ্যমান থাকে তা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রতারণা, মিথ্যা আশ্বাস ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুরূপ [Kellner, 1989: 132]। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমকালীন পুঁজিবাদী সমাজের অন্যতম মূল প্রবণতা হল বিজ্ঞাপন, সংস্কৃতি, তথ্য, রাজনীতি এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংমিশ্রণ ঘটান– এই প্রবণতাটি সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে সাধিত হয়।

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি যেসব কৌশল ব্যবহার করে বিদ্যমান সমাজের প্রতি ভোক্তাদের বশীভূত করে রাখে, অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার তাঁদের আলোচনায় তা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি বিনোদনের নামে বিরাজমান সমাজকে 'স্বাভাবিক' বলে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে নানা প্রচলিত ঘটনা-দৃশ্যকল্প গণমাধ্যমে এমনভাবে অহরহ পুনরুৎপাদন ও পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, যাতে মানুষ সেগুলোকেই স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে ধরে নেয়। এর ফলে মতাদর্শের প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁদের ভাষায়:

> Accordingly, ideology has been made vague and non-commital...ideology is split into the photograph of stubborn life and the nacked lie of its meaning– which is not expressed but suggested and yet drummed in. To demostrate its divine nature, reality is always repeated in a purely cynical way. Such as photological proof it of course not stringent, but it is overpowering. [Adorno and Horkheimer, 1972: 147–148]

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির অপর একটি কৌশল হল, এটি সবকিছুকে একই ছকে বিন্যস্ত করে, 'Culture now impress the same stamp on everything.' [Adorno and Horkheimer, 1993: 30]। তাই তাঁরা বলেছেন, চলচ্চিত্র, রেডিও, ম্যাগাজিন ইত্যাদি সর্বতোভাবে একই সিস্টেমের অংশ। কর্তৃত্ববাদী দেশগুলোর কোনো একটি শিল্প-ব্যবস্থাপনা ভবন বা প্রদর্শনী কেন্দ্র অপর যেকোনো একটি দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের বড় বড় টাওয়ারগুলোও একই রকম দেখা যায়:

> Yet the city housing projects designed to perpetuate the individual as a supposedly independent unit in a small hygienic dwelling make him all the more subservient to his adversary– the absolute power of capitalism [Adorno and Horkheimer, 1993: 30]

সংস্কৃতির জগতে এই একচেটিয়াত্ব পুঁজির একচেটিয়াত্বেরই ফল। একচেটিয়া পুঁজির অধীনে সকল গণসংস্কৃতিই অভিন্ন– 'All mass culture is identical' [Adorno and Horkheimer, 1993: 30]। অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার দেখিয়েছেন, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির কর্তাব্যক্তিরা এখন আর ঐ একচেটিয়াত্বকে গোপন করেন না। সিনেমা, রেডিও এখন আর আর্ট হওয়ার ভান করে না। ওগুলো যে এখন শুধুই ব্যবসা, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রিতে সে কথাই মতাদর্শে পরিণত হয়েছে। এসবই এখন নিজেদেরকে 'ইন্ডাস্ট্রি' বলে আখ্যায়িত করে।

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির তৃতীয় যে কৌশলটি অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমার লেখায় লক্ষ করা যায়, তা হল নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ। এটি হল সেই প্রক্রিয়া, যা কোনো সাংস্কৃতিক পণ্যের নির্দিষ্ট ও বিস্তারিত দিকগুলোকে স্পর্শ করে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ফর্মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা দেয়– এটি সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির বণ্টন ও যান্ত্রিক পুনরুৎপাদন পদ্ধতির কারণে ঘটে। জনপ্রিয় পণ্যগুলোকে বৃহৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থে 'নকল' করা হয়। একই সঙ্গে লক্ষ করা হয়, যেন পুরনো স্টাইলের পণ্যটি বাজারে যেরূপ আসছে তা 'নতুনত্ব ও মৌলিকত্বের ভাবসম্পন্ন, ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়।' ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণের কাজ হল:

> ...endowing culture mass production with the halo of free choice as open market on the basis of standardization itself [Adorno, *On popular music* quoted in Held, 1980: 95].

একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়, ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ হল মূলত একই সাংস্কৃতিক পণ্যকে সমাজের উচ্চ-নীচ নানা স্তরের লোকদের জন্য সামান্য এদিক-সেদিক করে বাজারে ছাড়ার প্রক্রিয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষিত এলিটদের জন্য 'রুচিশীল' গানের ক্যাসেট, আর রিকশাওয়ালা ও খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য সস্তা হিন্দি গানের অনূদিত পুনর্গীত বাংলা সংস্করণ– এ সবই প্রাতিস্বিকীকরণের নামে প্রকৃতপক্ষে ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ। এসবে আর্ট বলে কিছু থাকে না– সবই পরিণত হয় বাজার-ক্রেতা-পণ্য-ভোক্তায়। ভোক্তারা যেন এক-একটি পরিসংখ্যানমূলক সত্তা। তাঁদের ভাষায়:

> Something is provided for all so that none may escape; the distinction are emphasized and extended. The public is catered for with a heirarchical range of mass-produced products of varying quality...consumers appears as statistics... [Adorno and Horkheimer, 1993: 33]

নির্দিষ্ট মান প্রমিতকরণ ও ছদ্মপ্রাতিস্বিকীকরণ কীভাবে কাজ করে, দেবেশ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্র ও তার লেখালেখি প্রসঙ্গে সাবলীল বর্ণনা দিয়েছেন:

> এক অদ্ভুত সরলীকরণে কয়েকটিমাত্র বাঁধা ছকে এই ফিল্মের গল্পগুলি সাজানো থাকে, এমন-কি সংলাপগুলি পর্যন্ত, এমন-কি গানগুলি পর্যন্ত। অথচ প্রত্যেকটা ফিল্ম প্রযোজিত হয় অভিনবতম বলে, প্রায় প্রত্যেকটি ফিল্মে একই নায়ক-নায়িকা ন্যূনতম ভূমিকা পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে, প্রায় প্রত্যেকটি ফিল্মে ঘটনার একই পরম্পরা সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতার স্বাদ দেবে বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তত দিনে এর দর্শকের কাছে এই গড় ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে গেছে গণিতেরই নিয়মে। দর্শককে যখন গণিতের গড় বানানো সম্পূর্ণ হয়, তখন ফিল্মের আর গণিতের গড় আলাদা হওয়ার কোনো প্রয়োজন থাকে না। ...সংস্কৃতিকে একটি পণ্যে পরিণত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত, শিল্প সৃষ্টি ও শিল্প আস্বাদ থেকে সমস্ত রহস্য বাদ দিয়ে তাকে একটি গড়ে নামিয়ে আনতে হবে, গাণিতিক গড়ে... আমরা একচেটিয়া কাগজ বলি বা বড় বড় খবরের কাগজ বলি বা খবরের কাগজ ও প্রকাশনার যৌথ ব্যবসায়ের একচেটিয়া মালিকানা বলি– তাদের পক্ষেও তাদের লেখকদের কোনো গড় নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে বা দেয়া সম্ভব। সেখানে প্রত্যেক লেখকের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই তো তেমন ব্যবসায়ীর লাভের ভিত্তি। সব লেখক যদি একই রকম লেখেন তাহলে তাঁর কাগজ কেউ কিনত না। ...ফলে

যদি কোনো লেখক কোনো একবার কোনো মেলায় গিয়ে এমন কোনো একটি লেখা লিখে থাকেন যা পাঠক-ক্রেতার ভালো লেগেছিল, তখন তার কাছে থেকে ঐ মেলার লেখাই চাওয়া হতে থাকবে। মেলার যে অভিজ্ঞতা লেখককে লেখায় উদ্দীপিত করেছিল সে-অভিজ্ঞতা হয়ে যায় অবান্তর, লেখককে তখন 'কোথায় পাব তারে' বলে মেলার পর মেলা আবিষ্কার করে যেতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাঠকের প্রত্যাশা ও রুচিকেও একটি গড়ে এনে ফেলা যায়। ...লেখককে শুধু একবার মাত্র মৌলিক হবার সুযোগ দেয়া হবে। শুধু একবার। সেই মৌলিকতায় যদি সে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, তাহলে তাকে তার ঐ মৌলিকতাতেই শেষ দিন পর্যন্ত লিখে যেতে হবে, অবিশ্যি যতদিন তাকে লিখতে দেয়া হয়, যতদিন আর একজন লেখক জনপ্রিয়তার মৌলিকতা নিয়ে কাগজে এসে না পড়েন। ...আর টেকনোলজি ব্যবসা বোঝে, সাহিত্য বোঝে না। সাহিত্যের যে-অংশ ব্যবসার বাইরে তার কোনো প্রয়োজন টেকনোলজির নেই। [রায়, ১৯৯৪: ২২–২৩]

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির উপাদানসমূহ: টিভি, জ্যোতিষশাস্ত্র ও সংগীত

ফ্রাঙ্কফুর্ট-তাত্ত্বিকদের দাবি অনুযায়ী, ক্ল্যাসিক্যাল বুর্জোয়া শিল্পে মানবসম্পদ এবং শিল্পকর্ম সৃজনশীল কৌশল ও ঐ শিল্পকর্মের বিনির্মাণের শর্ত তৈরি করে যে আর্থ-সামাজিক জীবন তার মধ্যে অসঙ্গতি বিদ্যমান। উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের মধ্যকার অসংগতি সাংস্কৃতিক স্তরে স্পষ্টত প্রতীয়মান। প্রমিত মানসম্পন্ন স্বাধীন আর্টের উৎপাদন গ্রাহক-প্রত্যাশার সঙ্গে, বিশেষ করে তাদের চিন্তন-প্রকৃতি বা বোধগম্যতার মানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। কারণ তাঁদের মতে, আর্টিস্টিক উৎপাদনসমূহের অর্থ অনেক সময়ই 'অস্পষ্ট' থেকে গেছে। অন্যদিকে, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি পুঁজিবাদ সংরক্ষণের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সাংস্কৃতিক নির্মিতির বিকাশে নিজেকে সতত নিয়োজিত রাখে। ফলে গণ-উপভোগের লক্ষ্য নিয়ে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি এমন সব পণ্য উৎপাদন করে, যা একই সঙ্গে লাভজনক, উপভোগ্য এবং জনচৈতন্যে নির্দিষ্ট প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যাভিসারী। শিল্পের শুদ্ধতার প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা না-রেখে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি পুনরুৎপাদন ও নিজস্ব প্রভাব বজায় রাখার ব্যাপারেই বেশি মনোযোগী।

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তার উৎপাদনসমূহের বহুস্তরভিত্তিক অর্থের স্বীকৃতি দেয়। তবে এই স্বীকৃতি মুক্তির লক্ষ্যে ব্যবহৃত না-হয়ে নিয়োজিত হয় ভোক্তাকে ফাঁদে ফেলার এবং পূর্বনির্ধারিত প্রভাবে গ্রহীতার চেতনাকে জড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে। 'Television and the patterns of mass culture' [Adorno, 1957: 476] নামক প্রবন্ধে আমেরিকান একটি কমেডি সিরিজের বহু স্তরভিত্তিক অর্থের ওপর অ্যাডোরনোর আলোচনায় বিষয়বস্তুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ সিরিজে দেখানো হয়েছে, স্বল্পবেতনের অল্পবয়সী,

ক্ষুধার্ত, এক স্কুলশিক্ষিকার জীবনসংগ্রামের বিনোদনমূলক গল্প। যখন সে বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে কারও কাছে থেকে বিনা পয়সায় একবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয় তখন কিছু কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। বিশেষ করে, খাদ্যের অনুষঙ্গটি হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু অ্যাডোরনোর মতে এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্নিহিত অর্থ হল:

> যদি তুমি ঐ মেয়েটির মতো রসিক, ভালো স্বভাবের, ত্বরিত বুদ্ধিসম্পন্ন এবং আকর্ষণীয় হও, তবে নিম্নতম মজুরি (যা দিয়ে ন্যূনতমভাবেও জীবনধারণ সম্ভব নয়) নিয়ে বিচলিত হোয়ো না। তোমার হতাশাকে তুমি কৌতুকের পথে জয় করতে পারো; এবং তোমার উচ্চ রসবোধ ও পটুত্ব কেবল যে তোমার বস্তুগত অভাবের ঊর্ধ্বে স্থান দেবে এমন নয়, বাকি মানবজাতির ওপরেও স্থান দিতে পারে...অন্যকথায়, পাণ্ডুলিপিটি হচ্ছে পরিপার্শ্বের অপমানকর শর্তগুলোর সঙ্গে একধরনের আপস তৈরির কৌশল মাত্র, যার মাধ্যমে ঐসব অপমানকর ব্যাপারগুলোকে বস্তুগতভাবে কৌতুককর করে তুলে ধরা হয় এবং এমনই ব্যক্তির অবয়ব উপস্থাপন করা হয়, যে তার নিজস্ব অবস্থানের পরিপূর্ণতাকে ঘৃণা-বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে উঠে নির্মল ও ক্লেশহীন কৌতুকের বিষয় হিসেবে উপভোগ করে। [Adorno, 1957L 480–481/অনুবাদ লেখকের]

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদনসমূহে দর্শক-প্রতিক্রিয়ার কাঠামোও সাজানো থাকে। ক্ষুধাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবার অথবা গোয়েন্দা কাহিনীর অপরাধ ও হত্যার আবহ খুব সহজেই তৈরি করা হয়। অধিকন্তু, এসব প্রদর্শনী (Show) কিছু নির্দিষ্ট গতানুগতিক ধারণাকেই শক্তিশালী করে। সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির প্রতিক্রিয়া নির্মাণ এবং পূর্বধারণার বিষয়টিকে অ্যাডোরনো অনুপুঙ্খভাবে 'The stars down to earth' [Adorno, 1974] শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। *লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস* দৈনিকটিতে তিন মাসে প্রকাশিত জ্যোতিষশাস্ত্র-বিষয়ক কলামের আধেয় বিশ্লেষণের ফলাফল এবং জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক বেশ কিছু জার্নালের লেখা পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখান, গতানুগতিক জ্যোতিষশাস্ত্র মূলত প্রাতিষ্ঠানিকীকৃত কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি হচ্ছে সক্রিয়ভাবে গৃহীত সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি উৎপাদন। জ্যোতিষীরা বিভিন্ন ব্যক্তিকে নানা ধরনের কর্তৃত্বমূলক উপদেশ দিয়ে যান, যাদের নির্দিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না। প্রাত্যহিক সমস্যার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিকতা এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই মূলত তাঁদের কলামগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ সমস্যার সমাধানে সঠিক পথটি খুঁজে বের করার ব্যক্তিক দক্ষতার ওপরই লস *অ্যাঞ্জেলেস টাইমস*-এ জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক কলামগুলো জোর দিয়েছে। মজার বিষয় হল, যদিও ভাগ্য নক্ষত্র দ্বারা পূর্বনির্ধারিত বলে তাঁরা মনে করেন, তবুও এসব কলামে জীবনের প্রতি প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সুপারিশ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়:

> Get away from that concern that seems to have no solution...
> Sulking over disappointing act of influential executive merely puts you deeper in disfavour.
> [Held, 1980: 97]

এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষী ঐ দিনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট রীতি ও কৌশল রচনার পেছনে তার 'জাদুকরী কর্তৃত্ব' প্রয়োগ করেছেন। তাঁকে লিখতে হয় এমনভাবে, যেন নক্ষত্রপুঞ্জ তাকে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হল, উপদেশের 'কাল্পনিক যৌক্তিকতা' তাঁর কর্তৃত্বকে অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাঁর জ্ঞানের উৎস বিমূর্ত এবং এই জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুসদৃশ ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তির ভাগ্য যে তাঁর ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত নয়, এ বিষয়টিকেই জ্যোতিষশাস্ত্র উপস্থাপন করে। অপূরণযোগ্য চাহিদা বা প্রয়োজনসমূহ ভুলে যেতে জ্যোতিষীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং ব্যক্তির কাজের প্রকৃতি, সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরবিন্যাস, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি যেসব বিষয় পরিবর্তন করা যাবে না, সেসব মেনে নিতেও তারা উৎসাহ জোগান। জ্যোতিষশাস্ত্রের পরিভাষায় 'যৌক্তিক' হওয়ার অর্থ হল, ব্যক্তিগত আগ্রহগুলো সামাজিক আবহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে নেওয়া। প্রাতিস্বিকতার বিকাশ ও স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদির ওপর জ্যোতিষশাস্ত্র জোর দেয়, আবার একই সঙ্গে বিদ্যমান অবস্থা ও কার্যরীতির সঙ্গে তাল মেলানো ও নির্ভরতার প্রতিও গুরুত্ব দেয়। গণমাধ্যমের অন্যান্য উৎপাদনের মতো জ্যোতিষশাস্ত্র বিদ্যমান সমাজবিন্যাসকে বিবেচনায় নিয়ে অন্য জগতে পলায়নের কৃত্রিম ও সংক্ষিপ্ত পথ নির্দেশ করে। আপাতদৃষ্টিতে নতুন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি হল অনচ্ছ ও জড় সমাজ-কাঠামোরই পুনর্গঠন। অ্যাডোরনোর ভাষায়:

> এই জ্ঞান যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার গভীরে প্রোথিত কারণগুলো ঢেকে দেওয়ার এবং যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই মেনে নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়াও অদৃষ্ট, পরনির্ভরতা ও আনুগত্যের বোধ দৃঢ় করার মাধ্যমে এটা ব্যক্তির যেকোনো বিষয়ে বস্তুগত শর্তাদি পরিবর্তিত করার ইচ্ছাকে পঙ্গু করে দেয় এবং ব্যক্তির যাবতীয় ভয়, দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তিকে একটি রাশিতে আবদ্ধ করে ফেলে, অবশ্যই ফাঁড়া কেটে যাওয়ার বা বিঘ্ন স্বস্ত্যয়নের আশ্বাস দেখিয়ে– প্রায় ক্ষেত্রেই একই পদ্ধতি বা উপকরণসমূহের সাহায্যে, যা পরিবর্তন রোধ করে। সুতরাং এ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কীভাবে এই জ্যোতিষশাস্ত্র বর্তমানের সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির প্রচলিত ভাবাদর্শসমূহের সার্বিক আদর্শ পূরণ করে এবং জনমানসে তাদের বর্তমান জীবনাবস্থা বজায় রাখার চিন্তা-চেতনাকে পুনরুৎপাদন করে। [Adorno, 1957: 88–89/অনুবাদ লেখকের।]

সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির আরেকটি উৎপাদন হচ্ছে জনপ্রিয় সংগীত। অ্যাডোরনোর মতে, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের সংগীত সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সংগীতের

পণ্যায়নের চেতনা এর কাঠামোতে পরিবর্তন এনেছে। বিশেষ করে, গণবণ্টন পদ্ধতি এবং যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের নতুন পদ্ধতিসমূহ (রেডিও, চলচ্চিত্র) ধ্রুপদি সংগীতে দুর্নীতি ঢুকিয়েছে; তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এর মৌলিক কাঠামো বারবার বিপন্ন হয়েছে। পুনরুৎপাদনের যান্ত্রিক পদ্ধতি এবং গণবণ্টন পদ্ধতি সংগীতের প্রাযুক্তিক কাঠামোর দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করেছে। লাইভ কনসার্টের ক্ষেত্রেও পরিচালক ও প্রযোজক দর্শক-শ্রোতাদের ধরে রাখার পথ খোঁজেন। অধিকন্তু, সংগীতের নতুন একটি ধারা বিকাশ লাভ করেছে, যার কাঠামো সম্পূর্ণভাবে বিনিময়-মূল্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সেই বিনিময়-মূল্য হচ্ছে পুনরুৎপাদনের নতুন কৌশল এবং জনগণের বিশ্রাম ও চিত্তবিক্ষেপ খুঁজে নেওয়ার চাহিদা। অ্যাডোরনো এ-জাতীয় সংগীতকে বলেছেন 'Popular music', যার অর্থ করেছেন তিনি 'লঘু সংগীত' (Light music) বা সম্পূর্ণভাবে বিনোদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত সংগীত। এর মধ্যে রয়েছে জ্যাজ, বিট, চলচ্চিত্র-সংগীত ইত্যাদি। সিরিয়াস সংগীতের সঙ্গে এই জনপ্রিয় বা লঘু সংগীতের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে অ্যাডোরনো বলেছেন, সিরিয়াস সংগীতের নান্দনিক নির্মিতি যেখানে তার বাস্তব পূর্বশর্ত এবং উৎপাদন ও বিদ্যমান সচেতনতার মধ্যকার বৈপরীত্যকে অতিক্রম করে যায়, জনপ্রিয় সংগীত সেখানে বোধগম্যতার বিদ্যমান রীতিকেই দৃঢ় করে। আর শ্রোতারা সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে এভাবে নিয়ন্ত্রিত যে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। জনপ্রিয় সংগীত হল সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির লাগসই উপকরণ। এটি বিদ্যমান অবস্থার আদর্শিক প্রবণতার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। রেডিওতে কিংবা সরাসরি কোনো কনসার্টে শোনা– যা-ই হোক না কেন, জনপ্রিয় সংগীতের পুনরাবৃত্ত ও অসংলগ্ন রাগ-রাগিণী, অতিরিক্ত জোরারোপ, উচ্চ গ্রাম ইত্যাদি সংগীতে পণ্যপূজা এবং শ্রোতাদের পশ্চাদ্‌গতির ইঙ্গিতবহ [Held, 1980: 102]।

জনপ্রিয় সংগীতের জগতে, রচনাকারী ও কর্তাব্যক্তিদের অভিপ্রায় নির্বিশেষে, সংগীত সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা নিবৃত্ত করতেই ব্যস্ত থাকে। সাধারণভাবে জনপ্রিয় সংগীত পুঁজিবাদী সমাজে মানুষকে অতিশয় 'পলায়নবৃত্তি' ও স্বস্তির ভাব' প্রকাশে প্রণোদিত করে। কিন্তু যে তৃপ্তি এবং মুক্তি এখানে পাওয়া যায় তা মূলত অলীক। সন্তুষ্টির এই অলীকতা ধরে রাখার জন্য বিনোদন ব্যবসাকে প্রতিনিয়তই নতুন ধারণা এবং 'ব্যতিক্রমধর্মী' কাজের সূচনা করতে হয়। এই প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টভাবে চলতে থাকে। ফলে সংগীতের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার

পর্যালোচকদের মতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়, মাতৃভূমি জার্মানি থেকে বিতাড়িত হওয়ার যন্ত্রণা, মার্কিন দেশে প্রবাস-জীবনে যান্ত্রিক কর্তৃত্ব ও আমলাতান্ত্রিকতার পীড়নদায়ী পরিবেশ এবং সে সময়ে ক্রমবর্ধমান গণযোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সর্বব্যাপী

বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি ব্যাপার অ্যাডোরনো, হর্কহেইমার ও অন্যান্য ফ্রাঙ্কফুর্ট তাত্ত্বিকদের পুঁজিবাদী গণসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল [Held, 1980; Bottomore, 1984; Kellner, 1989; Jay, 1973]। অন্যদিকে, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির আলোচনায় ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমালোচনাত্মক তত্ত্বের যে প্রভাব বিদ্যমান তার সঙ্গে কার্ল কর্শের 'সমালোচনাত্মক দর্শন' [Karl Korsch, 1970: 42] (যা দ্বারা তিনি মার্ক্সীয় মতবাদকে বর্ণনা করেছিলেন)-এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় বলে সমাজবিজ্ঞানী বটোমোর মনে করেন [Bottomore, 1984: 72]। এ বিষয়ে তিনি কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছেন [Bottomore, 1984: 45]: অন্য সমাজে সাংস্কৃতিক অবদমনের ধরনসমূহের সঙ্গে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির পার্থক্য কোথায়? খ্রিস্টধর্মের চার্চকেও তো ইউরোপের মধ্যযুগের সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি বলা যায়? যতটা এর প্রবক্তারা বলেন, সংস্কৃতি কি ততটাই ব্যক্তিনাশী, নাকি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট-তাত্ত্বিকেরা যে সাংস্কৃতিক অভিঘাতের মুখোমুখি হন সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণা তারই প্রতিক্রিয়া? বটোমোর আরও দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী সমাজে ভিন্ন মতাবলম্বন ও আন্দোলনের যেসব সুযোগ থাকে তার স্বীকৃতি সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তত্ত্বে নেই, এবং মার্কিউসে পরে কোনো এক সময়ে বিকল্প সংস্কৃতির (Counter culture) ধারণার কথা বললেও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দেননি [Bottomore, 1984: 45–46]।

ঢালাও পুঁজি-দাসত্বের পাশাপাশি কখনো কখনো প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রভৃতির ব্যাপারও বিরল নয়– এই ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তত্ত্বের সমালোচনা করার সুযোগ রয়ে যায়, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সংস্কৃতির বিভিন্ন ফর্ম-সংক্রান্ত ওইসব ওপরভাসা 'প্রতিবাদ' কখনোই পুঁজিবাদ-বিরোধিতা পর্যন্ত গড়ায় না। মলয় রায়চৌধুরীকে উদ্ধৃত করে বলা যায়:

> ... প্রযুক্তি আর আর্থিক সামর্থ্যে মিডিয়া নিজেকে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে, ওই সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তার নিজের বিরোধিতাকেও ভালোভাবে প্যাক করে প্রচার চালিয়ে চড়া দামে বেচে দিতে পারে। প্রতিবাদের দোকান, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার দোকান, দায়বদ্ধতার দোকান, দ্রোহের দোকান, নিজের পয়সায় খুলে দেবে ওরা। [রায়চৌধুরী, ১৯৯৭: ১৭]

এসব এবং এ রকম আরও নানা সমালোচনা সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রির ধারণার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মৌলিক কোনো প্রশ্ন উত্থাপনে সক্ষম বলে প্রতীয়মান হয় না, কেননা অ্যাডোরনো ও হর্কহেইমারের মতে [Adorno and Horkheimer, 1972 quoted in Held, 1980: 04] এমন কিছু আধুনিক শিল্প রয়েছে, যা আত্তীকরণকে ঠেকায়। 'Art and mass culture' শীর্ষক প্রবন্ধে হর্কহেইমার কতক শিল্পকর্মের কথা বলেছেন, যা আজও মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, যা ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রগাঢ়তার পুনরুৎপাদন ঘটায়। যেমন, ট্রাকলের কবিতা, পিকাসোর গুয়ের্নিকা, শোয়েনবার্গের কম্পোজিশন ইত্যাদি। অর্থাৎ ভিন্ন মতালম্বনের সুযোগের কথা সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তত্ত্বে একেবারে

অনালোচিত থাকেনি। সবচেয়ে বড় কথা হল, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তত্ত্বে তৎকালীন সমগ্রতাবাদী সমাজের চিত্র যথেষ্ট নিপুণভাবে অঙ্কিত রয়েছে। তাই ডগলাস কেলনার যথার্থই বলেছেন:

> ...the critical theory model of the media and society described rather accurately certain domminant trends and effects during the post-world war-II cold war period, when the media were enlisted in the anti-communist crusade and when media content was subject to tight control and censorship, a situation signated by Adorno and Horkheimer... [Kellner, 1989: 134]

আমাদের সমকালীন সমাজে, নয়া এককেন্দ্রিক পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থায়, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ তথা সংস্কৃতির বেচাকেনা-আগ্রাসন বিশ্লেষণেও সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তত্ত্বের মূল্য কম নয়। 'বিংশ শতাব্দীর উপান্তে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' প্রবন্ধে জেমস পেত্রা বর্তমান সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্লেষণ করেছেন, সেটিকে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি তত্ত্বেরই সৃজনশীল সম্প্রসারণ বলে বিবেচনা করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন:

> শিল্পপণ্যের রপ্তানি ছাড়িয়ে বর্তমানে বিনোদন-পণ্যের রপ্তানি পুঁজি বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মুনাফা লাভের অন্যতম উৎস। রাজনীতির ময়দানে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ জনগণকে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি-মূল ও সংহতির ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে মিডিয়াকৃত 'আকাঙ্ক্ষা', যা প্রচারের দ্বারা নিয়মিত পরিবর্তন করা হয় তার শরিক করে ফেলতে বিশাল ভূমিকা পালন করে। এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণকে শ্রেণী ও লোকসমাজের যোগসূত্রগুলো থেকে উচ্ছেদ করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও পরস্পরবিচ্ছিন্ন একক নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত করে। ...সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিশ্বজোড়া শোষণ-ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য মাত্রা, যার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে পশ্চিমী শাসকশ্রেণীর এক সুসম্বন্ধ অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য। ...শোষিত জনগণের মূল্যবোধ, আচরণ, প্রতিষ্ঠান ও অভিন্নতা সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীদের স্বার্থের অনুকূল করে গড়ে তোলা। ...ভ্যাটিক্যান, বাইবেল বা রাজনৈতিক ব্যক্তিবিশেষের গণসম্পর্ক স্থাপনের অলংকারশাস্ত্রের তুলনায় হলিউড, সিএনএন ও ডিজনিল্যান্ড বর্তমানে বিশ্বে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি। ...পুঁজিবাদের বাস্তব অস্তিত্বের আসুরিকতা এবং মুক্তবাজারের মোহনীয় হাতছানির মধ্যকার সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার প্রতিরূপই হচ্ছে একটি সামগ্রিক সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আরেকটি মূল লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক– নিজস্ব কৃষ্টিপণ্যের জন্য বাজার দখল করা। দেখা গেছে, মার্কিন পুঁজি যতই তার গণযোগাযোগের জাল

> পৃথিবীব্যাপী বিস্তার করছে তার সম্পদ ও শক্তির মূল উৎস হয়ে উঠছে গণমাধ্যম। সব থেকে বিত্তশালী ৪০০ আমেরিকাবাসীর মধ্যে ১৯৮২ সালে ৯.৫ শতাংশ তাদের সম্পদ আহরণ করেছিল মাস-মিডিয়া থেকে এবং তা বেড়ে ১৯৮৯ সালে হয়েছে ১৮ শতাংশ। বর্তমানে পাঁচজন ধনী আমেরিকাবাসীর মধ্যে অন্তত একজন তার সম্পদ আহরণ করে মাস-মিডিয়া থেকে। সাংস্কৃতিক পুঁজিবাদ আমেরিকায় সম্পদ ও ক্ষমতার উৎস হিসেবে শিল্পজাত উৎপাদনকে স্থানচ্যুত করেছে। [পেত্রা, ১৯৯৪: ৬–৭[

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণাটি তার প্রাসঙ্গিকতা এখনো হারায়নি, কেবল প্রসঙ্গের মাত্রাগত তারতম্য হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমাদের দেশে ছাত্রশিক্ষকদের কাছে সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণার সবচেয়ে বড় প্রাসঙ্গিকতা গণযোগাযোগ গবেষণার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। যেভাবে গণযোগাযোগ গবেষণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে শুরু করেছিল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ, আমাদের দেশেও সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি ধারণা নিয়ে ব্যাপক গবেষণার সূত্রপাত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেলনারের [Kellner, 1989: 134] মূল্যায়ন বিশেষভাবে স্মর্তব্য– ফ্রাঙ্কফুর্ট-তাত্ত্বিকেরা শুধু যে সমালোচনাত্মক যোগাযোগের রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন, তা-ই নয়, তাঁরাই প্রথম সামাজিক তত্ত্ব গঠনে গণযোগাযোগ ও সংস্কৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

পেত্রা, জেম্‌স [১৯৯৪], *বিংশ শতাব্দীর উপান্তে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ* (বাংলা অনুবাদ, দেবদাস ব্যানার্জী), *সাপ্তাহিক কালান্তর*।

রায়চৌধুরী, মলয় [১৯৯৭], *পোস্টমডার্নিজম: অধুনান্তিকতা*, সম্পাদিত সমীর রায়চৌধুরী, *হাওয়া ৪৯*, হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী, কলিকাতা।

রায়, দেবেশ [১৯৯৪], *উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

Adorno, Theodor [1957], *Television and the patterns of mass culture*, in *Mass Culture: The Popular Arts America*, ed. B. Rosenberg and D. Manning White, London.

Adorno, Theodor [1975], *Culture industry reconsidered* (Trans. Anson G. Robinbach), *New German Critique*, Vol. 6.

Adorno, Theodor [1974], *The stars down to earth: the Los Angeles Times Astrology Column*, *Telos*, No. 19.

Adorno, Theodor and Max Horkheimer [1972], *The Dialectic of Enlightenment*, English edition, Herder & Herder, New York.

Adorno, Theodor and Max Horkheimer [1993], *The culture industry: enlightenment as mass deception*, in *The Culture Studies Reader*, ed. Simon During, Routledge, London.

Bengamin, Walter [1969], *The work of art in the age of mechanical reproduction* in *Illuminations*, ed. Hannah Arendt, (Trans. Harry Zohn), Schocken Books, New York.

Bottomore, Tom [1984], *The Frankfurt School*, Ellis Horwood Limited Publishers, Sussex.

During, Simon (ed.) [1993], *The Culture Studies Reader*, Routledge, London.

Held, David [1980], *Introduction to Critical Theory*, University of California Press, Los Angeles.

Horkheimer, Max [1941], *Art and mass culture* SPSS, Vol. 9, No. 2.

Jay, Martin [1973], *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923–1950*, Little Brown and Co., Boston.

Kellner, Douglas [1989], *Critical Theory: Marxism and Modernity*, The John Hopkins University Press, Baltimore.

Korsch, Karl [1970], *Marxism and Philosophy*, New Left Books, London.

Marcuse, Herbert [1968], 'The affirmative concept culture', *Negations: Essays in Critical Theory*, Beakon Press, Boston.

ফাহ্‌মিদা মঞ্জু মজিদ

.....

শিশু ও টেলিভিশন

সময়ের এমন একটা স্টেশনে আমাদের গাড়ি এসে থেমেছে যেখানে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে চাইছেন সাম্প্রতিক পৃথিবীতে শিশুমঙ্গলের জন্য যা যা আবিষ্কৃত হচ্ছে তা যথার্থই কি শিশুর জীবনকে সুন্দরতর করছে, নাকি আর কিছু? শিশুকর্মীরা অলসতা করছেন না বলেই ধরা যাক। তবে এটা ঠিক যে নানান রকম অভিভাবক ও ব্যবসায়ীদের মাঝখানে পড়ে শিশুদেরই বেশি খাবি খেতে হচ্ছে। এত আনন্দ এত হাসি-গান– তবু সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের শিশু কিশোরদের এত দুরবস্থা কেন তা খোঁজ করে দেখা প্রয়োজন। শৈশব পার হওয়া মাত্র কৈশোর-এর কুয়াশায় কেমনভাবে এগিয়ে চলেছে?

আধুনিক যুগে যতরকম উদ্দীপক (stimulus) একেবারে প্রাক-প্রাথমিক বয়স থেকে শিশুর ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল টেলিভিশন। বিদেশি (USA, UK, Australia) পরিসংখ্যান-এ শতকরা ৯৮% পরিবারে আজকাল একটা করে অন্তত T.V. set থাকেই। আমাদের দেশের (socio-economic status) মতো আয় অনুযায়ী সমাজে বিভিন্ন স্তরের বিভক্তি এত প্রকট নয়, তাই সেখানে এসব পরিসংখ্যান নেওয়া সহজও। সমাজের একটা বড় অংশের, অর্থাৎ শিশুদের, টেলিভিশনের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক তা যাচাই করা ও সমাজের উন্নয়ন ও অবক্ষয়ে টেলিভিশনের কী ভূমিকা তা আলোচনা করা আজ আমাদের কর্তব্য।

টেলিভিশনের সাথে শিশুর সম্পর্ক

শিশু পালনে আজকাল নানারকম মতভেদ দেখা যায়। যেহেতু সমাজের এক-এক অর্থনৈতিক স্তরে পরিবারের নক্সা এক-এক রকম, কোনো একটি বিশেষ ফর্মুলা অনুসারে শিশুদের মানুষ করা সম্ভব নয়। তাই নানান আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ কেমন করে সম্ভব সেই জ্ঞানটা নতুন মা-বাবা ও শিক্ষকদের দেওয়া আমাদের কতর্ব্য। আমার বিশ্বাস সমাজের অবক্ষয়ের পিছনে এই অসুষ্ঠু বা ভুল

upbringing। সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে যে শিশু পালিত, সে বড় হয়ে একজন সুন্দর ব্যক্তিত্বের মানুষ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে এই আমাদের আশা– তাই টেলিভিশন শিশুজীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

অনেকে মনে করেন 'টেলিভিশন' যদিও একটা সামান্য ক্ষুদ্র ব্যাপার– তবু এর প্রভাব শিশুর জীবনে খুবই বিস্তারিত হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ বিষয়ে বহু গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। যাঁরা শিশু ও টেলিভিশন এই দুইয়ের সাথেই জড়িত যেমন, পিতামাতা, অন্যান্য অভিভাবক, শিক্ষক, সরকারি শিশু কর্মকর্তা, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিশুদের নিয়ে যারা পড়াশুনা করেন সেই সব ছাত্র ও ছাত্রী ও মনোবিজ্ঞান জগতের শিশুকর্মী তারা হয়তো এই অভীক্ষামালার ফলাফল সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হবেন। এই দুই গবেষক, বব হেজ ট্রিপ্ (University of Western Sydney) যিনি শিশুদের ভাষাতত্ত্বের ওপর নানান বই লিখেছেন, ও ডোভিড (University of Murduch, West Australia) শিক্ষাবিভাগের এক অন্যতম বিশেষ প্রফেসর, আপনাদের মনে জেগে-ওঠা শিশুকল্যাণ সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবেন তাঁদের খুঁজে পাওয়া তত্ত্বের মাধ্যমে। বিশেষত শিশু দর্শকশ্রোতার সাথে টেলিভিশনের সম্পর্ক সম্বন্ধেই বেশি গবেষণা করা হয়েছে। দেখা হয়েছে যে সাধারণ শিশু কেমন ভাবে টেলিভিশনকে তার জীবনে স্থান দিয়েছে। তাঁরা বলেছেন উন্নতশীল দেশে শিশু লালনের মাঝে টেলিভিশনের যতটুকু ভূমিকা তা সম্বন্ধে অভিভাবক ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ কেউ-ই অচেতন থাকলে শিশুকল্যাণের অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিশুরা স্বভাবগত ভাবেই TV -র খুব শক্তিশালী ও সক্রিয় দর্শকশ্রোতা হয়ে থাকে। যখন তারা কোনো অনুষ্ঠান দেখে তখন, তা বেশ অর্থবোধক ও কৃষ্টিসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখে। যদিও সব অনুষ্ঠানের মানই শিশুর জন্য উপকারী নয় তবু অনুষ্ঠানের মান তারা নিজেরাই মূল্যায়ন করতে বেশ সক্ষম।

বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখাও ভালো নয় শিশুদের জন্য, এতে শারীরিক ও মানসিক দুইরকম ক্ষতিই সংগঠিত হয়। বেশি TV দেখে যে সব শিশু, গবেষণা করে দেখা যায় যে তাদের শরীরের ওজন খুব বেশি। বেশি TV যারা দেখে, তারা সময় নষ্ট করে ও কিছু খারাপ প্রোগ্রাম দেখে বখাটে হয় তা সত্যি। এই কুশিক্ষা অনেক সময় অন্যান্য ভালো শিক্ষাকেও দূষিত করে। অভিভাবকদের উচিত শিশুদের বয়সানুযায়ী সময় ও সূচি নির্ধারণ করে দেওয়া। ব্যাপারটা একটা স্বাভাবিক ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় করতে হবে যাতে শিশুরা এটাকে বাধ্য-বাধকতার এক নির্যাতন মনে করে বেঁকে না বসে। মাঝে মাঝে শিশুদের সাথে বসে কোনো রম্য অনুষ্ঠান দেখে মিলেমিশে নিছক আনন্দ ভোগ করতে পারলে শিশুর মানসিকতা আরও সচ্ছন্দতা লাভ করবে। শিশুর প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গিয়ে বড়দেরও যে কোনো বিষয়ে জ্ঞানের ওজন বৃদ্ধি হয়। ভালো উন্নতমানের অনুষ্ঠান দেখে বা খবর শুনে শিশু নিজেই জবাব খোঁজার

আগ্রহে অন্য বই পড়ে বা জ্ঞান আহরণ করতে উৎসুক হয়। যেটা TV দেখার ভালো দিকগুলোর অন্যতম।

নীতিমূলক অনুষ্ঠান

অতিরিক্ত ethics বা নীতিমূলক অনুষ্ঠান যে সবসময় শিশুকে আকৃষ্ট করবে তা তা না-ও হতে পারে। অনুষ্ঠানটি শিক্ষণীয় হবে, অথচ শিশুর মনোরঞ্জনও করবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, এই চেষ্টাই করতে হবে TV কর্তৃপক্ষকে।

অনেক সময় বিপরীত ফল হয় এসব অনুষ্ঠানের প্রভাবে। শিশু যদি বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান যথেষ্ট আকর্ষণীয় হচ্ছে না বলে বিরক্ত হয়ে টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়, তা ক্ষতিকর হয় যেহেতু ঐ বিষয়টি থেকেই শিশুরা সরে যায়। তাই শিশুদের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর দিকে পরিচালক-প্রযোজকের একটু বেশি সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণ সামাজিক দৈনন্দিন পটভূমিকায় ফেলে অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য পেশ করলে তা শিশুদের কাছে স্বাভাবিক ভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। শিশু দর্শকশ্রোতাদের ওপর আরও একটু ভরসা ও বিশ্বাস-এর প্রয়োজন। শিশু পছন্দ করে তেমন অনুষ্ঠান– যা বিশ্বাসযোগ্য, সম্ভাব্য ও প্রমাণসাপেক্ষ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু নীতিবাক্য তাদের মনে ধরে না।

বেচারা টেলিভিশন

টেলিভিশনকে প্রায়শ 'যতদোষ নন্দ ঘোষ'– এ রকম অবস্থায় ফেলা হয়। একটি ছেলে যদি একটি সংসারে মাদকদ্রব্য সেবন করে সঙ্গে সঙ্গে দোষ পড়ে ঐ বাক্সটির। যেন বাবা-মা, দাদা-দাদীর কোনো দায়িত্বই নেই; dish না থাকলে যেন ফেরেশতা বনে যেত ছেলেটি। ১৬ বছরের মেয়ে প্রেমে পড়ে পাশের বাড়ির ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার দোষটাও (scapegoat) এই TV -ই। তাই মাঝে মাঝে মায়াও লাগে ঘরের কোণে এই নিরীহ যন্ত্রটির জন্য। আমাদের দেশে শিশুরা হয় মা-বাবার সংসারের সাথে নইলে টেলির সাথে বসবাস করে। আয়া তার সঙ্গী হয়। এই জন্যেই প্রায়ই ফাঁকটা রয়ে যায়। অভিভাবকদের এইখানে একটা বড় পরিচালনার ভূমিকা আছে। সবকিছু সংসারের শৃঙ্খলা ও ছন্দময়তার সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে। শুধু একটা উদ্দীপকের ঘাড়ে দোষ চাপালেই চলবে না।

বিদেশে শিশু অনুষ্ঠান

Hong Kong ও Korea-তে অনুষ্ঠান করলাম যখন একটা ব্যাপারে বড় আনন্দ পেলাম, শিশুরা অত্যন্ত সুন্দর-মিষ্টি সারল্যে পরিপূর্ণ অথচ অত্যন্ত মেধাবী ও চটপটে! মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে Korea-তে ওরা KSB'র অনুষ্ঠানে দু'টো বাংলা গান ঝটপট শিখে

সেইদিনই record (রেকর্ড) করে ফেলল। অবিশ্বাস্য! উচ্চারণ এত ভালো। সিলেটের গ্রামাঞ্চলের গান সম্পূর্ণ বিদেশি শিশুদের কণ্ঠে অপূর্ব লাগল শুনতে। ওরা গাইল,

"লীলাবালী লীলাবালী
ভরযুবতী সইগো
কী দিয়া সাজাইমু তরে?"

আরও গাইল রবীন্দ্র সঙ্গীত, "মম চিত্তে নিতিনৃত্যে কে যে নাচে
তা তা থৈ থৈ॥"

ওখানে সৃজনশীলতাও যেমন প্রচুর, শৃঙ্খলাও তেমন অনবদ্য। এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিবন্ধী শিশুও ছিল। দিল্লীতেও অনুষ্ঠান করে বড় ভালো লেগেছে। বাচ্চারা আমাকে কী যে আদর করল– তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। টেলিভিশন প্রডিউসার প্রত্যেকটি প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে কত-যে সম্মানের সাথে মিষ্টি ব্যবহার করল তা দেখবার মতো। অনুষ্ঠান রেকর্ড করতে আমার কোনো কষ্টও হল না। নেপালেও তাই। Studio-তে সুষ্ঠু-ব্যবস্থা। Producer খুব সচেতন।

Norway-তে বরফের মধ্যেও অনুষ্ঠান করেছি নির্ঝঞ্ঝাটে। তারা কেউ আমার ভাষাও জানত না তবু কত আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান দেখানো গেছে জনসাধারণকে।

শিশুদের অনুষ্ঠানে শিশুরা আনন্দ উপভোগ করছে এ দৃশ্য দেখতে শিশুরাই পছন্দ করে। B. B.C.-তে তাই You & Me নামে এক্কেবারে ছোট্ট শিশুদের অনুষ্ঠানের জন্য যখন প্রথম অডিশন দিই তখন তা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম। শতশত শিশু খুশি হয় শুনে যে আমি ঐ ধরনের অনুষ্ঠান করছি। গল্পবলার ও খেলাধুলার নানান মুহূর্তে শিশুদের মনমাতানো অনুষ্ঠান সেসব। U.S.A.-তে Sesame Street নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় শিশু অনুষ্ঠানটিতে কত-যে গবেষক ও মনোবিজ্ঞানী কাজ করে। অনুষ্ঠানটা এত ভালো লাগে– জীবনের সঙ্গে এত সহজভাবে সংশ্লিষ্ট তাই। মোটকথা দুর্নীতি থাকলে সেখানে সার্থক শিশু অনুষ্ঠানের স্থান খুব অল্প।

টেলিভিশনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড (Violence) ও শিশুদর্শকশ্রোতার ওপর তার প্রভাব:

নাট্যকার ব্রেখ্‌ট্ Brecht (১৯৬৮) বলেছেন যে সবার জন্যই বাস্তবকে চোখে দেখা শিক্ষামূলক।। তাই টেলিভিশনের গল্পগুলো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিমূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে প্রকৃত সমাজগঠনে। আবার সম্প্রতি কিছু মূল্যবান গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, যত বাস্তবের কাছাকাছি থেকে গল্প বা ছবির বিষয়বস্তু নেওয়া হয় ততই শিশুদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয়। অর্থাৎ সিনেমা বা টেলিভিশনের সিরিজগুলোতে যতই মারামারি কাটাকাটি থাকুক-না কেন তা যত বেশি বাস্তবধর্মী হয় তত বেশি সেই উগ্রতার প্রভাব শিশুদের ওপর পড়ে ও তার অনুকরণে শিশু বিশৃঙ্খলতা শেখে। একটা রূপকথার ছবিতে রাজা ও রাক্ষসের মারামারি শুধু গল্পের বা কল্পনার রাজ্যেই থেকে যায় কিন্তু চোর-ডাকাতের সত্যিকার গল্পে যখন খুনাখুনি হয় তখন

শিশুরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখে অনুকরণ করতে উৎসুক হয়। তাদের চরিত্রে ঐ ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ে, [Himmelweit (১৯৬৮), Hawkins (১৯৭৭), Noble (১৯৭৫)] ও ক্রমে সমাজে অবক্ষয় দেখা দেয়।

পরস্পরবিরোধী নানান মতবাদও আমরা খুঁজে পাই। তবে নিঃসন্দেহে শিশুমন সংযোগ খোঁজে, একথা সত্য। কল্পনাপ্রবণ হলেও বাস্তবের ঘটনাগুলোকেই তারা বিশ্বাস করে। তাই তাদের মন জয় করার বড় পদ্ধতি হল যেমন করে হোক 'মজার' বা আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে অনুষ্ঠানগুলোকে। কি ভালো কি মন্দের বিচার তারপরে। ঐতিহাসিক ও গবেষক কুহুনের (T.S.Kuhun, ১৯৭০) বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় মূল থিওরির সাথে একমত হয়েছেন প্রায় সবাই। তাঁর টেলিভিশন-সংক্রান্ত গবেষণা শুরু হয় ১৯৪০ সনে, যখন থেকে টেলিভিশনের ব্যবহার প্রসার লাভ করে। তখন প্রথম প্রশ্ন উঠে টেলিভিশনের নাটকের/মুভির উগ্রতা ও ঔদ্ধত্য কি শিশুদের চরিত্রতে প্রভাব বিস্তার করছে? ১৯৫০ সনে তার উত্তর দিয়েছেন বহু গবেষক ও মনোবিজ্ঞানী। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী H.J.Eysenck এ বিষয়ে খুবই সতর্কতার সাথে নানান গবেষণা চালিয়ে গেছেন ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন (১৯৭৮)। সৌভাগ্যবশত ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করারও সুযোগ আমার হয়েছিল London-এ (১৯৮৪)। আমি ব্যক্তিগতভাবে শিশুঅনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট এ কথা জেনে খুশি হয়ে মিটিং-এ ডেকেছিলেন। আমার উৎসাহ দেখে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন তাঁর একটি প্রকল্পে যা Professor Naiz-এর সঙ্গে গবেষণা করেছেন। টেলিভিশনের সেক্স ও ভায়োলেন্স-এর প্রভাব কতখানি শিশুর ওপর পড়ে তারই পরীক্ষা ছিল। এতে স্পষ্ট করে তাঁরা বলেছেন যে কোনো বিশেষ (set circumstance) পারিপার্শ্বিকতা থাকাকালীন শিশু সন্ত্রাসী-কর্মকাণ্ড টেলিভিশনে দেখে তা অনুকরণ করে সন্ত্রাসী কাজ করতে উদ্যম পেয়েছে তা বলা কঠিন। কিম্বা কোনো স্বাভাবিক অব্যবস্থায় প্রয়াসে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে শিশু হিংস্র আচরণ করেছে বা অন্যের ওপর নির্যাতন করেছে তা বলা মুশকিল (১৯৭৮). Prof. Eysenck-এর বিশ্বাস একমাত্র TV স্ক্রিন-এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখলেই শিশুরা নষ্ট হয় না– অন্যান্য নানান অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন হয় যেমন– অন্যান্য অসৎ সঙ্গ, অতিরিক্ত মদ্যপান, মিথ্যাকথা বলা যার ছোট থেকে অভ্যাস। বাড়ির বিষাক্ত আবহাওয়া, সংসারের সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য, ডিভোর্সড পরিবার বা যে সব পরিবারে চুরি-ডাকাতি চলছে বা দুর্নীতি মামুলি ব্যাপার। এই সব গবেষণা পক্ষপাতদুষ্ট হলে চলবে না। একটি শিশু যদি সুন্দর পরিবেশে সুশিক্ষায় গড়ে উঠে তবে শুধু টেলিভিশনে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তার চরিত্রে কুপ্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে না কোনো মতেই। সুতরাং শুধু মিডিয়াতে ভায়োলেন্স নিয়ন্ত্রণ করেই একটি শিশুকে তার প্রভাব থেকে মুক্ত করা যাবে না– যদিও এ দিকে দৃষ্টি রাখা সমাজের সকল প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব। সরাসরি আলোচনায় Prof. Ian Hawarth, Head,

Psychology, University of Nothingham বলেছেন frastration, বর্ণবৈষম্য বা Prejudead family-তে মানুষ হওয়া শিশুরাই বেশি কুপ্রভাবের শিকার।

কতখানি মন্দ প্রভাব বিস্তার করে কিছু অন্যান্য সত্য। (ক) শিশুর পারিপার্শ্বিকতা (খ) শিশুর প্রি-গ্রোথ বা সঙ্গ (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা (ঙ) পরিবারের নক্সা (চ) শিশুর বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি।

নগর / নিবন্ধ

হোমায়রা আহ্‌মেদ

.....

যানজটজনিত স্বাস্থ্যগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি

ঢাকার যানজটে প্রভাবিত হন না, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই যানজট এমন একটি পর্যায়ে এখন পৌঁছে গিয়েছে যে এর নিয়ন্ত্রণ আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। পরিবেশগত ভাবে এর প্রভাবের কথা বাদ দিলেও জনগণের শরীর, স্বাস্থ্য, ও মনের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তাকে অবহেলা করা চলে না। সময় ও শক্তির এই নিদারুণ অপচয়ের রয়েছে স্বাস্থ্যগত এবং অর্থনৈতিক দিকও। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

একজন সাধারণ ঢাকাবাসী (average individual) প্রতিদিন গড়ে এক থেকে পাঁচ ঘণ্টা যানজটে কাটান। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষ, ডাক্তার, নার্স, পেশাজীবী, ছাত্রছাত্রী, গৃহিণী, শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ–সর্বস্তরের মানুষ। ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত এই সব মানুষের প্রত্যেকের ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ ভিন্ন। তবে সামগ্রিকভাবে সকলের ক্ষতিগ্রস্ততাকে যোগ করলে তা একটি বিশাল আকার ধারণ করে। যানজটের কারণে, প্রথমে যে ক্ষতিটি হয় তা হল দূষণজনিত স্বাস্থ্যহানি। আবার এ দূষণের মধ্যে রয়েছে শব্দদূষণ এবং বায়ূদূষণ। প্রথমেই আসা যাক শিশুদের প্রসঙ্গে।

যানজটের কারণে সৃষ্ট শব্দদূষণ ও বায়দূষণে শিশুদের মানসিক গঠন ও বিকাশ বিঘ্নিত হয়। বিভিন্ন স্বাস্থ্যসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বিকট ও আকস্মিক শব্দদূষণের কারণে শিশুদের কর্ণপটহের গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। কমে যায় শ্রবণশক্তি। এর পরোক্ষ প্রভাব হিসেবে তাদের মস্তিষ্কের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতার স্থায়ী ক্ষতি হয়, মোটর নিউরোনের কার্যক্রমের ওপর পড়ে নেতিবাচক প্রভাব। ফলে অনেক শিশুর স্থায়ী আংশিক মনোবৈকল্য দেখা দেয়। হাত-পায়ের ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা হয়; সৃষ্টি হয় মানসিক অস্থিরতা। ফলে এইসব শিশুরা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে যায়; বড় হয় এক ধরনের অপূর্ণতা নিয়ে। বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয় এবং অসহিষ্ণু আচরণের পেছনে বিদ্যমান এই দূষণগত দিকটি সম্পর্কে আমরা অনেকেই সচেতন নই। অথচ সমাজের এই অস্থিতিশীলতার জন্য ভুক্তভোগী আমরা সকলে।

আমরা প্রত্যেকেই জানি যে নবজাতক তার ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমজমের অর্ধেক পায় তার মায়ের কাছ থেকে আর বাকি অর্ধেক পায় তার বাবার কাছ থেকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে মা-বাবার জীবনযাপনগত বৈশিষ্ট্য তাদের শিশুরা জন্মগতভাবে নিয়ে আসে। তাই যে মা এবং বাবা বায়ু ও শব্দদূষণজনিত দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির অভাব এবং মানসিক অস্থিরতায় আক্রান্ত হন, তাদের সন্তানরা নিজেদের জীবনে সেই ইন্দ্রিয়গত সীমাবদ্ধতা বহন করে। আদিম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের FIGHT OR FLIGHT RESPONSE যেমন আমরা এখনও বহন করে চলছি, তেমনি এই পরিবেশদূষণ জীবনবাহিত অস্থিরতার আকারে আমাদের স্থায়ী ক্ষতির কারণে পরিণত হচ্ছে। কেননা শব্দদূষণ জরায়ুর গঠন বাধাগ্রস্ত করে এবং সৃষ্টি করে জন্মগত মনোবৈকল্যের। ধ্বংস করে দেয় শরীরের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, ফলে গর্ভস্থ সন্তানের পরিপূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় মারাত্মকভাবে। আমাদের যানবাহন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে ন্যূনতম খরচ করতে অনীহা যে বায়ুদূষণ ঘটায়; ট্রাফিক আইন মেনে চলাচলের মানসিকতা না-থাকা জনিত অসহিষ্ণুতা সজোরে হর্ন বাজানোর মাধ্যমে যে শব্দদূষণ ঘটায়– তার দায় যে বহন করে চলেছে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম, তা নিয়ে আর কতদিন আমরা অজ্ঞ থাকব?

শুধু শিশু এবং নবজাতক নয়, প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের হাইপার টেনশন, অনিদ্রা, বিরক্তি, রক্তনালীর প্রদাহ ও সংকোচন, হৃদরোগ এবং সন্তান-উৎপাদনশীল ক্ষমতা হ্রাসের পেছনে রয়েছে শব্দদূষণের প্রত্যক্ষ অবদান। ২০০৭ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় হৃদরোগের অন্যান্য কারণের চাইতে উচ্চ শব্দজনিত কারণটির প্রভাব পূর্ব-ধারণার চাইতে অনেক বেশি। এ গবেষণাটির অন্যতম পুরোধা ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক ড. দীপক প্রসার-এর মতে কর্মক্ষেত্রের বাইরে শব্দদূষণের আন্তর্জাতিক রূপটি নিয়ে গবেষণা কম থাকার কারণে বিজ্ঞান এবং চিকিৎসকরা আগে বুঝতেই পারেননি যে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন সরবরাহ কম হবার কারণে সৃষ্ট করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ এটিই। বয়োঃজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের

স্বাস্থ্যের ওপর এই যানজটজনিত বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় বর্তমানে উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত সমাজ পর্যন্ত হাঁপানি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, অ্যাজমা, এবং নানা ধরনের টিউমার ও ক্যান্সার জাতীয় রোগের প্রকোপ আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। বয়োঃজ্যেষ্ঠ নারী-পুরুষের অনেকেই যানজটে উঁচু হর্নের শব্দে আংশিক বা পূর্ণ বধিরতার শিকার হন। কিন্তু পূর্ণ বধিরতার শিকার হবার আগে পর্যন্ত আমাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হই না বলে এ বিষয়টি রয়ে যায় লক্ষের অগোচরে। আবার স্ট্রোক, উচ্চরক্তচাপ– এসবও বাড়িয়ে দেয় বায়ূদূষণ ও শব্দদূষণ দুটোই।

যানজটে আমাদের জ্বালানিশক্তির অপচয় একটি ব্যাপক খাত। প্রতিটি সিগন্যালে যেখানে গড়ে ২ থেকে ৪ মিনিট একটি যানবাহনের অপেক্ষা করার কথা, সেখানে আমাদের গড় অপেক্ষা-সময় ৫ মিনিট থেকে ৪৫ মিনিট। অধিকাংশ যান্ত্রিক যানবাহনেরই চালকই এই সময়টিতে ইঞ্জিন চালু রাখেন। ফলে অপচয় হয় মূল্যবান জ্বালানির। আবার চালকদেরকেও এসব ক্ষেত্রে পুরোপুরি দোষ দেয়া যায় না, কারণ যেহেতু এদেশে যানচলাচল সিগন্যাল বাতি নয়, বরং ট্রাফিক পুলিশের হ্যান্ড সিগন্যালের ওপর নির্ভর করে, তাই ইঞ্জিন বন্ধ করলে যখন আবার যানবাহন চলতে শুরু করে, তখন তার বিলম্বিত STARTING TIME অন্য যানবাহনের চালক ও যাত্রীদের বিরক্তি উৎপাদন করে।

প্রতিদিন যাত্রীভেদে প্রায় এক থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় আমাদের যানজটের কারণে নষ্ট হয়। এই সময় নষ্টের পরিমাণ নির্ভর করে একজন ব্যক্তি কতটুকু পথ প্রতিদিন ভ্রমণ করছেন, তার ওপর। আবার এই সময় নষ্টের সুযোগ-ব্যয় বা OPPORTUNITY COST নির্ভর করে ব্যক্তির বয়স, পেশা, শ্রেণী এবং সামাজিক অবস্থার ওপর। কখনো কখনো সেই সুযোগ-ব্যয় বর্তায় রাষ্ট্রের ওপরও। সরকারি কর্মচারী, যারা অফিসের গাড়িতে যাতায়াত করেন, তাঁর প্রতিদিন ন্যূনতম ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা যানজটের কারণে রাস্তায় কাটান। ফলে অফিসে পৌঁছাতে তাঁদের যে ৩০ মিনিট থেকে ৯০ মিনিট বিলম্ব হয়, এই সময়ে সেবাবঞ্চিত হন সাধারণ মানুষ। আবার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৩ দিন দেরি করে পৌঁছালে যেহেতু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১ দিনের বেতন কাটা যায়, সে কারণে তিনিই ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। আর সময় নষ্টের কারণে কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়ে উৎপাদনশীলতা হ্রাস তো আছেই।

মজুরি বা বেতন হ্রাস পাবার ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তিগত মনে হলেও সামষ্টিক খাতে এর মোট পরিমাণকে অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় নেই, কেননা সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, এমনকি INFORMAL SECTOR (অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অসংগঠিত খাত) ও যানজটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ খাতগুলোর ক্ষতি মূলত হয় এদের কর্মীদের প্রকৃত কর্মক্ষমতা নষ্ট, কাঁচামাল সরবরাহ এবং যোগান ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক বিলম্বের কারণে, যা স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা কমিয়ে দেয় আশংকাজনক হারে। তবে অনেকে মনে করেন, হকার এবং অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পসারজীবী, ছিন্নমূল শিশু ও নারীরা এই যানজটের কারণে কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারছে। কিন্তু বাস্তবে সামাজিক ক্ষতির তুলনায় এই উপার্জনের পরিমাণ খুবই ক্ষুদ্র।

যানজট সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল স্ট্যাডিতে দেখা গিয়েছে যে, নৈতিক অবক্ষয় এবং সেইজনিত অপরাধের কারণ মনোদৈহিক ব্যাধি। আবার ডা. হার্বার্ট বেনসনের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে এসব মনোদৈহিক রোগ সৃষ্ট হয় অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তার কারণে। আর যানজটের কারণে গন্তব্যে পৌঁছাতে অনিশ্চয়তা যে মানসিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে, তা তো বলাই বাহুল্য।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনজীবনে দুর্ভোগ কেবল নয়, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও যানজট আমাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ প্রভাবের প্রকৃত ব্যয় অর্থনৈতিকভাবে নিরূপণের জন্য আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। কেননা এ পরিমাণটি আমাদের বাধ্য করবে এ বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে এবং সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে। আর এর দায়িত্ব সরকার বা নাগরিক কারো পক্ষেই একক ভাবে নেয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজন যৌথ প্রয়াসের।

মি ল ন রা য়

বাঁধ ভেঙে দাও: ১৯৬০ সালে রচিত সম্প্রতি উদ্ধারকৃত উপন্যাস প্রসঙ্গে

বই	:	বাঁধ ভেঙে দাও [উপন্যাস]
লেখক	:	সুনীল বরণ দে
প্রকাশনী	:	মনন প্রকাশ
প্রকাশকাল	:	ফেব্রুয়ারি ২০১০
পৃষ্ঠা সংখ্যা	:	১৪৩

বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাসের যাত্রা শুরু ১৯৪৭ সালের ভারত-বিভক্তি বা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে। এই সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এ দেশের তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত ও প্রধান হিন্দু লেখকগণ পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। ফলে পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ভারত-বিভক্তি পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যাকাশে যে কয়েকজন প্রতিভাধর মুসলমান রচনাকারের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় দু'চারজন কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক ছাড়া অন্যান্য মুসলমান লেখক তাঁদের সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে পঠিত হতে পারেননি। আবার অবিভক্ত বাংলার অধিকাংশ বাঙালি হিন্দু ঔপন্যাসিক সাধারণ হিন্দুর জীবন-জিজ্ঞাসাকেই তাঁদের সাহিত্য-কর্মে চিত্রিত করেছেন। মুসলিম সমাজ সম্পর্কে থেকেছেন উদাসীন। তাই বোধ করি কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলেন : "আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের দুর্ভাগ্যের জের যে আমরা কতকাল টেনে চলব তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এইখানে যে হিন্দুর হিন্দুত্বের সংঘাতে তার প্রতিবেশী মুসলমানদের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে।"

(দ্রষ্টব্য: বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য-সমস্যা, শাশ্বত বঙ্গ)

ফলে ১৯৪৭-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে আমরা সেই একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। তাঁরাও এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনের সমস্যা-সংকট ও জীবন-জিজ্ঞাসার চিত্র অঙ্কনে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী থেকেছেন। আজো সাহিত্যে সেই ঔদাসীন্য বর্তমান। সে-অর্থে ১৯৬০ সালে রচিত কিন্তু সম্প্রতি উদ্ধারকৃত ও প্রকাশিত সুনীল বরণ দে-র "বাঁধ ভেঙে দাও (২০১০)" উপন্যাসটি বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাসের ধারায় এক অমূল্য সংযোজন। ড. সৌমিত্র শেখরের মতে, "১৯৬০ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে রচিত বাংলা উপন্যাসের একটি অসম্পূর্ণতাও এতে পূর্ণ হল। [...] ১৯৬০ সালের আগে রচিত এ অঞ্চলের উপন্যাসে হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের পরিপূর্ণ কোনো চিত্রই ছিল না। অথচ হিন্দু-মুসলিম মিলেই ছিল তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ। 'বাঁধ ভেঙে দাও' সে অভাব মোচন করল।"

সুনীল বরণ দে তৎকালীন হিন্দু-সমাজের বদ্ধতা, প্রথানুগত্য, বর্ণ প্রথার অমানবিকতার ছবি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। তাই এ উপন্যাসটি কেবল ইতিহাসের তালিকা তৈরি করার জন্য ব্যবহারযোগ্য তা নয়; প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস হিসেবে এটি প্রথম শ্রেণীর। বিশেষ করে পাকিস্তান কালপর্বে বাংলাদেশে প্রকাশিত উৎকৃষ্টমানের উপন্যাসের সংখ্যা এমনিতেই কম। তাঁদের মধ্যে সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) রচনায় হিন্দু-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিক-পারিবারিক-সামাজিক সমস্যার চিত্র খণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত হলেও আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭০), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৪-) প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে হিন্দু-সমাজ প্রায় উপেক্ষিতই বলা চলে। সেজন্যই হাসান আজিজুল হক 'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসের ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন : "বইটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করি তাই তো পাঁচের দশকের কোনো উপন্যাসেই তো এই চিত্র আসেনি! তবে কি মানুষের কথা বলতে গেলে সম্প্রদায়ের, ধর্মের প্রথার উপরে না উঠে উপায় নেই? সত্যি কথা বলতে কি সুনীল বরণ দে আমাদের দৃষ্টিটাকে সেখানেই পাঠিয়ে দেন। সম্প্রদায়ের কথা নিয়েই তিনি সম্প্রদায়হীন মহামানবিকতার ইশারাটি সকলের কাছে পৌঁছে দেন।" আমি মনে করি এ কারণেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে 'বাঁধ ভেঙে দাও'-এর আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসের আবিষ্কারের কাহিনীও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'চর্যাপদ' কিংবা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কারের কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অস্থিতিশীল জীবন-ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রতিক্রিয়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রিয় জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হতে হয় এদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অনেককেই। সুনীল বরণের খুড়ো (চাচা) অবনীকান্ত দে-ও তখন সুজলা-সুফলা

জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হন। ঠাঁই নেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরের রুক্ষমাটি প্রান্তরে। সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক টেনশন থেকে মুক্তি পেতে তৎকালীন গ্রাজুয়েট ও মননশীল লেখক সুনীল বরণও পিতার নির্দেশে আশ্রয় নেন খুড়ো অবনীকান্তের কাছে। সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর লেখালেখির সমস্ত পাণ্ডুলিপি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিদেশের অন্ন-জল-বায়ু তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি ফিরে আসেন স্বদেশের তপ্ত মাটিতে শান্তির খোঁজে। কিন্তু সেখানে থেকে যায় তাঁর সব পাণ্ডুলিপি। এরপর ষাটের দশকের মাঝামাঝি যে অসম্প্রীতিকর সমকাল তিনি নিজের চোখে দেখলেন–সে ক্ষোভেই বোধ করি লেখালেখি থেকে নির্বাসন নিলেন সুনীল বরণ দে। এবং ঢাকা শহর থেকে দু'শ কিলোমিটার উত্তরে শেরপুর জেলার সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমির প্রধান শিক্ষক হিসেবে দেশ গড়ার কারিগর তৈরিতে আত্মনিয়োগ করলেন। অপমৃত্যু ঘটল একজন তরুণ লেখকপ্রতিভার। হারিয়ে গেল তাঁর রচনাসম্ভারও। ১৯৯২ সালের ২৮ আগস্ট দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৪ বছর বয়সে মারা যান সুনীল বরণ দে। তাঁর মৃত্যুর সতের বছর পর বর্ধমানের অবনীকান্ত দে-র পুত্র তাঁদের পুরনো অব্যবহার্য জিনিসপত্রের মধ্যে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন 'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন সুনীল বরণ দে-র উত্তরাধিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের কাছে। উপন্যাসের যে 'প্রেস-কপি' পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায়, এটি লিখিত হয়েছিল বৈশাখ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে, লেখকের বাইশ বছর বয়সে। উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন, "পরমপূজ্যপাদ স্বর্গগত পিতামহের শ্রীচরণে।" গোষ্ঠীজীবনের বংশাভিমান সর্বস্বতা, দুটি দলের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরাগত বিরোধ ছবির মতো অবিস্মরণীয় ভাষায় অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। পূর্ববঙ্গের আর-দশটি সাধারণ গ্রামের মতোই হরিপুর গ্রাম। তার দক্ষিণ ধারে সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকের বাস। ধনে-মানে-কুলে যুগযুগান্তর থেকে অভিজাত তারা। এই কুলশ্রেষ্ঠদের গৌরব কামিনী ঘোষ। আভিজাত্যের অন্ধ মোহে বিভোর। নিরীহ প্রজারা তার অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি কোনোদিন। তারই রূপসী কন্যা রমা। কামিনী ঘোষ এখন মৃত। তার সহোদর সতীশ ঘোষ এখন পরিবারের কর্তা। আগের মতো প্রতাপ-প্রতিপত্তি তার নেই। কিন্তু কৌলিন্য-গর্ব ষোল আনাই বর্তমান। তাই অকুলীন শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে রমার বিয়ের প্রসঙ্গে তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উচ্চারণ: "সময়ের বিবর্তনে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তাই বলে নিজেদের আভিজাত্যকে নষ্ট করতে পারিনে বৌদি। সাধারণ একজন ভূমিজ বাড়ই-এর ছেলে, তার সাথে রমার বিয়ের ব্যাপারে কোনো সম্বন্ধই চলতে পারে না। হোক-না সে এম.এ. বা বিলেতফেরত– জগতের কাছে তবু তারা বংশপরম্পরায় উপেক্ষিত হয়েই থাকবে।" হরিপুর গ্রামের উত্তর ধারে গড়ে উঠেছে কুলীনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ও সর্বস্বান্ত নিম্নশ্রেণীর অকুলীনদের বসতি। এখানকার বাড়ইকুলের অখ্যাত নিত্যানন্দ ধর। এক-

কালে পানের ব্যবসা ছিল। জবরদস্তি করে কেড়ে নেয়া এদেরই বাস্তুভিটাতে তালুকদার কামিনী বাবুর দ্বিতল অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। নিত্যানন্দ বাবুর দ্বিতীয় ছেলে প্রবীর। তিনি বিশ্বাস করেন, "ঘোষ বংশের মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে ঘরে আনতে পারলে আপনাআপনি তাদের অহংকারের পতন ঘটবে। সামাজিক বৈষম্যও কমে যাবে এবং এমনিভাবেই এই দুনিয়াতে গড়ে উঠবে নতুন সমাজব্যবস্থা।" এই দুই চিরবৈরী পরিবেশে রোমিও-জুলিয়েটের মতো প্রবীর ও রমা– মানব-প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছে এবং কুলীন-অকুলীন দল দুটির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে। এক পর্যায়ে কৌলিন্যের হিংস্রতা প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সমাজশাসনের মূলকে শিথিল করতে সাহায্য করেছে। পরিশেষে অবস্থা বিপর্যয়ের নানা অদ্ভুত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেমিকযুগল পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসে প্রবীর ও রমার মনের স্বপ্নময় প্রণয়াবেশটি তুলির হালকা টানে, বর্ণবিন্যাসের সূক্ষ্ম কারুকাজে, একটি সুকুমার আত্মবিস্মৃত অনুভূতির রূপে শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। এই প্রেম চিত্রাঙ্কনে কোনো আতিশয্য, কোনো অপরিমিত ভাবোচ্ছ্বাস, কোনো সচেতন কাব্যস্পর্ধী প্রয়াস নেই– ধূলি-জঞ্জালস্তূপের মধ্যে হঠাৎ ফুটে-ওঠা ফুলের মতো এটি যেন অসুন্দরের অভ্যন্তরে সুন্দরের অলিখিত অভিযান। যে প্রাকৃতিক নিয়মে অসহ্য গুমোটের পর গ্রীষ্মের বিকালে মেঘের স্নিগ্ধ-শ্যামলতা সমস্ত দিনের তাপের উপশমরূপে আবির্ভূত হয়, তেমনি গোঁড়া সমাজবাদীদের জুগুপ্সিত সংসর্গের পর মনের নিদারুণ শূন্যতা ও অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রবীর ও রমার সুধাসঞ্চিত প্রেমরস একে অপরের প্রতি প্রসারিত হয়েছে। এই রোমান্স বাইরে থেকে আরোপিত নয়– এ উপন্যাসের অন্তরলোক থেকে উৎসারিত। রোমান্স এখানে অতিমুখর হয়ে ওঠেনি; এর সংযত সুষমা ও কুণ্ঠিত মাধুর্য মরুভূমির উপরে প্রসারিত স্বচ্ছনীল আকাশের মতো, উপন্যাসের উর্বর ভূমিসংস্থার সঙ্গে এক হয়ে অদ্ভুত ছন্দ-সংগতি রক্ষা করেছে।

'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসের কাহিনী রমা-প্রবীরের প্রেমকাহিনী শুধু নয়। এর মধ্যে লেখকের সমাজদৃষ্টি, সমকালীন মানবভাবনা, ঘৃণিত পণপ্রথা, সর্বোপরি কৌলিন্য-গর্বের অন্তঃসারশূন্যতা অসাধারণ শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত। বলা যায়, 'মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করে দেয় তার জন্মপরিচয়'– এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটনের সজ্ঞান প্রয়াসই এ উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। তাই তো উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে দেখতে পাই, কুলীন সতীশবাবু নিজের আভিজাত্য-গর্ব খর্ব করে অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেন, "আজ বুঝতে পেরেছি এ পৃথিবীতে মানুষই বড়ো সত্য, মনুষ্যত্বই সবচেয়ে বড়ো জিনিস-এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।" এ উপন্যাসের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হল, এর গার্হস্থ্য জীবনের পরিপূর্ণ ও সার্থক রসাস্বাদন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-প্রধান যুগে পরিবার তার স্বতন্ত্র ভাবসত্তা হারিয়ে কেবল একটি বৈষয়িক আশ্রয়ভূমির হীনতর পর্যায়ে

অবনমিত হয়েছে। আজকাল পারিবারিক জীবন শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই। শুধু বিচ্ছেদ আর মনোমালিন্যের উপলক্ষ ও কারণ। এটি আর শান্তির নীড় নয়– অশান্তির বিস্ফোরক শক্তির আধার। এদিক দিয়ে এটি অসাধারণ ব্যতিক্রমী উপন্যাস। কুলীন সতীশবাবু এবং অকুলীন নিত্যানন্দবাবুর কাছে তাদের সংসারটি একটি জীবন্ত সত্তা। এর আনন্দরস, এর পুরুষ পরম্পরা-সংক্রামিত সমৃদ্ধিসম্ভার, এর স্মৃতি ও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান, এর সুখ ও আনন্দের উষ্ণ স্পর্শ মাখানো আটপৌরে জীবন– এ সমস্তই মিলেমিশে পারিবারিক জীবনের একটি ভাবঘন, রসসমৃদ্ধ মহিমা রূপ পেয়েছে। পরিবার সম্পর্কে পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গির পুনরুদ্ধারের নিদর্শন হিসেবে এই উপন্যাসটি এক নতুন ভবিষ্যতের নির্দেশ বহন করে। 'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের অসীম আন্তরিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। এ আন্তরিকতা নিত্যানন্দ বাবুর কুলীন-অকুলীন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে এক বর্ণবৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন বর্ণনায় যেমন সহজ, তেমনি সতীশবাবুর আত্মম্ভরিতা ও মিথ্যা অহমিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও সাবলীল। প্রবীর-রমার কথোপকথনে, রমার মা ও মামার প্রগতিশীল চিন্তাভাবনায় উপন্যাসে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, জগদীশবাবু, যতীন বাবু, বীরেন বাবু, তাপসী প্রমুখ স্বল্পায়তন চরিত্র-চিত্রণেও তা অক্ষুণ্ন রয়েছে। মূলত সুনীল বরণ দে এ উপন্যাসে ব্যক্তির জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে জীবন-সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে সমাজবাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। লেখকের বক্তব্যেও এর সাক্ষ্য মেলে, "এ উপন্যাসে আমি সমাজজীবনের সঙ্কীর্ণতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ছাড়াও জঘন্য কতকগুলো সমস্যার চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি।" (দ্রষ্টব্য : আমার কথা, বাঁধ ভেঙে দাও) ফলে এ উপন্যাসে যে সমাজ-সত্যের সন্ধান আমরা লাভ করি– তা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি আজকের বাংলাদেশেও সেই প্রবহমানতা বর্তমান।

বিষয়ের প্রতি মনোযোগী ও জীবন-সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি একনিষ্ঠ থাকতে গিয়ে 'বাঁধ ভেঙে দাও'-এর আঙ্গিকের কুশল পরিচর্যা খুব বেশি সম্ভব হয়নি সুনীল বরণ দে-র পক্ষে। তবে বর্ণনাত্মক কাহিনী উপস্থাপনার সঙ্গে কথোপকথনের নাট্যরীতি উপন্যাসটিকে করে তুলেছে সুখপাঠ্য। অসাধারণ এর ভাষা। পাকিস্তান-পর্বে বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষিক উৎকর্ষে প্রথম শ্রেণীভুক্তির প্রশ্নে 'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসকে বাদ দেয়া মুশকিল। উপমা সাধারণত কাব্যে যুতসইরূপে প্রকাশিত হয় যতটা, গদ্যে ঠিক ততটা হয়ে ওঠে না। সেখানে 'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসের শুরুই হয়েছে একটি উপমা দিয়ে। এরপর প্রতি পরিচ্ছেদে তুলনা আর তুলনা। শুধু বস্তু নয়, অনুভবও তুলনায় আসে সুনীল বরণ দে-র উপন্যাসে। তিনি যখন লেখেন, "সবুজ দূর্বাঘাসে ভরা মাঠ, পাখির নীড়ের মতো ঘরবাড়ি।" (পরিচ্ছেদ-এক, পৃষ্ঠা-১৪); "স্মৃতিকথার মতো সুরেলা সুরে বাতাস বয়।" (পরিচ্ছেদ-দশ, পৃষ্ঠা ৮১); "মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো নেশায় ভরেছে মাটির মন।" (ঐ)– তখন মনে হয় একটি কবিমন জাগ্রত ছিল তাঁর। "রাতের অন্ধকার ক্রমেই বৃষ্টির মতো যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে নামছে

পৃথিবীতে। কালো পিঁপড়ের ঝাঁকের মতো অন্ধকার হয়ে উঠেছে মাটির বুক।" (পরিচ্ছেদ-নয়, পৃষ্ঠা-৭৯); "ফাগুনের আগুনঝরা রাত। কুমারী-তন্বীর নরম বুকের মতো কোমল মধুর আকাশ। কদম ফুলের মতো তারা ফুটেছে রাশি রাশি।" (পরিচ্ছেদ-দশ, পৃষ্ঠা-৮০)-এ জাতীয় চিত্রকল্পধর্মী উপমা-উৎপেক্ষায় একাকার এ উপন্যাস। উপন্যাসে এ উপাদানসমূহের আগমন প্রত্যাখ্যান করার মতো নয়, বরং বলা চলে এগুলোই এ উপন্যাসের সুষমাবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। তাই এসব উপমা, উৎপেক্ষা, চিত্রকল্প এ উপন্যাসের সম্পদ।

পরিশেষে, 'বাঁধ ভেঙে দাও' উপন্যাসটি এর রচনার পঞ্চাশ বছর পরে খুঁজে পাওয়া গেছে বলেই দীর্ঘদিন বাংলাদেশের উপন্যাসে যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা কিছুটা হলেও পূরণ হবে। ১৯৪৭ সালের পাক-ভারত বিভক্তিপর্বে আরো অনেক নবীন-প্রবীণ লেখকের সমৃদ্ধ লেখা হয়তো বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছে এবং কালের ধুলোয় সেগুলো হয়তো কোথাও পড়ে আছে। আমাদের গবেষকদের উচিত হবে সেগুলোকে খুঁজে বের করা। কে বলতে পারে, তার কোনোটিতে কোনোটিতে হয়তো লুকানো আছে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের সোনালি সম্পদ!

ধর্ম/প্রবন্ধ

অন্নপূর্ণা বিশ্বাস

.....

অক্ষয়কুমার দত্ত: ধর্মচিন্তা

বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধিকার করে আছে। জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সারা শতাব্দী ধরে চলেছিল ভাঙাগড়ার এক অভিনব সংঘাত। সাল তারিখ হিসেবে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলেও বলা যেতে পারে যে পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পর থেকে পাশ্চাত্য শাসন ও সভ্যতার সংস্পর্শ থেকেই এর সূচনা– "The assumption of the Government by

the British, reliance on English ideas and methods, necessarily introduced great changes in India. Economic measures of the new Government and new economic forces brought about a very rapid economic transformation. The old order was changing throughout the second half of eighteenth century."[১]

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন শোষণ, দেশীয় শিল্প, বাণিজ্যের বিলুপ্তি, কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) এ-দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল। "কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাঙালির ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের অবনতি দ্রুততর হইল। ব্যবসার প্রাণকেন্দ্রে বিদেশী বণিক হস্তক্ষেপ করিল, ইংলন্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বাঙালি তথা ভারতের শিল্পপ্রাধান্য হ্রাস করিবার জন্য পার্লামেন্ট হইতে আইন পাশ করাইয়া দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের শ্বাসরোধ করা হইল।[২]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের ব্যবসাবাণিজ্যের ভিত সুদৃঢ় করার জন্য পার্লামেন্ট থেকে এই আইন পাশ করানোর ফলে যে সব বাঙালি শিল্প-বাণিজ্যকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারা বৃত্তি হারিয়ে নিরবলম্ব হল বা কৃষিকাজ অবলম্বন করল। কিন্তু কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানা-স্বত্ব রায়তদের অধিকারে এল না। এতে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই এদেশে এক ভূমিহীন কৃষক ও বৃত্তিহীন শিল্পী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই চরম দুর্দশা এদেশে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতিতে শোচনীয় সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ব্রাহ্মণ আধিপত্যপুষ্ট হিন্দুধর্ম এ সময় কুসংস্কার ও প্রথাবদ্ধ আচার-বিচার সর্বস্ব হয়ে উঠল। প্রাচীন হিন্দুধর্মের চিন্তাসম্পদ ও ধ্যান-ধারণা বিস্মৃত হয়ে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রথাবদ্ধ রীতিসর্বস্ব পৌত্তলিকতার উপাসক হয়ে উঠল। ধর্মবিশ্বাসে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার সমাজজীবনকেও প্রভাবিত করছিল। কৌলীন্য, জাতিভেদ, সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথা স্বদেশ ও সমাজে শোচনীয় দুরবস্থা, অনাচার, অত্যাচারের সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন রায় যখন কলকাতায় এলেন দেশের অবস্থা এই রকম শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। "রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল।"[৩]

দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা যখন এই রকম শোচনীয় সেই সময় শ্রীরামপুর মিশনের খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে আসেন।

এ দেশের ধর্ম ও সমাজ-জীবনের এই রকম অবস্থায় খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায় দেশবাসীদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। নিজধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য এঁরা হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও প্রচলিত আচারনীতিকে আক্রমণ করে বিষোদগার শুরু করেন। এর ফলে রক্ষণশীল এবং উদারভাবাপন্ন উভয় শ্রেণীর

হিন্দুরা এর প্রতিবাদে অগ্রসর হন। রক্ষণশীল হিন্দুগণ–ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দুদের নেতৃত্বে খ্রিস্টান মিশনারিদের এই নিন্দাবাদ ও কটূক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও এর আচারঅনুষ্ঠান রক্ষা করাই এদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল; কিন্তু উদারভাবাপন্ন হিন্দুরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক নব্যচিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই আধুনিক চিন্তা তাঁদের মনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন চেতনা ও বিচারবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে এদেশে বড় বড় সামাজিক ও ধর্মান্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এই ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) ও ব্রাহ্মধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদের চিন্তাসম্পদে এই আন্দোলন পরিপুষ্ট হয়েছে তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচেন্দ্র সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ নির্ণয় ও নবরূপায়ণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্তের দানের গুরুত্বও অপরিসীম।

যে ধর্মীয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের সময়ে রামমোহন রায় আধুনিক চিন্তা ও যুক্তিবাদ অবলম্বন করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লেখক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই যুগের চিত্র তাঁর বর্ণনায় স্পষ্ট করে তুলেছেন।

"এক শতাব্দী পূর্বে যখন পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিমলরশ্মি অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে নাই, যখন এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত ভারতভূমির সর্বত্র অনিষ্টকর কুসংস্কার নিচয়ের একাধিপত্য লেশমাত্র বিচলিত হয় নাই, যখন ধর্মের সিংহাসনের আমোদ ও আড়ম্বপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠানের পরাক্রম প্রতিহত হয় নাই, যখন দরিদ্র ধনীর অত্যাচার এবং স্ত্রীলোক পুরুষের অত্যাচার বহুদিন হইতে সহ্য করিয়া আসিতেছিল, যখন ভাগিরথীর উভয় তীর আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত চিতানল অনাথা বিধবা নারীর জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ করিত সে সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় তিমিরাচ্ছন্ন প্রান্তর মধ্যবর্তী অনলরাশির ন্যায় আবির্ভূত হইলেন।"[৪]

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে দেশ ও সমাজের এই চরম অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের সময় জাতীয় জীবনের চরম ধর্মসংকটের মুহূর্তে এদেশের চিন্তাক্ষেত্রে নতুন যুগের দীপবর্তিকা নিয়ে রামমোহন রায় আবির্ভূত হয়েছিলেন–

"যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল সেই দুর্গতির দিনে রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব।"[৫] দেশ ও সমাজের এই দুর্গতির দিনে নতুন যুগের জীবনাদর্শ ও নবজীবনের বাণী নিয়ে তিনি আমাদের সম্মুখে দাঁড়ালেন। এদেশে নব্যচিন্তার এই অন্যতম উদ্‌গাতা রামমোহন রায় তাঁর অসাধারণ মনীষা-বলে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তাধরা ও জ্ঞান-প্রকর্মের মূল রহস্য অনুধাবন করেছিলেন। ভারতের চিরন্তন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতীয় জীবনাদর্শের পুনর্মূল্যায়ন

প্রয়োজন হয়েছিল। এজন্য রামমোহন রায় ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর পাশ্চাত্যের মানবমুখীন জীবনবোধের সমন্বয়সাধন করে এ দেশে নতুন প্রগতিশীল জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্যাকে তিনি ধর্মতত্ত্বমূলক সমালোচনার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। ধর্মবিষয়ে এই স্বাধীন আলোচনা থেকে এদেশে যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হয়েছিল ও প্রাচীন যুগের সংস্কৃতিসম্পদ থেকে আধুনিক জীবনাদর্শের পরিপোষক চিন্তাসম্পদের পুনরুদ্ধার করে তিনি জাতীয়জীবনে মানবমুখীন জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হয়েছিলেন। তার ফলে নব্যচিন্তার অগ্রদূতরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮২৮) ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়ের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে ধর্মবিষয়ে তাঁর আলোচনার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতাংশ–

"আমার সমস্ত তর্কবিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম এক্ষণে প্রচলিত তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহার শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার করেন তাহার মত বিরুদ্ধে।"[৫ক]

ঊনবিংশ শতকে খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে এদেশীয় হিন্দুধর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ প্রধানত খ্রিস্টধর্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মের মূর্তিপূজা ও আচার-সর্বস্বতার সংঘর্ষ। এই ধর্মসংঘাতের ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যে সংস্কার প্রয়োজন হয় তাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন রামমোহন রায়। রামমোহন হিন্দুধর্মকে পৌরাণিক ধর্মের পৌত্তলিকতা, জটিল শাস্ত্রাচার ও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে যুগোপযোগী আধুনিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠাকে তিনি ধর্মসংস্কারের মূল উপায়স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। "His thorough schooling in the higher philosophy of Hinduism particularly in the Vedanta had revealed to him the great depth and subtlety of the spiritual doctrines of the Hindus and had convinced him the unity of God-head was one of the basic concepts of the Hindu religion."[৬]

এই একেশ্বরবাদের ভিত্তির ওপর বিশ্বজনীন ধর্মের (ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন) প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদান্তে এক ব্রহ্মের উপাসনার সন্ধান পেয়েছিলেন। বেদান্তের মতে গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনা অসম্ভব। রামমোহন এই মতবাদ সংশোধিত করে সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক ব্রহ্মের উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলন করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মের উপাসনার জন্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। এই সমাজের ট্রাস্টডিডে সম্প্রদায় নির্বিশেষে উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হয়। "The great commencement took place on Wednesday, the 20th of August 1828. Then the native theistic church of modern India was born. It was at first

called simply Brahma Sabha, the society of God. The inaugural preacher was Ram Chandra Sarma. His discource was upon the spiritual worship of God. His text which was taken from various parts of the Hindus scriptures read "God is one only without an equal in whom abide all words and their habitants."[৭]

এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ এ দেশের ধর্মোপাসনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আধুনিক ও সর্বজনীন আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হয়। এইভাবে রামমোহন রায় যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই ভাবাদর্শ তিনি পেয়েছিলেন একদিকে আচার্য শঙ্করের বেদান্ত ব্যাখ্যান থেকে, অপরদিকে মোতাজেলা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা, মুওয়াহিদ্দিন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদ ও পাশ্চাত্যদার্শনিক বেকন, লক ও হিউমের চিন্তাপ্রণালী থেকে। ধর্মচিন্তার সঙ্গে যুক্তির সাযুজ্য স্থাপনের এই প্রয়াস থেকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব। যুক্তিজ্ঞানের বিরোধী কোনও অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস তাঁর ছিল না। প্রীতি ও দয়া (Love and benevolence) ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মূল কথা। লোকহিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। ভারতীয় সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যে তিনি আস্থাশীল ছিলেন, এ জন্য দেশের প্রাচীন বেদ-উপনিষদ থেকেই আধুনিক চিন্তার পরিপোষক চিন্তা গ্রহণ করে এবং আধুনিক যুগোপযোগী করে, তার ওপর ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই ধর্মোপাসনা 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' নামে পরিচিত ছিল। রামমোহন রায়ের এই ব্রাহ্মসমাজ ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মিলনস্থল; কাজেই দেখা যায় যে রামমোহন রায়ের এই মানবকেন্দ্রিক ধর্মে কেবলমাত্র ভজন, আরাধনা উদ্দেশ্য ছিল না, মানবকল্যাণ কর্মও এই ধর্ম সাধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবমনে এর প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু সর্বপ্রকার প্রতীকোপাসনা ও চিরাচরিত আচার-আচরণ বর্জন করার জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও তাদের সংস্থা ধর্মসভা (১৮৩০) এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করত। তিনি স্বীয় বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রতিপত্তির দ্বারা সকল সংঘাত ও প্রতিঘাত প্রতিহত করে ব্রাহ্মসমাজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ নব্যশিক্ষিত যুবকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও তার মাধ্যমে যে নব্য ধর্ম-চেতনার উদ্বোধন করেন তার অগ্রগামিতার ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহযোগীদের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়, যদিও রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের এই ধর্মচিন্তার উৎস ছিল ভিন্নমুখী। বুদ্ধি ও যুক্তিবাদী রামমোহন রায়ের নব্য ধর্মচিন্তার প্রেরণা ছিল জাতীয় ও সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন, যদিও বিশ্বানুভূতি ছিল তাঁর ধর্মচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য আর দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার উৎস ছিল স্বভাবজ অধ্যাত্ম-তৃষ্ণা। এই বৈশিষ্ট্য মনে রেখে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য রামমোহনের সংস্পর্শে এসে কিশোর বয়স থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হলেও মহাসমারোহে পূজা, অর্চনা ইত্যাদি পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করতেন। এতে দেবেন্দ্রনাথের অন্তর সায় দিত না। "যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা থাকিত না।"[৮]

কিন্তু তিনি প্রধানত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এজন্য শূন্যতাবাচক নেতিবাদী চিন্তাও তাঁকে অশান্ত করেছে। আত্মজীবনী পাঠে জানা যায় শেষ পর্যন্ত ঈশোপনিষদের ব্রহ্মোপাসনার বাণী "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্।"[৯] তাঁর অধ্যাত্মপিপাসু অন্তরে শান্তিবাণী নিষেক করেছিল এবং তৎকালের সামাজিক পরিবেশে এই ব্রহ্মবাদ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্ধু সহযোগীদের নিয়ে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩৯)। এই সভার পরে তত্ত্ববোধিনী নাম হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা সেকালে নব্যধর্মচিন্তা ও প্রগতিশীল চিন্তা প্রচার ও প্রসারের অগ্রদূত হয়ে ওঠে এবং স্বভাবতই আধুনিক যুক্তিনিষ্ঠ যুবকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তৎকালের মনীষীদের মধ্যে অনেকেই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মতাদর্শের জন্য এই সভায় যোগদান করেন। অক্ষয়কুমারও ঈশ্বর গুপ্তের সহায়তায় প্রথমদিকেই এই সভার সদস্য হন (১৮৩৯)। আদর্শগত মিল থাকায় স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তত্ত্ববোধিনী সভার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এর ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে (১৮৪২)। রামমোহন রায়ের অবর্তমানে উপযুক্ত নেতৃত্ব ও পরিচালনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদের আচার, আচরণে যে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবিরোধী পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা দূর করার জন্য ধর্মের আদর্শের সঙ্গে ধর্মাবলম্বীর আচার-আচরণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পৌত্তলিকতা-বিরোধী রীতি পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হল (১৮৪৩)। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের রূপান্তর সাধিত হল এবং ব্রাহ্মসমাজ দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যপদের দোলাচলবৃত্তির অবসান ঘটে– যাঁরা সমাজে যোগ দেন, তাঁরা দীক্ষাগ্রহণ ও বিধিপালনের মধ্য দিয়ে অনন্যমনা প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা বাহুল্য যে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার ছিলেন বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন নিস্পৃহ দার্শনিক। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মে বিধি পালনের জন্য তিনি দীক্ষা গ্রহণে অংশগ্রহণ করেন কারণ দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্তিত এই বিধি যুক্তি ও নিয়মানুসারী। ব্রাহ্মদের আদর্শবিরোধী পৌত্তলিক আচরণের প্রতিবন্ধক হিসেবে এই বিধি নিয়মপালন প্রয়োজন ছিল। পাঠ্যাবস্থায় 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে' শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার ফলে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার প্রতি অক্ষয়কুমারের মনে বিরূপতা সঞ্চিত ছিল। ব্রাহ্মধর্মে পৌত্তলিকতা-বিরোধী নিয়মপালনের বিধি প্রবর্তিত হওয়ায় অক্ষয়কুমারের নিকট এই ধর্মমত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের

জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা দুইটি উপায় অবলম্বন করেন: 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ (১৮৪৩)।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠার পর (১৮৩৯) ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য অন্যতম কাজ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন। এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের (১৮৪০) অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ধর্মাশ্রিত আধুনিক শিক্ষাদান, উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা ও ভূগোল, বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ সাধন। দেবেন্দ্রনাথ পাঠশালার উপনিষদ পড়ানোর ভার গ্রহণ করেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানে ব্রতী হন।

শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে মাধ্যম করাও জাতীয় চিন্তা-বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাঠশালার পাঠ্যসূচি অনুধাবন করে দেখলে বোঝা যায় বিষয় নির্বাচনেও অক্ষয়কুমারের বিশেষ ভূমিকা ছিল– উপনিষদের, ব্রহ্মবাদের যা যুক্তিপূর্ণ তা গ্রহণ করা হয়েছিল। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের স্থাপনের প্রয়োজনে ভূগোল, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ভৌগোলিক জ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিদ্যা জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করে ও প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ সাধনের সহায়ক হয়। এজন্য পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় তিনি বাংলা ভাষায় ভূগোল ও প্রকৃতিবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন। যাতে স্বধর্মে থেকে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় আবার দেশীয় শাস্ত্র সম্বন্ধে অন্ধশ্রদ্ধাবশত ভ্রান্তি না আসে এ জন্য বৈজ্ঞানিক চেতনার সমন্বয় প্রয়োজন, এ কথা মনে রেখে অক্ষয়কুমার ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারে দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী হয়েছিলেন। পাঠশালা স্থাপনের পর ১৮৪০ থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারকে পাঠশালার কাজ নিয়ে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। একদিকে খ্রিস্টীয় ধর্মকে প্রতিহত করে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত করা– এই উপাসনা আবার যাতে সঙ্কীর্ণ বেদান্তের ধর্মে পরিণত না হয় তার জন্য বিজ্ঞান-চর্চার পথ উন্মুক্ত রাখা– এ সম্বন্ধে সচেতনভাবে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কাজ পরিচালিত হয়েছে। বাঁশবেড়েতে পাঠশালা স্থানান্তরিত করার সময় (১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের প্রদত্ত বক্তৃতায় এই উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাও হয়েছে।

"স্বধর্ম থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তই এই পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, পারমার্থ ও উভয় বিদ্যারই উপদেশপ্রদান করা যাইবে।"[১০]

এইভাবে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ছাত্রদের পারমার্থ ও বৈষয়িক উভয়প্রকার শিক্ষাপ্রদান করা হত। এই পাঠশালা কাজ ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল।

অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সহসম্পাদক ছিলেন কাজেই ধর্মব্যাখ্যান ও প্রচারের অন্যতম ভূমিকা তাঁর ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। "তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূরস্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে অনুশীলন ও উন্নতি কি প্রকারে হইবেক"[১১]

"অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতাহেতু বা কোন কার্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈববিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাহারদিগের নিমিত্ত উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে প্রকটিত হইবেক ।"[১২]

"মহাত্মা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এই ক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম জানিতে বা স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমাদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক ।"[১৩]

পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধেই অক্ষয়কুমারের ধর্মচিন্তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নয়, বিচিত্র শক্তিমান আর সেই বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর রচনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশলের ব্যাখ্যা– তাঁর ধর্মীয় চিন্তা যে কীভাবে বৈজ্ঞানিক চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম প্রচার ব্যাপারে ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয়ের সন্নিবেশ ও আলোচনার তাৎপর্য বোঝা যায়। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু ও তার সৃষ্টিকৌশল বর্ণনা তাঁর ধর্মচিন্তার একটি বিশেষ দিক। "মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ বিচার' ও 'ধর্মনীতি' অক্ষয়কুমারের ধর্মচিন্তার একটি বিশেষ প্রকাশ মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রহ্মোপাসক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের ধর্মীয় চিন্তার পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মচিন্তায় Mystic ভাবাপন্ন ছিলেন; কিন্তু অক্ষয়কুমারের ধর্মচিন্তা বিশুদ্ধ যুক্তি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্যদের তাঁর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্নিহিত ত্রুটি দূর করে নবরূপায়ণে সাহায্য করেছিলেন। "কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব যাহাতে লোকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন বিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক ।"[১৪] ধর্ম কেবলমাত্র অধ্যাত্ম জীবনের ব্যাপারে নয়, ব্যবহারিক জীবনের কুকর্ম থেকে নিবৃত্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্যতম প্রস্তুতি স্বরূপ। এজন্য সমাজজীবন যাতে কুকর্ম ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকে এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার নানা রচনার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাছাড়া বৈষয়িক সংবাদপত্রে পরমার্থ বিষয়ক রচনা না থাকায় সর্বসাধারণের মনোগত জ্ঞান ও আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় স্বরূপ এই পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজন ঘোষণা করা হয়েছে।

সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ। অক্ষয়কুমার একাধারে এই পত্রিকার সম্পাদক ও তত্ত্ববোধিনী সভার সহসম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ও ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রবর্তনের ফলে ব্রাহ্মসমাজ যেন এক নবজীবন লাভ করে। এর থেকে ঝিমিয়ে পড়া ব্রাহ্মসমাজের

জীবনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বাংলা দেশে বহুস্থানে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। ধর্মের আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা করে এই প্রসার সম্ভবপর হয়েছিল। এই প্রচারের ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা ছিল পত্রিকার, পত্রিকার দ্রুত প্রচার না হলে শুধু ধর্মপ্রচারকের দ্বারা এ কাজ কতখানি সম্ভব হত বলা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন।"[১৫] এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যে ৭০০ হয়েছিল। এর থেকেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারীদের ধর্মের প্রতি আদর্শনিষ্ঠা ও অনুপ্রেরণা বোঝা যায়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্মদের এই আদর্শ-নিষ্ঠা ও অনুপ্রেরণার বাহক। এই পত্রিকায় নানাভাবে ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। রামমোহন রায়ের উপনিষদের ব্যাখ্যান ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ধর্মবিষয়ে রচনাই প্রকাশিত হত বেশি। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে উপনিষদের বাণী ও ব্যাখ্যান প্রচার করতেন। ১৭৬৯ শকের বৈশাখ সংখ্যার শিরোদেশে উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছিল। "অপরাঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরময়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"[১৬] রামমোহন রায় বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যায় বলেছেন "পরমেশ্বর সৃষ্ট মানবের প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন"– দুই-ই হল মুখ্য উপাসনা। ১৭৭৬ শকের অগ্রহায়ণ থেকে 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধঞ্চ তদুপাসনেব"[১৭] এই কথা কয়টি মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। এইটি ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে আহরণ করে আরও তিনটি বীজমন্ত্র তৈরি করেন এবং এগুলো পরপর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে উদ্ধৃত হতে থাকে।

এইভাবে ধর্মান্দোলনের ধারাটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে উদ্ধৃত বিভিন্ন বাণীর মধ্যে বিধৃত রয়েছে। "পরধর্ম প্রকটন অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রকটন করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই ধর্মপ্রচারকাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়েছে। বস্তুত তৎকালীন ধর্মসংকটের মুখে নানাদিকে লক্ষ রেখে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে পত্রিকার প্রচারকার্য চালাতে হয়েছে। বাঙালি তরুণদের স্বধর্মবিদ্বেষ দূর করার জন্য ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যকে বড় করে ঘোষণা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল ধর্মতত্ত্ব নয়, খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারের প্রতিবন্ধক রূপে একেশ্বরবাদের সমর্থক ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ও স্বদেশের বিভ্রান্তচিত্ত তরুণদের সামনে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য উদ্‌ঘাটিত করে স্বধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতি, পুরাবৃত্ত, দর্শন, সাহিত্যের বিচিত্র তথ্যাদি প্রকাশ করে পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল এবং একথা সত্য যে দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকা প্রকাশিত হত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বেতনভুক্ত সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত; কিন্তু তাঁর নিজস্ব চিন্তার সঙ্গে যে চিন্তার

মিল হত না তা নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার মতো মনের গঠন তাঁর ছিল না। কাজেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পরধর্ম প্রকটন করার সঙ্গে তাঁর আত্মিক ধর্মচিন্তার যোগ অবিচ্ছেদ্য ছিল বলে তিনি এই কাজে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি যে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় বিষয় সন্নিবেশ করতেন, কারণ ওই বিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্যাদি তাঁর কাছে পরমেশ্বরের মহিমাজ্ঞাপক ও ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যাখ্যা তাঁর কাছে সৃষ্টিকৌশল ব্যাখ্যা এবং এই "প্রাকৃতিক নিয়ম পালনই ধর্ম, না পালন করাই অধর্ম"। তাঁর ধর্ম বৈজ্ঞানিক চেতনাযুক্ত মানবকেন্দ্রিক ধর্ম; তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞানতত্ত্বও তাঁর ধর্মচিন্তারই বিশেষ অঙ্গমাত্র। "যে রীতি বর্ত্ত পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী তাহাই যথার্থ বিহিত। বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বরাজ্য পালনার্থে নানা প্রকার শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তন্নিরূপণার্থে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।"[১৮] এজন্য মানুষের সৃষ্ট সামাজিক দেশাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য "পরম্পরাগত দোষাকর দেশাচারের অনুরোধে পরমেশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা ও তৎপ্রতিপন্ন তত্ত্ব সমুদায়ের অনুষ্ঠানে অবহেলা করিলে অপরাধী হইতে হয়।"[১৯] যেমন সামাজিক নিয়মকানুন তেমনই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়মগুলো যে পরমেশ্বরের সৃষ্ট তা মানুষের ধর্মীয় নিয়ম পালনেরই অঙ্গ। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি ও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' তিনি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন– "বস্তুত বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ হইতেছে যে এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমাদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্মের উন্নতি, বীর্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার বলিতে কি সম্যকরূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবার উপায়ন্তর নাই। জগদীশ্বর বিশ্ব রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত সুচারু নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহার লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়।"[২০]

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তের লেখায় তাঁর মত-বিরুদ্ধ কথা থাকলে কেটে দিতেন এবং তাঁকে স্বমতে আনতে চেষ্টা করতেন কিন্তু তা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ ধর্মের ধারণা বিষয়ে মতে পার্থক্য ছিল। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ ছিল বিস্তর। দেবেন্দ্রনাথ অন্তরের গভীর অনুভূতির মধ্যে পরমেশ্বরের ধ্যান ও ধারণা করতেন। জাগতিক সৎকর্ম ও বিষয়সমূহ ঈশ্বরচিন্তার আনুষঙ্গিক সহায়ক কর্মমাত্র, যেখানে অক্ষয়কুমারের ঈশ্বরচিন্তা জগদীশ্বর-সৃষ্ট প্রাকৃতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ও প্রাকৃতিক নিয়ম পালন মানুষের অবশ্য আচরণীয় ধর্ম, তা না পালনই অধর্ম। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সন্নিবেশিত সমাজ বিষয়ক, বিজ্ঞান বিষয়ক, শিক্ষা, দর্শন, পুরাতত্ত্ববিষয়ক তত্ত্বাদি ধর্মীয় ব্যাপারের অঙ্গ হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিচিত্র বিষয়বস্তু রামমোহনের উপনিষদ ব্যাখ্যান বা দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ ব্রাহ্মদের ধর্মব্যাখ্যানের মতোই সমমর্যাদার সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারে আত্মচিন্তা প্রকাশের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মধর্মকে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মসাধনের অন্যতম পন্থা বলে গ্রহণ করছিলেন। ধর্ম তাঁর কাছে

নীতিপালন। তাতেই চিত্ত সুখজাত হওয়ার সম্ভাবনা তিনি বুঝেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের বক্তৃতায় তিনি বলেছেন "অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র।"[২১]

অক্ষয়কুমারের এই বিজ্ঞান ও মানবতাভিত্তিক ধর্মচিন্তা নব্যশিক্ষিত তরুণদের ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট করছিল এবং কলকাতার বাইরেও ব্রাহ্মসমাজের দ্রুত প্রসার হয়।

"In this act of propagation the Tattabodhini patrika rendered great help. There having no regularly appointed missionaries of the Samaj of that, the partrika fullfilled the want. In the course of a few years Samaj sprang up in many stations outside Calcutta through the influence of that patrika."[২২]

দেখা যাচ্ছে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এই পত্রিকা সে যুগে এই দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্তিসম্মত ধর্মমত প্রচারে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল।

"Young Akshoy Kumar, then only a youth of 23, became the editor of the paper which soon became a power in the land. It is scarcely possible in the present day when journals have multiplied all over the country to adequetely describe how eagerly the moral instructions and learned teachings of Akshoy Kumar, conveyed in that famous paper were persued by a large circle of thinking and enlightened readers, people all over Bengal, awaited every issue of that paper with eagerness, and that silent and sickly but infatigable worker at his desk swayed for a number of years the thoughts and opinions of the thinking portion of the people of Bengal."[২৩]

ধর্মান্তর প্রতিরোধ করাও তত্ত্ববোধিনীর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এই দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ১৮৪৩ সালে মধুসূদন দত্তের মতো প্রতিভাধর তরুণের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আগস্ট মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এরপর যখন উমেশচন্দ্র সরকার ও তার নাবালিকা পত্নীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করেন (১৮৪৫)। এই আন্দোলনে অক্ষয়কুমার বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার তেজস্বী লেখনীর সাহায্যে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপিত করেন, তিনি এদেশীয়দের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে স্বদেশবাসীকে সচেতন করে দেন। অক্ষয়কুমার লেখেন– 'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল এদেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের মতো লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল![২৪] এই ভাবে

তিনি যেমন ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন, তেমনই পরধর্ম গ্রহণের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে স্বদেশবাসীকে সচেতন করে দেন। অক্ষয়কুমারের মতে পরিবেশের চাপে পড়ে হিন্দুরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে প্রলোভিত হয়। এছাড়া আমাদের সমাজের দেশাচার, গোঁড়ামিও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের খ্রিস্টধর্মের দিকে ঠেলে দেয়। খ্রিস্টানদের দরিদ্র দেশবাসীর জন্য বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অন্যতম মাধ্যম সেকথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং একতাবদ্ধ হয়ে এই বিজাতীয় ধর্ম প্রতিরোধ করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। "অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পবিারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর তবে মিশনারীদের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও।"[২৫] ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ থেকেও প্যামফ্লেটের আকারে এই ধরনের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। এই ভাবে আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করতে থাকে এবং আন্দোলনের ফলে খ্রিস্টানদের এই ধর্মান্তরিতকরণের বিরুদ্ধে গোষ্ঠী নির্বিশেষে ধর্মসভা, ব্রাহ্মসমাজ ও ডিরোজিয়ান গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হন। ১৮৪৫-এ এক বৃহতী জনসভায় হিন্দু বালকদের খ্রিস্টান স্কুলে যাওয়া বন্ধ করার জন্য 'হিন্দু-হিতৈষী বিদ্যালয়' স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিদ্যালয়ের জন্য এককালীন ৩২,০০০ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়। এভাবে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হন।

অক্ষয়কুমার এই সকল সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন। "পত্রিকায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের বিবরণ, সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ প্রভৃতির বিস্তারিত সংবাদ উল্লেখিত হইল। এই সভাতে নিশ্চিত হইল যে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক।"[২৬] এছাড়া অক্ষয়কুমার শীলবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয়, অপূর্ব-পুরের অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও বিশদ বিবরণ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রচার করতে থাকেন। এইভাবে দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণা ও অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় খ্রিস্টধর্ম প্রতিরোধকল্পে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। ব্রাহ্মধর্মের নবরূপায়ণের পর এই ধর্মের মূলনীতি সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যা ও সঙ্কট উপস্থিত হয়। এই সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধানের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনে অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষ সাহায্য করেন। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও ব্রাহ্মধর্মের রূপায়ণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

রামমোহন রায়ের বিলাতগমনে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে ব্রাহ্মসমাজে অবনতি শুরু হয়। "রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রচণ্ড বিরোধিতা ও কঠোর সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের আক্রমণের কাছে ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁরা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ বিরোধী হিন্দু সমাজের আচরণীয় ক্রিয়াকলাপ পালন করতে

আরম্ভ করেন।"[২৭] সে সময় অনেকেই রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম ও ব্রহ্মে বিশ্বাস রাখলেও লোকাচার পালন করতেন। "রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস রাখলেও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সত্যিই বিমুখ ছিলেন।"[২৮] এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতেও লিখে গেছেন "পিতাঠাকুর বেদান্ত প্রতিপাদ্য নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে, ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন তথাপি লৌকিকচারং মনসাপিনলংঘয়েৎ মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না।"[২৯] এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে নীতিবিরুদ্ধ অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া আরম্ভ হয়। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিবাদে এই প্রথা রহিত হয়েছিল এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ ও নিয়মবিধি পালনের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করলেও কতগুলো অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এই ধর্মের মূলনীতির মধ্যেই থেকে গেল। "যে একান্ত অদ্বৈতবাদে উপাসনা অসম্ভব হয়, যে মায়াবাদে জগৎকে মিথ্যা ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে রামমোহন কখনও কুণ্ঠিত হন নাই।" রামমোহনের অবর্তমানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় এই অদ্বৈতবাদের মত প্রচার করতে থাকেন এবং বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক উক্তিসমূহের প্রতিবাদ করায় তা রহিত হয়। এই প্রতিবাদের পিছনে অক্ষয়কুমারের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। "অক্ষয়কুমার মনে করিতেন একালে এরূপ অলীক মত অবলম্বন ও প্রচার করা অতীব লজ্জার বিষয়, ন্যূনধিক একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে তিনি এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কারমূলক মতের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বারংবার বিচার করেন"[৩০] তাতে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করায় দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়বাবুর মত অবলম্বন করেন। এইভাবে অদ্বৈতবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও ব্রাহ্মসমাজে বেদের অভ্রান্ততার মত চলতে থাকে। এর ফলে ব্রাহ্মধর্ম আবার গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ 'ইন্ডিয়া এ্যান্ড ইন্ডিয়ানস মিশন' গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মকে নিতান্ত অর্থহীন, নীতিহীন ধর্ম বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। 'ব্রাহ্ম ধর্মের' ত্রুটি হিসেবে তিনি এই সমালোচনা করেন।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষরূপে ব্রাহ্মধর্মের রীতিনীতিকে আক্রমণ করেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি দেবেন্দ্রনাথের বৈদিক মতে পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে পৌত্তলিক আচরণ বলে ইংলিশম্যান পত্রিকায় নিন্দাবাদ করেন। "Englishman-এর সম্পাদকের (অক্টোবর ১৮৪৬) মতে শ্রাদ্ধ একটি বৈদিক অনুষ্ঠান তাহার সহিত পৌত্তলিকতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যুক্তিবাদী ধর্মে শ্রাদ্ধ বলিয়া একটি অনুষ্ঠানের স্থান থাকিতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দিয়া কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়াছেন।"[৩১] ২৮ অক্টোবর ইংলিশম্যান পত্রিকায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বী সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। "Our former correspondent considers,

the Shradhas as one of those observances which can not by any purification be disconnected from idolatrous rites and degrading notions of the Divine Being."[৯২]

ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় প্রতিপক্ষ জগবন্ধু পত্রিকা ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে বেদের অভ্রান্ততার নীতিকে আক্রমণ করে সমালোচনা করে। জগবন্ধু পত্রিকার মতে বেদ অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্র হতে পারে না। সীতানাথ ঘোষ ছিলেন জগবন্ধু'র সম্পাদক।

এইভাবে আক্রান্ত হওয়াতে ব্রাহ্মধর্মের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকটিত হয়ে পড়ে। এদিকে উপনিষদের অসমগ্র অধ্যয়নের ফলে দেবেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল উপনিষদ আদ্যন্ত এক ভাবাপন্ন ও সুসংবদ্ধ রচনা এবং উপনিষদ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেয়। এজন্য তিনি বেদান্তের অভ্রান্ততার নীতিকে মেনে নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন[৩৩] এই ধর্ম-কলহ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের স্বপক্ষে পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি সেপ্টেম্বর ১৮৪৪, ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি, জুলাই ও অক্টোবরের পত্রিকায় মতামত ব্যক্ত করেন। এতে তিনি বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পরে এই চারটি সংখ্যা নিয়ে 'Vaidantic Doctrines Vindicated' গ্রন্থ সংকলিত হয়। বেদান্তের ধর্মবোধে ডাফের প্রধান ধারণা ছিল–

১) ব্রহ্মের ধারণা হয় না কারণ মানুষের মন নিজের বস্তুত্ব ও গুণ ভিন্ন অন্য কোনও ধারণা করতে সক্ষম হয় না এবং

২) বেদান্তে নীতির কথা নেই। সুতরাং এ ধর্ম মানুষকে নীতিমান করে না।

দেবেন্দ্রনাথ "Vaidantic Doctrines Vindicated"-এ নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা দেন। "সত্যম জ্ঞানং অনন্তম্ ব্রহ্ম"– মানুষের মধ্যে যে গুণ দেখা যায় সেগুলো অনির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল ও বিকাশশীল বলিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না, সেই অর্থে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়। নীতির কথায় তিনি তত্ত্ববোধিনীতে জবাব দেন "তদেত্য সত্যং পরমং পরস্তাৎ, রসোবৈসঃ" বিজ্ঞান সারথির্যস্থ ইত্যাদি উদ্ধার করে দেখানো হয় বেদান্তে যথেষ্ট নীতির কথা আছে।

বেদান্তে অভ্রান্ততাবাদের সপক্ষে বলা হয় "We will not deny that the reviewer (Dr. Duff) is correct in remarking that we consider the Vedas and the Vedas alone, as the authorised rule of Hindu Theology. They are the sole foundations of all our beliefs, and the truths of all other Sastra must be judged of according to their agreement with them, what we consider as revelation is contained in the Vedas alone, and the last part of our holy scriptures treating of the final dispension of Hinduism from what is called the Vedanta."[৯৪] কিন্তু ব্রাহ্মদের সকলেই এ মতের সমর্থক ছিলেন না– "Most of the articles which appeared in the Patrika in defence of

Vedantic infallibility came, it is believed from the pen of Raj Narayan Bose who had joined the Brahmo Samaj in 1845 and was partriatic advocate of indigenous religion."[৩৫]

অক্ষয়কুমার স্বয়ং বেদে অভ্রান্ততার বিষয়ে বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন যুক্তিমার্গের পথিক। তাঁর কাছে "বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত" এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১ম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর এই মত সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত।

দেবেন্দ্রনাথ ডাফের সমালোচনার যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১৮৪৫ সালে বেদকে ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্মের মূল ভিত্তি এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে বেদান্তের ধর্ম বলে প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হয়। খ্রিস্টানদের সঙ্গে ধর্মকলহে বেদের অভ্রান্ততাবাদের ওপর অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এবং পরবর্তী ২/৩ বছর ধরে এই মতকেই প্রাধান্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হতে থাকে। রাজনারায়ণ বসু এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম সহযোগী ছিলেন। চন্দ্রশেখর দেবও দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। তিনি সুন্দর ইংরেজি লিখতে পারতেন সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়ে ডাফের আক্রমণের প্রতিবাদগুলো লিখিয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে যুক্তির ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়ানো কঠিন হয়ে পড়ে ও মতে স্ববিরোধিতা দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বেদকে নিত্য বলে স্বীকার করছেন না। অথচ বেদমাত্রকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করছেন।[৩৬]

অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের এই ভ্রম দূর করার জন্য স্বয়ং সচেষ্ট হন। "He began to discuss the matter privately with Debendranath and it was also evident that from the day of public iniciation of the doctrine of Vedic infallibility there arisen a dissentient voice among the members of the Samaj itself."[৩৭]

বেদের অভ্রান্ততা বিষয়ক বাদানুবাদে অক্ষয়কুমার ও তাঁর মতবাদে প্রভাবিত তত্ত্ববোধিনী সভার অধিকাংশ সভ্য দেবেন্দ্রনাথের মত সমর্থন করেননি। গ্রন্থাধ্যক্ষ সভায় অক্ষয়কুমারের মতের পরিপোষক সদস্যই বেশি ছিল। বাংলায় বাদ-প্রতিবাদে দেবেন্দ্রনাথ বেদবাক্য মাত্রকেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন "সমগ্র বেদই মান্য ও প্রামাণ্য কারণ পক্ষপাত ও মোহশূন্য হইয়া সেই বেদভাবকে আমরা আলোচনা করিলে তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য সমুদয় বিষয় আমাদিগের বুদ্ধিনিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়। তখন বেদ মধ্যে আমাদিগের বুদ্ধিসীমার অতীত সমুদয় ধর্মও যে অখণ্ড রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রতি সংশয় কি?"[৩৮] এই যুক্তি খুবই দুর্বল।

ইংরেজি বাদানুবাদে দেবেন্দ্রনাথ বেদকে Revealation বা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলে স্বীকার করেছেন।

অক্ষয়কুমার ধর্মপ্রচার ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের সহযোগিতা করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার কাছে যে চিন্তা ত্রুটিপূর্ণ ও ভ্রান্ত মনে হয়েছে তার প্রতিবাদ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি এবং নব রূপায়িত ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাকালেই

তাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না করলে খ্রিস্টীয় প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে এই ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারত এ সত্য অনুধাবন করে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি নিয়ে বিতর্ক শুরু করেন। তিনি ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। অক্ষয়কুমার বেকনের ভ্রান্তি নিরসনের মতবাদ ও মিলের যুক্তিবাদ জীবন ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সত্য নির্ণয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেদকে মনুষ্য-বিরচিত গ্রন্থ বলে গ্রহণ করেছিলেন, এজন্য এর মধ্যে ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক, এই যুক্তিতে তিনি বেদকে অভ্রান্ত মনে করেননি বরং ব্রাহ্মধর্মকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য যুক্তি তর্ক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে বিচার উপস্থাপিত করে এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ভ্রান্তি নিরসনের প্রচেষ্টা চালান।

বেদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক চেতনা জাগরণের পূর্ব যুগের রচনা, তা বিজ্ঞানোত্তর যুগের মানুষের পক্ষে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়– এই ভাবে অক্ষয়কুমার বিতর্ক করেন। দেখা যায় খ্রিস্টান মিশনারি ও জগদ্বন্ধু পত্রিকার বাদানুবাদে দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যয়ের সঙ্গে বেদকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কিন্তু নিজের দলের মধ্যে সদস্যদের বিশেষত অক্ষয়কুমারের মতো মনীষীর সঙ্গে যুক্তিপথে বিচারের ফলে সমগ্র বেদে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য চারজন শিক্ষিত যুবককে চতুর্বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশীতে পাঠিয়েছেন এবং নিজেও কাশীর বৈদিক ব্রাহ্মণদের বিতর্কসভা আহ্বান করে সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভূমিকা নিয়েছেন। দীর্ঘদিন অক্ষয়কুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্ক ও আলোচনা করে অবশেষে অক্ষয়কুমারের মতের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

বিতর্কে দেবেন্দ্রনাথ যে বেদান্তকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলেছেন এই বিশ্বাসকে ঐতিহ্যানুগত বিশ্বাস (বেকনীয় ভ্রান্তি সম্বন্ধে মতবাদ) উপলব্ধি করে অক্ষয়কুমার বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ প্রণালী দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয়ের পদ্ধতিতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বিচার করেছেন এবং দেবেন্দ্রনাথের স্ববিরোধী মতের দুর্বলতা নির্দেশ করে তাকে ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। "এই পুস্তকে (বেদে) কোন ভুল পাওয়া যাইতেছে না, সব কথা যুক্তির সঙ্গে মিলিতেছে, অতএব ইহাকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলা যায়।"[৩৯]

এই যুক্তিকে আশ্রয় করে ভক্তিপ্রধান ও ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল দেবেন্দ্রনাথ বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলেছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে 'ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ' সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাসকে স্পষ্ট করেছেন।

"Though the Brahmos claim the Vedas as revealation of divine truth, they look primarily upon the works of nature as their religious teacher. From nature they learned first, and because the Vedas (as they assert) agree with nature, therefore they regard them as inspired."

"It is therefore evident that the leaders of the Samaj considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and

cogency of these doctrines. Their error lay in believing that whatever they contained was resonable and cognet."[৪০]

দেবেন্দ্রনাথের মতাবলম্বী রাজনারায়ণ বসু বলেছেন "আমরা তখন 'ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে' বিশ্বাস করিতাম বটে কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।"[৪১]

বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার এইরূপ ঈশ্বর প্রত্যাদেশ এবং বেদ আগাগোড়া যুক্তিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করতেন না আর জ্ঞানের বিরোধী কোনও অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস তাঁর ছিল না। এজন্য তিনি বারংবার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচার করেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষয়কুমারের সঙ্গে গভীর ভাবে আলোচনা ও বিচার করে, বেদাদি অধ্যয়ন ও আলোচনা করে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের যুক্তির সত্যতা উপলব্ধি করে এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। "অক্ষয়বাবু ন্যূনাধিক সাত-আট বৎসর কিম্বা তাহার অধিককাল হইবে, ক্রমাগত দেবেন্দ্রবাবুর সহিত বিচার করেন, ইঁহার বুদ্ধি ও তর্কশক্তি অতিশয় প্রখর সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রাজনারায়ণ বসু এবং অন্য কেহই ইঁহার কথা খণ্ডন করিতে পারিতেন না। বহু আয়াস স্বীকার পূর্বক তিনি কয়েক বৎসর দেবেন্দ্রবাবু ও রাজনারায়ণবাবু উভয়ে সহিত তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, দেবেন্দ্রবাবু অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে ধর্মের মূল ভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না,"[৪২]

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ মনে করতেন ব্রাহ্মধর্ম বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও কর্মকাণ্ড পালন দোষনীয় নয়। অক্ষয়কুমারের বিশুদ্ধ জ্ঞানচেতনায় দেবেন্দ্রনাথের এই মতের অযৌক্তিকতা ধরা পড়েছিল। তাঁর মতে ধর্মের ভিত্তি কোনও গ্রন্থ হতে পারে না, ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্তের অতিপ্রভাব থেকে মুক্ত করে তা স্বভাবধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্তিসিদ্ধ পথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন।

এই প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন ধরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের আলোচনা বলতে থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও যুক্তিমার্গ অবলম্বন করে তিনি দেবেন্দ্রনাথের অস্পষ্ট ধারণাকে স্বচ্ছ করতে সচেষ্ট হন– (১) প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা অভ্রান্ত শাস্ত্র (২) ধর্মের ভিত্তিভূমি কোনো গ্রন্থ হইতে পারে না, (৩) বেদ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চেতনা জাগরণের বহু পূর্বযুগের মানুষের রচিত। উহার অধিকাংশ প্রাচীন মনুষ্যজাতির অজ্ঞান প্রভাবের পরিচায়ক এবং বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির ধর্মের নিয়ামক হতে পারে না। এই ভাবে যুক্তি দ্বারা অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথকে বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে সাহায্য করেন।

"There were conflicts of opinion between Debendranath Thakur and Akshay Kumar Dutta on the question of Vedic infallibility. Finally the truth triumphed. The Brahmo Samaj adjured the said doctrine. (The Vedas as the revealed word of God)"[৪৩]

অক্ষয়কুমার স্বদেশানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও যুক্তি ও জ্ঞানের বিরোধী কোনও ঐতিহ্যানুগত বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি এবং ব্রাহ্মধর্মের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি অনুধাবন

করেন। এইভাবে বিচার করে দেবেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যানুরাগী ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রচেষ্টা চালান, এবং স্থিরীকৃত হয় "জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি"– এই ভাবে ব্রাহ্মধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অক্ষয়কুমার কখনই সত্যের সম্মান ত্যাগ করিবার পাত্র নহেন। এই জন্যেই ইনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া বেদ-বেদান্তের অযথা প্রভুত্ব ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠাইয়া দিলেন।"[৪৪]

অক্ষয়কুমার ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্ক ও আলোচনা করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও সমগ্র বেদকে ভালোভাবে জানার জন্য বেদাধ্যয়নের জন্য চারজন যুবককে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন একথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং কাশীতে স্বয়ং গিয়ে ওই চারজন ছাত্রের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করে বুঝে এসেছিলেন যে বেদে কী আছে ও কী নেই। অক্ষয়কুমার ও এদের সঙ্গে আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথ দেখলেন যে বেদ ও উপনিষদে সবই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। 'প্রথমে বেদ ধরিলাম। সেখানে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিস্থাপন করিতে পারিলাম না। তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ ধরিলাম, কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও ভিত্তিস্থাপন করিতে পারিতেছি না। ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয় ঋদ্ধ জ্ঞানোজ্বলিত হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি"।[৪৫]

জ্ঞানোজ্বলিত হৃদয়েই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। ১৮৫১ সালের মাঘোৎসবে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ থেকে ঘোষণা করা হয় যে বেদ-বেদান্ত ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্র নয়। এই বিষয়ে উল্লেখ্য যে অক্ষয়কুমার তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে এই ঘোষণা করেন।

রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিতে লিখেছেন– 'বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত"[৪৬] এই মত অক্ষয়কুমার দ্বারা ১৭৭২ শকে ১১ মাঘোৎসব দিবসে ঘোষিত হয়।

'যে পরমধর্ম সমুদয় মনুষ্যের মানসপটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্বস্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থ যে ধর্মের সাক্ষী, সুতরাং তাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই'।[৪৭]

এইভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্ম যে স্বভাবধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা সুস্পষ্টরূপে এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করলেন– "পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই যে অখিল বিশ্বরূপ সর্বোত্তম গ্রন্থ দ্বারা আপনার অনির্বচনীয় স্বরূপ ও আমাদিগের কতর্ব্যাকতর্ব্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের ব্রাহ্মধর্মের একমাত্র মূল।[৪৮]

ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা, ব্রহ্মোপাসনার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যুক্তি ও জ্ঞানমার্গের পথিক রামমোহন রায়েরও যে এই মত ছিল তা-ও তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন– "তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রকে পরমেশ্বর

প্রণীত শাস্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং তদীয় আলোচনা এবং তন্মুলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইতেন।"[৪৯]

১৭৭৩ শকে ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক বক্তৃতায় তিনি তাঁহার এই মতকে আরও সুদৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বিশ্বসৃষ্টি ও তার সৃষ্টিকৌশল যে ব্রাহ্মধর্মের মূল ভিত্তি তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন– "এক অসীমপ্রায় সৌরজগৎ যে বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থের এক পত্রস্বরূপ সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষর স্বরূপ এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতব্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র।"[৫০]

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই মত পরিবর্তনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। রামমোহন রায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি এই ধর্ম সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাবতীয় কুসংস্কার ও দেশাচার থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করে আধুনিক যুগোপযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতি ব্রাহ্মসমাজ। জাতীয় জীবনের বিকাশ ক্ষেত্রেও ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের প্রভাব যে কত গভীর তার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম নব্যচিন্তাধারার একটি বিশিষ্ট প্রতিমূর্তি।

জীবনকে কোনও মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও আচার-প্রথার অমোঘ অনুশাসনের বন্ধনে না বেঁধে বুদ্ধির আলোকে যাচাই করে নেওয়াই আধুনিক মতবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই আদর্শ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মসমাজ এদেশে নব্যচিন্তা ধারার ধারক হয়ে উঠে। এদেশে সমাজজীবনের এক গভীর সংকটকালে ব্রাহ্মধর্মের নব রূপায়ণ হয়েছিল। সামাজিক প্রগতির বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আগ্রাসন, খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দু সমাজবিরোধী অভিযান ও বিভ্রান্তচিত্ত নব্যশিক্ষিত যুবকদের স্বধর্মবিদ্বেষ– এতগুলো বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ব্রাহ্মধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত করার যেমন প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনই ঠিক এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্নিহিত কতগুলো ভ্রান্তি ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্মের অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ করে দিতে পারত। সেই সংকটকালে ব্রাহ্মধর্মের ভ্রান্তি ও দুর্বলতা দূর করে ব্রাহ্মধর্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত দৃঢ়মতে ও অবিচলিত চিত্তে সংগ্রাম করেন। তার ফলে ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দূর হয়ে ব্রাহ্মধর্মের নবরূপায়ণ সম্ভবপর হয়েছিল।

ব্রাহ্মধর্মের নবরূপায়ণে অক্ষয়কুমারের এই দানের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এদেশে ধর্মবিষয়ক ব্যাপারে এ এক বিপ্লবকর ঘটনা বলা যায়, এভাবে ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততার ও নিত্যতার বিশ্বাসমুক্ত হল। "তাই ১৭৬৯ শকের প্রথমেই (বৈশাখ ১৮৪৭) এপ্রিল মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে উপনিষদের সেই সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ-মন্ত্র শোভিত দেখতে পাই। অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেঃদসামবেদোথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং-ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথপরাময়াতদক্ষরমধিগম্যতে।"[৫১]

"এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কী দুর্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয় তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না, বিনা রক্তপাতে একটি মহান আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল। এই স্বাধীনতা-ভাগিরথী আনয়ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করতেন না।"[৫২]

১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে অতঃপর বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের বদলে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামটি ব্যবহার করা হবে।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও নবরূপায়ণের ধারায় অক্ষয়কুমার দত্তের কার্যক্রমের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে ধর্ম ও সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন। জগৎ ও জীবন বিচারে তিনি লজিকাল পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। নীতিবাদ ও ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মকে বেদান্তের প্রভাব থেকে মুক্ত করে স্বভাবধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠা করা তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম অবদান। ব্রহ্মোপাসনাকে বিশ্বজনীন ধর্মোপসনার রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা রামমোহন রায়ের ছিল কিন্তু তিনি স্বদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর তার ভিত্তি স্থাপন করার জন্য ব্রাহ্মধর্মকে 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' রূপে অভিহিত করেছেন। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক চেতনা কেবলমাত্র এই স্বদেশভিত্তিক ছাড়াও, ধর্মকে বিশ্বজনীন ও বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য তিনি নিউটন, লাপ্লাস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত তত্ত্বগ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। উপনিষদে ব্রাহ্মচিন্তা তাঁর কাছে যতদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক ততদূর পর্যন্ত গ্রহণীয়। রামমোহনের ধর্মচিন্তাও বিজ্ঞাননির্ভর কিন্তু তিনি স্বদেশীয় মানসিকতার দিকে লক্ষ রেখে, দেশীয় ঐতিহ্য গ্রহণের পক্ষপাতী, ধর্মচিন্তায় রামমোহন রায়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের পার্থক্য এখানেই।

তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় রচনা, প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। তা তাঁর কাছে দেবেন্দ্রনাথ কথিত ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারেরই সমতুল্য কারণ একব্রহ্মের সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা পরিদৃশ্যমান; এজন্য তাঁর কাছে সৃষ্টির নিয়মপালনই ধর্ম, তা না করাই অধর্ম। তাঁর গ্রন্থদ্বয়ে এই মত ব্যক্ত। তাঁর প্রাণীবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় রচনার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকৌশল ও মহিমার প্রকাশ। এভাবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান দিয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ যেমন ধর্মচেতনায় বিশ্বের কার্যকারণের রহস্য গ্রহণ করেছেন অক্ষয়কুমার তেমনই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক চেতনায় যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন ও শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়েও তিনি বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এজন্য ধর্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়কুমার ও তাঁর মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন– "তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই।"[৫৩] যে সময় হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র হিন্দু কলেজের ধর্মবিহীন শিক্ষায় উন্মার্গ হয়েছিল এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা জীবনসত্যকে যাচাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল সে সময় অক্ষয়কুমারের

এই যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী ধর্মের আবেদন যুবকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষয়কুমারের ধর্মচিন্তার মূল উৎস হলেও তা স্বদেশপ্রীতির দ্বারা অনুরঞ্জিত ছিল, নতুবা হিন্দু কলেজের অনেকের মতো তিনি একেশ্বরবাদী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বলে খ্রিস্ট ধর্মান্তরিতকরণের বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী ধারণ করেন। বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে তিনি বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ছাড়া এইরকম ধর্মান্তরিতকরণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় তাই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আন্দোলন করেন; যার ফলে দেশের পরস্পর-বিপরীতপন্থীদের নেতৃবৃন্দ একযোগে ধর্মান্তরিতকরণ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উপনিষদ ও বিজ্ঞানশিক্ষাকে তিনি অভিনন্দন জানান; কারণ যাতে স্বধর্মে থেকে বিদ্যার্জন করতে পারে সেই জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। রাজনারায়ণ বসু তাঁকে অজ্ঞেয়বাদী বলেছেন। তাঁর মতো বিশুদ্ধ জানমার্গের পথিকের পক্ষে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর কাজ ও রচিত সাহিত্যসম্পদের মধ্যে এরকম মনোভাবের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। মনে হয় রাজনারায়ণবাবু ধর্মচিন্তা বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মতো ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন, এজন্য অক্ষয়কুমারের বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধর্মীয় মতামতের জন্য তাঁকে অজ্ঞেয়বাদীর পর্যায়ে ফেলেছেন।

অক্ষয়কুমারের চরিতকার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে এক চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন "তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না।"[৫৪] "একদা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটন করিয়া যখন পীড়িতাবস্থায় নৌকা করিয়া চুপীর বাটিতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার আরোগ্যলাভের জন্য গৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। কিন্তু তিনি পৌত্তলিক ছিলেন না।"[৫৫] রোগাক্রান্ত অবস্থায় অক্ষয়কুমারের নারায়ণ-প্রণামের কাহিনীটি জনশ্রুতি হতে পারে। চরিতকারের উক্তির মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষণীয়। নারায়ণকে প্রণাম করেন অথচ পৌত্তলিক ছিলেন না–একথা অসঙ্গতিপূর্ণ। তাছাড়া সমগ্রজীবন ধরে তিনি যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপাসক, কোনও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে কোনও সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই ঘটনা যদি সত্য বলেও ধরা যায় তবে কোনও অসুস্থ রোগজর্জরিত মানুষর সাময়িক দুর্বলতার প্রকাশমাত্র হতে পারে, তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন বলে গ্রহণ করা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক উক্ত রাজনারায়ণবাবুর উক্তি উদ্ধৃত করে অক্ষয়কুমারের ধর্মমতের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে' অক্ষয়কুমারের বিবৃতি থেকে তাঁর ধর্মমত পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' সম্বন্ধে একথা মনে রাখতে হবে যে এই গ্রন্থ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের একটি গবেষণাগ্রন্থ। বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ দূরত্ব যা গবেষণা কার্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এই গ্রন্থদ্বয়ে তাই প্রকটিতে হয়েছে।

ধর্মসম্বন্ধে স্বীয় ধ্যান-ধারণা বিবৃত করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। দেশীয় ঐতিহ্য ও চিন্তাসম্পদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রাচীন কাল থেকে, বেদ উপনিষদের যুগ থেকে বিবর্তিত হতে হতে হিন্দুধর্ম জটিল শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বিশাল পৌরাণিক ও পৌত্তলিক ধর্মে পরিণত হয়েছে তারই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উপক্রমণিকা দুটিও তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণ। তার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মতামতের কোনও প্রতিফলন ঘটেনি। ব্রাহ্মধর্ম তাঁর কাছে যুক্তি ও বুদ্ধিমার্জিত হিন্দু ধর্ম। সেই ধর্মের উৎস যে বেদ-উপনিষদ যা স্থানে স্থানে যুক্তিপূর্ণ হলেও আগাগোড়া সুসংবদ্ধ যুক্তিপূর্ণ নয় এবং যা থেকে রামমোহন রায় যুক্তিযুক্ত অংশ গ্রহণ ও প্রয়োজনানুসারে পরিশোধিত করে আধুনিক যুগোপযোগী করেছিলেন সেই ধর্ম হিন্দুদের ঐতিহ্য ও চিন্তাসম্পদের বাহক তারই ঐতিহাসিক বর্ণনা। এই বিচার-বিশ্লেষণে যুক্তিবাদী Rationalist অক্ষয়কুমারকে পাওয়া যায়, কিন্তু নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী Agnostic অক্ষয় দত্তকে পাওয়া যায় না, কাজেই ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়কে তাঁর ধর্মীয় মতের প্রকাশ বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ভক্তিপরায়ণ রাজনারায়ণবাবু বেদ-উপনিষদ সম্বন্ধে অক্ষয়বাবুর বিচার-বিশ্লেষণ দেখে সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। কিন্তু উপক্রমণিকায় রামমোহন রায়ের কাজ ও মতামতের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন এবং এদেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনবোধে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহন রায়ের পত্রের বর্ণনা ও আলোচনা অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞানচেতনা সম্পন্ন Rationalistic মনেরই পরিচয়বাহী। দেখা যায় অক্ষয়কুমার বাল্যে সংস্কৃত ও ফারসি অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে কোনও ধর্মীয় প্রভাব তাঁর ওপর পড়েনি। পরবর্তীকালে তিনি অল্প কিছুদিন মিশনারি বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন, সে সময় তার অভিভাবকগণও তাঁর সম্বন্ধে শঙ্কিত হন; কিন্তু বোঝা যায় বিনা বেতনে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, কোনও ধর্মপ্রেরণায় তিনি সেখানে যাননি, কোনও স্থায়ী প্রভাবও তাঁর ওপর পড়েনি বরং ধর্মান্তরিতকরণের প্রতি বিরূপতাই পরবর্তীকালে তাঁর কাজগুলোর মধ্যে প্রকাশ পায়। তত্ত্ববোধিনী সভার ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সমাজ শিক্ষা সংস্কারের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এই প্রেরণাও তাঁকে এই ধর্ম প্রচারের সংস্থায় যোগদানে উৎসাহিত করেছিল।

শৈশবকাল থেকেই তাঁর কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ছিল– পাঠশালায় শুভঙ্করী অঙ্ক কষতে গিয়ে তাঁর মনে পৃথিবীর সম্বন্ধে যে কৌতূহল জাগে তা বুদ্ধিবাদী, যুক্তিবাদীর কৌতূহল, যার স্ফুরণ অতি শৈশবকালে গ্রাম্য পরিবেশেই ঘটে; এই স্বভাবজাত মানসিক প্রবণতা তাঁর ধর্মচিন্তারও নিয়ামক। পরবর্তীকালে ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যা পাঠে তিনি প্রচলিত পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাহীন হয়েছিলেন। গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষাকালে তিনি যে পজিটিভ সায়েন্স অর্থাৎ গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নরকরোটিতত্ত্ব, বারিবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এই বিজ্ঞান ও গণিতচর্চা তাঁর সারা জীবনের পাথেয় ছিল এবং সমস্ত রকম কর্ম

ও ধর্মচিন্তারও নিয়ামক ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। আর এই বৈজ্ঞানিক মনের কৌতূহল তাঁকে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনায়ও প্রেরণা দিয়ে থাকবে।

অক্ষয়কুমারের ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁর পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'চারুপাঠ'-এর তৃতীয় ভাগের ভূমিকায় লেখেন– "অক্ষয়কুমার পাঠ্যাবস্থায় মহাকবি হোমার বিরচিত ইলিয়াড কাব্যের পোপকৃত ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া জানিতে পারেন যে, প্রাচীন গ্রীসে আমাদের ভারতবর্ষের মতো বহু দেবতার আরাধনা করিত। শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন গ্রীস এখন একেশ্বরবাদী এবং সমস্ত গ্রীস জাতি পূর্বে যে সব দেবতাদের ভয়ে কম্পমান ছিল সেই সব দেবতারা এখন কৌতুকের সামগ্রী হইয়া আছেন। অক্ষয়কুমারের মনের মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিমা পূজার বিরোধী হইলেন। ইহার পরে, বিজ্ঞানসম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়বোধেরই সমষ্টিমাত্র, এইরূপ তাঁহার ধারণা জন্মে। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন। শেষ বয়সে বোধ হয় বহু আলোচনা ও বহু দর্শনের ফলে জগতের আদি কারণ বিশ্ববীজের প্রতি জ্ঞানযোগী অক্ষয়কুমার পুনর্বার আস্থাবান হইয়াছিলেন।"[৫৫] সেকালের পরিবেশে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গির বিশেষ মূল্য ছিল এবং শিক্ষিত যুবকদের ওপর তাঁর প্রভাবও ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ উপাসক ও এবং শেষ জীবন পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নিয়ে পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গৃহসজ্জা ছিল বিজ্ঞানপ্রীতির পরিচায়ক, বৈজ্ঞানিকদের চিত্র, প্রস্তরীভূত সামগ্রী ইত্যাদি দ্বারা তাঁর গৃহ সুশোভিত থাকত। শেষ জীবনে রোগাক্রান্ত অবস্থায় এই বিজ্ঞান-প্রীতিই তাঁর দেহ ও মনের একমাত্র আশ্রয় ছিল। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষলতা দ্বারা রচিত বালীর 'শোভনোদ্যান' ছিল তাঁর আশ্রয়। সেসময়ে এই উদ্যান কনিষ্ঠ বোটানিকাল গার্ডেন নামে অভিহিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যে নব্য হিন্দু ধর্মের আদর্শ প্রচার করেন তার মূলকথা শারীরিক জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত অনুশীলন ও সমুদয় বৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান। অক্ষয়কুমারও তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'ধর্মনীতি'তে বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য বিধানের কথাই বলেছেন। ধর্মও তাঁর কাছে প্রাকৃতিক নিয়মপালনের ব্যাপার, সংসারে সুখলাভ করতে হলে জগদীশ্বরের নিয়মপ্রণালী অবগত হওয়া ও সেগুলো যথাযথ ভাবে পালন করাই তাঁর কাছে ধর্ম। তাঁর এই ধর্মের আবেদন যুক্তির কাছে।

দেবেন্দ্রনাথের ঠাকুরের সহযোগীরূপে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সহযোগীরূপেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মের মহিমা প্রচার করেছেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও দেবেন্দ্রনাথের ধর্মের ব্যাখ্যান প্রচার করেছেন। তাঁর যুক্তিতে বেদ অভ্রান্ত নয় বা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয় কারণ বিজ্ঞান-চেতনা জাগরণের পূর্বযুগের মনুষ্যকৃত রচনায় ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এজন্য ব্রাহ্মধর্মে বেদের আধিপত্য বিষয়ে তিনি

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথকেই অক্ষয়কুমারের যুক্তি মেনে নিতে হয়েছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম থেকে বেদের আধিপত্য উঠিয়ে দিতে হয়েছিল। সমাজজীবনে আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই এভাবে অক্ষয়কুমারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ধর্মের আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়েছিল এবং দেশকাল ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমারের এই ধর্মচিন্তা পরবর্তী সময়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানচিন্তাকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে।

উল্লেখপঞ্জি

১. Edited by Atul Chandra Gupta : Studies in the Bengal Renaissance, 1st Edition, 1958. Page No. 1

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ২য় সংস্করণ ১৯৬৫ পৃ. ৭৫।

৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত। ৫ম সংস্করণ (দে'জ পুনর্মুদ্রণ ১৯৭২) জন্মাষ্টমী পৃ. ১৯।

৪. তদেব, পৃ. ২।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতপথিক রামমোহন রায়– রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮ পৃ. ৩৯০ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত)।

৬. Sophia Dobson Collet : The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, 3rd Edition. Edited by Dilip Kumar Biswas and Probhat Chandra Ganguly, 1962. Page No. 243.

৭. তদেব, পৃ. ২২৪-২২৫।

৮. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯২৭, পৃ. ৬০।

৯. ঈশোপনিষদের শ্লোক ঈশ ॥ ১॥

১০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ ভাদ্র ১৭৭৫ শক ১ম সংখ্যা সম্পাদকীয় নিবন্ধ। ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪. তদেব।

১৫. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৭ পৃ. ৪৬।

১৬. অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোথর্ব্বদেবঃ শিক্ষাকল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। উপনিষদের শ্লোক।
১৭. তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ, তদুপাসনমেব ॥ তদেব।
১৮. অক্ষয়কুমার দত্ত– বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম ভাগ অষ্টম সংস্করণ ১৮০৩ শকাব্দ।
১৯. তদেব।
২০. তদেব, পৃ. ১০।
২১. অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭২ শক।
২২. Sibnath Sastri : History of Brahmosamaj, Vo. II, Page-310.
২৩. R. C. Dutta : The Literature of Bengal, 1877, Page 163-64.
২৪. অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৭ শক ১লা আষাঢ় ২৩ সংখ্যা সম্পাদকীয় নিবন্ধ।
২৫ এবং ২৬. তদেব।
২৭. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ আগস্ট ১৯২৭, পৃ. ৮০-৮১।
২৮. ড. হরপ্রসাদ মিত্র : বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ, ১৭ই অক্টোবর ১৯৬৩, পৃ. ৭।
২৯. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ৩য় সংস্করণ ১৯৫২, পৃ. ১৮-১৯।
৩০. মহেন্দ্রনাথ রায় : বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, ১ম সংস্করণ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৮২।
৩১. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ আগস্ট ১৯২৭, পরিশিষ্ট ৪৫ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪২০।
৩২. তদেব, পৃ. ৪০০।
৩৩. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত ২৮ অক্টোবর পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশ পৃ. ৪১৭।
৩৪. Sen P. K. Biography of New Faith, Vol I 1950, P. 159.
৩৫. Leonard: History of Brahmosamaj, Ist Edition. ebid P. 159-60.
৩৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ২৪-২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।
৩৭. Sibnath Sastri : History of Brahmosamaj, Ist Edition.P. 64.

৩৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ২৪-২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ।
৩৯. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ ১৯২৭, পরিশিষ্ট ৪৫ পৃ. ৪২৫ ।
৪০. তদেব, পৃ. ৪৪২, রাজনারায়ণ বসু, ডিফেন্স অফ ব্রাহ্মইজম্ এ্যান্ড দি ব্রাহ্মসমাজ-এর উদ্ধৃতি ।

Defence of Brahmoism and the Brahmosamaj- Mr. Mullar 'Essay on Vedantism, Brahmoism and Christanity' থেকে উদ্ধৃতি ।

৪১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ৩য় সংস্করণ ১৯৫২ পৃ. ৬৪ ।
৪২. মহেন্দ্রনাথ রায় : বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, ১ম সংস্করণ ১৮৮৫, পৃ. ৮৪-৮৫ ।
৪৩. Leonard: History of Brahmosamaj, Ist Edition.
৪৪. মহেন্দ্রনাথ রায় : বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত, ১ম সংস্করণ ১৮৮৪ পৃ. ৯৯ ।
৪৫.সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯২৭, পৃ. ১৬৬-১৬৭ ।
৪৬. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ৩য় সংস্করণ ১৯৫২ পৃ. ১৮১৯ ।
৪৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক ফাল্গুন, একবিংশ সংখ্যা, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা, পৃ ২১৫ ।
৪৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শক পৃ. ১৬৩ ।
৪৯. তদেব, পৃ. ১৬০-১৬১ ।
৫০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩ শক ফাল্গুন, ১০৩ সংখ্যা পৃ. ১৪৮ ।
৫১. উপনিষদের শ্লোকের উদ্ধৃতি ।
৫২. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯২৭ পরিশিষ্ট ৪৫, পৃ. ৪২৫ ।
৫৩. তদেব, পৃ. ২২০ ।
৫৪. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়চরিত, ১৮৮৭, পৃ. ৩৯ ।
৫৫. অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ, তৃতীয় ভাগ, একত্রিংশ সংস্করণ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত ভূমিকার উদ্ধৃতাংশ পৃ. ১ ।

জা হে দ স র ও য়া র

ক্রসফায়ার থাকলে আইন-আদালত থাকার প্রয়োজন কি?

বই	:	ক্রসফায়ার [রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড]
সম্পাদক	:	নেসার আহমেদ
প্রকাশকাল	:	ফাল্গুন ১৪০৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রকাশনী	:	ঐতিহ্য ও চিন্তা
প্রচ্ছদ	:	ধ্রুব এষ
পৃষ্ঠা সংখ্যা	:	৫২০
মূল্য	:	পাঁচশ বিশ টাকা

ভারসাম্যহীন পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় রাষ্ট্রগুলো হল সাম্রাজ্যবাদ নামের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির এজেন্সি। বিদেশি ক্ষমতার পূজা করা আর নিজেদের অনিয়ন্ত্রিত লোভের ক্ষুধা মেটানোই রাষ্ট্রগুলোর একমাত্র লক্ষ্য। রাষ্ট্র এমন এক সীমানা যার ওপরে আছে ঝলমলে নগরী আর নগরীর আরামের জন্য আলো আর বিদ্যুৎ তৈরির অন্ধকার প্রকোষ্ঠ; যেখানে খেটে মরে দাসশ্রেণী । দাসেরা যখন উপরে উঠে আসতে চায় অথবা তাদের অবস্থার পরিবর্তন চায় তখন তাদের নাম হয় সন্ত্রাসী, চরমপন্থী আর ক্রসফায়ারে দিয়ে তাদের হত্যা করা হয়।

নেসার আহমেদ সম্পাদিত ও ঐতিহ্য-চিন্তা'র যৌথ প্রকাশনা "ক্রসফায়ার রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড" নামের প্রায় পাঁচশ পৃষ্ঠার কিতাবখানা পড়ে যে কেউ উপরের প্রস্তাবনার সঙ্গে যোগ করতে পারে নিজের আত্মাকে। এই বইটি পড়তে পড়তে পাঠক দেখতে পান কীরূপে তিনি বদলে যাচ্ছেন। এটা মধ্যরাতে বদহজমজনিত কারণে লেখা কোনো কিতাব নয়। আগপাশতলাহীন বানানো কোনো

রাক্ষসের গল্পও নয়। এমন কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পাদক মহাশয়ের কথাবার্তা, যাদের নিকট-আত্মীয়দের রাষ্ট্র নামক দানবটি গ্রাস করেছে নির্বিচারে। এগুলো এমন কিছু জনতার জবানবন্দি যারা প্রায় পাঁচশটি ক্রসফায়ারে দেয়া নাগরিকের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। সম্পাদক এখানে কাউকে দোষি করেন নাই। শুধু এই সাধারণ মানুষের বোকা বোকা সাক্ষাৎকার থেকে উঠে আসতে থাকে রাষ্ট্র সম্পর্কে জনগণের দর্শন। সেই হিসাবে ইহা জনগণের রাষ্ট্রদর্শনের বহিও।

প্রায়শই 'ক্রসফায়ার' নামক শব্দের সঙ্গে একটা জিনিস সংবাদপত্রগুলো ছাপে যে সন্ত্রাসী বা চরমপন্থিকে নিয়া তার অস্ত্রের সন্ধানে যাবার সময় ওঁৎপেতে থাকা সন্ত্রাসী বা চরমপন্থির লুকিয়ে থাকা লোকজন হামলা করলে ক্রসফায়ারে তিনি ইন্তেকাল করেন। এই জিনিস প্রায় প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের সাথেই শুনতে হয়েছে নির্বাক তাকলাগা বোবার মতো পুরা জাতিকে। আসলে তার ভেতরের সত্য কী, সেটা বলে দেয় এই কিতাব।

এখানে জনগণের কিছু বলবার নাই। অথবা জনগণ কিছু বললেও তা মিছা। কারণ শক্তি রাষ্ট্রের সুতরাং তার ভাষ্যই সঠিক ও ন্যায়। আমাদের রাষ্ট্র আজ স্পষ্টত দুই ভাগে বিভক্ত। সরকার এবং দেশের জনতা। এদের মধ্যে কোনো ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক নাই বললেই চলে। এদের সম্পর্ক শুধুই শোষক আর শোষিতের। রাষ্ট্রের সমস্ত রকম সংজ্ঞার বাইরে গিয়ে বাংলাদেশ এখন রাষ্ট্রহীন অথবা নতুন ধরনের রাষ্ট্র। যে দেশে জনগণের সাথে সরকারের কোনো জবাবদিহিতার সম্পর্ক নাই, শুধু নিপীড়নের ক্ষেত্র ছাড়া; যে দেশে সরকার ও তার চাকরিজীবীরা বা সরকারি দলের সাথে জড়িতরা একপক্ষে, বাকি পক্ষে তার জনগণ; এদের সম্পর্ক এখন দা-কুমড়ো শত্রুতার। সমস্ত মিডিয়াকে সরকারের স্বার্থে ব্যবহার করায় তারা যা করে তাই একমাত্র ন্যায়ে পরিণত হচ্ছে আর জনতা যা করে তা অন্যায়। এখানে এসে থ্রাসিমেকাসের অর্ধসত্য যুক্তিটা খাপ খায়: ন্যায় হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ একটি প্রয়াস। স্বাধীনতা লাভের পরে একটা রাষ্ট্র যে পর্যায়ে উন্নীত হবার কথা বাংলাদেশে ঠিক সে পরিমাণ অবনমিত হয়েছে। এর মূল কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় জাতীয় অনভিজ্ঞতা। এর আগে বাংলাদেশীদের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না; প্রশাসনিক মানদণ্ড হওয়া দরকার নৈতিকতার, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সবসময় যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারাই প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে নিজেদের স্বার্থে। জনগণের সাথে চুক্তিভঙ্গ করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে করতে প্রশাসনকে এরা সম্পূর্ণ দলীয় বাহিনীতে পরিণত করেছে।

মহামতি টয়েনবি বলেন "সুগঠিত রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে কেউ যদি একবার নিজের কাজে লাগায়, তাহলে দুর্নীতি সেখানেও প্রবাহিত হয়ে যায়, তারা যে শুধু দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাই নয় বরং তারা সব ধরনের ছাড়পত্রই পেয়ে যায় এমনকি বিনাবিচারে হত্যা ও

ধর্ষণেরও" । কারণ নিজেরা একবার দূষিত হলে দূষিতরা নিজেরাও সুবিধা চাইবে এটা নতুন কিছু নয় । এভাবে দূষিত হতে থাকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-পরবর্তী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো । বাংলাদেশে সরকার পরিচালনার একটা বিশাল অংশ ভয়াবহ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রয়েছে । এই অভিশাপ থেকে বাংলাদেশ মুক্তি পাচ্ছে না । অতি অল্প করে বললেও বলতে হবে, এটা একটা দৈত্য । এমন কোনো সরকারি শাখা-প্রশাখা নাই যেখানে টাকা ও ক্ষমতার হোলি খেলা চলে না । সেখানে টাকা ও ক্ষমতাই হচ্ছে শক্তিমত্তা । সেখানে মেধা ও পরিশ্রমের মূল্য নেই । থানা কোর্টে সরকারি অফিসগুলোতে উৎকোচপ্রথা খোলামেলা ব্যাপার ।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হল, বাংলাদেশে এখন জনগণের নিজস্ব কোনো খাদ্য নাই । খাদ্যব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে সিন্ডিকেট । মাঝে মাঝে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তারা জনগণকে খাদ্যহীন করার ভয় ও অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করে । আর যা পাওয়া যায় তা-ও সব দূষিত, ভেজাল । পুরা জাতির স্বাস্থ্য আজ সিনিন্ডকেটের হাতে । এই সিন্ডিকেট আবার সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল । এগুলো দেখার কোনো লোকও নাই, উপায়ও নাই । বলা যায়, সবাই চোর অথবা ডাকাত । কেউ হয়তো ছোট চোর কেউ-বা বড় ডাকাত ।

নবজাতকের দুধ থেকে শুরু করে নির্ভেজাল কোনো খাদ্য এদেশে এখন দুর্লভ । কারণ চাষি শস্য ফলানোর পর এখন শস্যও আর ধরে রাখতে তারা পারে না; কারণ বীজের রাজনীতিরও তারা শিকার । সিন্ডিকেটের হাতে এদেশের জনগণ শুধু বন্দীই নয়, সিন্ডিকেট পরিকল্পিতভাবে মেতে উঠেছে খাদ্য-বিষক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জাতি হত্যা করতে । শুধু যে নবজাতক শিশুর খাদ্যই আজ বিষাক্ত তা নয়, জন্মের আগেই মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা যাচ্ছে এরকম ঘটনা অগণিত । এই কারণে ক্রমে কমছে বাংলাদেশীদের গড় আয়ুও । ক্যান্সার, কিডনি বিকল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুরারোগ্য ও ব্যয়বহুল অসুখে ধরাশায়ী পুরা জাতি । সরকারিভাবে কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা নাই বললেই চলে । যদিও বাংলাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা প্রচুর । ইদানিং সব জায়গায় গজিয়ে উঠছে প্রচুর ফার্মেসি । খাদ্যে যারা ভেজাল মিশিয়ে মানুষকে অসুস্থ করছে তারাই আবার ঔষধ বেচে হাতিয়ে নিচ্ছে জনগণের টাকা । বাংলাদেশে চিকিৎসা ও শিক্ষা আজ কুৎসিত ব্যবসায় পর্যবসিত হয়েছে । আর সামাজিক ন্যায়বিচার যেন এদেশে সেকেলে বিষয় । জনতার প্রতি মুহূর্তের আতংক আইনপ্রয়োগকারী বাহিনী নিয়ে । আইনপ্রয়োগ সংস্থাগুলো সম্পূর্ণ দূষিত ।

আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীকৃত বিভিন্ন জায়গায় বিলবোর্ডে দেখা যায়, "র‍্যাব ও পুলিশ জনগণের বন্ধু হতে চায়" । দেখে কেঁপে উঠি । তারা বিনা বিচারে নিরপরাধ জনগণকে ধরে ধরে পাখির মতো গুলি করে মারছে আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে বলছে তারা জনগণের বন্ধু হতে চায়! তাহলে তারাও স্বীকার করছে যে তারা জনগণের শত্রু । দীর্ঘদিনের কুয়াশাবৃত থাকার কারণে তারা বোঝে না যে তারা কখনো জনগণের বন্ধু

হতে পারে না। তারা জনগণের পেশাদার দাসমাত্র। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার টাইম জনগণের নাই। আরও একটি বিষয় হল, একেকটা জমির মামলা নিয়ে চারপুরুষের জীবন পগারপার করে ছাড়ে আইন ও প্রশাসনের লোকেরা। যেন হতভাগা মানুষগুলো জন্মেছিল শুধু জমির মামলা তদারকি করতেই। সার্বিকভাবে জনগণকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে রাখার মধ্যে আসলে ক্ষমতাকে স্থায়ী করবার রাজনীতি আছে। দারিদ্র্য আর অশিক্ষা প্রায় সমান পাপ। একই সুতায় গাঁথা এ পাপ কৃত্রিম দানব যা এই রাষ্ট্রের তৈরি। জনজীবনকে সম্পূর্ণ দূষিত করে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে, অসুস্থ দুর্বল রেখে ক্ষমতাবানরা ক্ষমতার চিরস্থায়িত্ব চাইছে। দেশকে বিষাক্ত কারাগার বানিয়ে তারা পার করছে অভাবমুক্ত বিলাসবহুল জীবন।

এই যে খাদ্য-বিষক্রিয়ায় গণমৃত্যুরত জনগণ, এই যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করা জনগণ, এই যে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রার্থী সম্পত্তি রক্ষার জন্য ধুঁকে ধুঁকে মরা জনগণ, এই যে অশিক্ষায় অভাবে অবিচারে ক্ষয়রত ফুঁসে ওঠা জনগণ– এদের সন্ত্রাসী নামে ডাকা হচ্ছে। এদের হত্যা করা হচ্ছে প্রায় বিনা বিচারে। আবার তার গ্লামারাস নাম দেয়া হচ্ছে 'ক্রসফায়ার' যা কিনা নৈরাজ্যের বা দানবরাজ্যের প্রজাপীড়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর মিডিয়াগুলোর বদৌলতে সেটা ন্যায়ের মেটাফোর বানানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু যারা এর নীতিনির্ধারক, তারা কি জানেন, এই সব গণবিরোধী-সভ্যতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস কীরূপে লিখিত হয়ে যাচ্ছে; সেই ইতিহাসের খলনায়ক যে তারাই, এটা তারা কি বোঝেন? এদের কাছে আমার প্রশ্ন, দেশে ক্রসফায়ার থাকলে আইন-আদালত থাকার প্রয়োজন কী?

কিন্তু আদিসত্য হল রাষ্ট্র জনগণের। রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য। রাষ্ট্রের মধ্যে যারাই অপরাধ করে তাদের জন্যই মূলত আইনব্যবস্থা যেটা প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। জনগণ কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। রাষ্ট্র কখনো জনগণকে এই উপাধি দিতে পারে না। এ ক্ষমতা তাকে জনগণ দেয় নাই। জনগণকে বিনা বিচারে হত্যা করবার অধিকার তাকে জনগণ দেয় নাই। মহামতি হবস বলেন: হত্যা, আঘাত বা পঙ্গু করবার; অথবা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ না করবার; অথবা খাদ্য, বাতাস, ঔষধ কিংবা যা না হলে সে বাঁচতে পারে না, এমন কোনো নির্দেশ যা ন্যায়সঙ্গতভাবেই নিন্দার্হ, রাষ্ট্র জনগণের ওপর এগুলো চাপিয়ে দিলে জনগণেরও অবাধ্যতা বা বিদ্রোহের স্বাধীনতা ন্যায়সঙ্গত। ম্যকিয়াভেলি আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, রাষ্ট্র তার চুক্তি ভঙ্গ করলে জনগণের বিদ্রোহ করবার অধিকার তো আছেই, তদুপরি অধিকার আছে রাজাকে হত্যা করবারও। ইতিহাসখ্যাত এই সব দার্শনিকদের সঙ্গে মিল রেখে আমরা বলব, "রাজা হুঁশিয়ার!"

সব শেষে বলব, নেসার আহমেদ সম্পাদিত ও সাক্ষাতগ্রহণকৃত এই পরিশ্রমলব্ধ কর্মকাণ্ডটি রাষ্ট্রের নিপীড়নের ভাষা ও পদ্ধতি বুঝে নেবার পক্ষে ছহি। নেসার আহমেদকে সেলাম।

জীবনানন্দ দাশ

.....

কেন লিখি

জীবন ছাড়িয়ে কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা থাকা কি সম্ভব? কবির অভিজ্ঞতা যা আকাশ পাতাল সমস্তই উপলব্ধি করে নিতে চায় তা-ও তো মানবীয়। অবশ্য এরকম কবি আছেন–বা কাব্যনিয়তির পথে এমন সব মুহূর্ত মাঝে মাঝে এসে পড়ে যখন মনে হয় কবির ভাবপ্রতিভা এমন এক অপরূপ অপ্রশান্তির আস্বাদ পেয়েছে যা জীবনের কোনো ব্যবহারের ভিতরেই ধরা পড়ে না, জীবনের প্রতিবিম্বও নয়, আমাদের এই ইতিহাসম্মত জীবন ছাড়িয়ে কবিমানসের কোনো অনন্য অভিজ্ঞতার দেশে চলে গিয়েছে। কোনো কবি যদি এরকম মনে করেন তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি কালকের বা আজকের নিত্যব্যবহার্য সমাজপদ্ধতির বাইরে কোনো কিছুর কথা ভাবছেন, কিন্তু তবুও জীবনের বাইরে কোথাও চলে যেতে পারেননি। কারণ জীবন, –এই জীবনের পদ্ধতি যে কোনো সমাজ ও সমবায় পদ্ধতির চেয়ে বড়, এরই ভিতরে মানুষের সমবায়-ব্যবস্থা বার বার ভেঙে যাচ্ছে ও নতুন ভাবে গড়ে উঠছে। আমাদের এই গ্রহের জীবনসাক্ষ্যের সবচেয়ে স্মরণীয় দৃষ্টান্ত মানুষ; কোনো বিস্ময়কর প্রমত্ততার মুহূর্তেও নিজেকে অন্যরূপ কল্পনা করা তার পক্ষে কঠিন; তার কল্পনাপ্রতিভার চমৎকার সংহতির মুহূর্তে মানবজীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান কথা আবিষ্কার করবার কিংবা নতুন ভাবে প্রচার করবার সুযোগ সে পায়। এই সব সময়ই হচ্ছে কাব্য বা শিল্পসৃষ্টির সময়।

যাঁরা মনে করেন কবিতা যে কোনো সময় সৃষ্ট হতে পারে কারণ কবিতা সমীচীন গদ্য বা ভূয়োদর্শী সম্পাদকীয় মন্তব্যের মতোই, –কবিতা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অন্য রকম হবে। তাঁদের মতো হয়তো মানুষের ভূয়োদর্শী মনই কবিতা রচনা করে যেতে পারবে–গদ্য কি পদ্যে, এবং সে কবিতার ভাষা ও অর্থে কোনো দিব্য ইঙ্গিত বা দিব্যতার স্পর্শ থাকবে না, কিংবা থাকা অবান্তর, বা অপরাধ।

থাকা অপরাধ। তাদের কারো হয়তো এই মত। অনেক স্থলেই তাই দেখেছি সৎ সম্পাদকীয় উক্তিই যেন কবিতা। কিন্তু কবিতা বাস্তবিকই কি তাই? যে কোনো সুস্থ ও সমীচীন মানুস অসুস্থ বা অন্যবিধ সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উক্ত রকমের মন্তব্য

প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, –এবং অহরহ করে যেতে পারেন। এর জন্য আত্মভ্রষ্ট হৃদয়াবেগ ও কল্পনাপ্রতিভাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার মতো কোনো বিশেষ সুযোগ বা প্রতীক্ষার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কারণ তাদের মতে কাব্য রচনা সম্পর্কে ভাবনা প্রতিভা ও হৃদয়াবেগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কবিতা লেখার কাজ খুব উন্নতভাবে সম্পন্ন করবার পক্ষে রচয়িতার সচেতন জীবনদর্শী মন ও সেই মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করবার মতো লিপিকুশলতাই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুটো জিনিসের উৎকৃষ্ট সামঞ্জস্যে যে সুলিপি প্রবর্তিত হয় কবিতা কি তা ছাড়া অন্য কিছু? আমার মনে হয়, এই সুলিপি সত্যিই খুব ভালো জিনিস। কিন্তু সুসমাচারের মতো এই সুলিপি –এই সমস্ত জিনিসকেই অবান্তর করে দিয়ে কবিতা নিজের চরিত্রবলে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। পূর্বজ কবিরা একে মনে করতেন মায়াবল। অতটা সাহস আমার নেই। আমি একে কবিতার চরিত্রবল বলে অভিহিত করেছি। যে কোনো রচনা-সৌষ্ঠবকে অপ্রাসঙ্গিকতায় পরিণত করে দু-একটা লাইন, কয়েকটি লাইন কিম্বা সম্পূর্ণ একটি জিনিস অবিসংবাদীভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে কবিতা হয়।

কবিতার সংজ্ঞা ও কবিতা পাঠ সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতা লেখক ও পাঠক উভয় শ্রেণীর ভিতরেই সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে এ আশা স্পষ্টভাবে পোষণ করবার মতো কোনো উৎসাহ অভিজ্ঞ মানবের হৃদয়ে আজ হয়তো নেই। কিন্তু সে আশা যাতে চিরকালই ছলনার মতো না থেকে যায় সে জন্য আধুনিক লেখকেরা আবার অবহিত হয়ে উঠছেন।

লেখক হিসেবে আমিও অবহিত হয়তো, –কিন্তু অসমর্থ। আমার সৃষ্টিপন্থাও সূর্য ও তপতীকে আশ্রয় করে; হয়তো তপতীকেই অবলম্বন করেছি বেশি–কোনো এক ভবিষ্যত বিশেষ করে সূর্যাশ্রয়ী হবার জন্য। কবিতা কী,– কী,– কী তার কাজ কাজ, কী করে কবিতা গ্রহণ করতে হবে, –এই সব জিজ্ঞাসা সম্পর্কে কবি ও পাঠকের ধারণা ক্রমশই আরো পরিচ্ছন্ন না হলে উভয় পক্ষই অস্বস্তি বোধ করবেন। আমার এবং যাদের আমি জীবনের পরিজন মনে করি তাদের অস্বস্তি বিলোপ করে দিতে না পেরে, জ্ঞানময় করবার প্রয়াস পাই এই কথাটি প্রচার করে যদি ভাবা যায় যে কবিতা মানুষের আধুনিক জীবনকে নিরন্তর ভবিষ্যতের শ্রেয়তর সামাজিক জীবনে পরিণত করে চলেছে তা হলে সে ধারণা ঠিক হবে না।

কবিতার ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসে বুঝে নিতে পারা যায় যে কবিতা মানুষের জীবনের কল্যাণমানসকে অপরোক্ষ ভাবে চরিতার্থ করবার সুযোগ না দিয়ে বরং জীবনের স্বর্গ ও আঘাটা সবেরই ভয়াবহ স্বাভাবিকতা ও স্বাভাবিক ভীষণতা আমাদের নিকটে পরিস্ফুট করে; আমাদের হৃদয়, ভাবনা ও অভিজ্ঞতার সৎ কি অসৎ পরিণতির পথে কৃষ্ণপক্ষের সূর্যের মতো (ভেবে নেওয়া যাক) উপস্থিত হয়; আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়; অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তর ভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।

এই করে। এবং এই সমস্ত করে বলেই আমাদের গতিপরিণতির কাহিনী নিয়েই কবিতা; পরিণতিশীল জীবনকে পূর্বোক্ত উপায়ে সজাগ ও শালীন করে তুলবার ভার কবিতার ওপর।

কিন্তু তবুও কবিতার ওপর বাস্তবিক কোনো ভার নেই। কারো নির্দেশ পালন করবার রীতি নেই কবিমানসের ভিতর, কিম্বা তার সৃষ্ট কবিতায়। অথচ সৎ কবিতা খোলাখুলি ভাবে নয়, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ সমগ্রতার উৎকর্ষে শোষিত মানবজীবনের কবিতা, সেই জীবনের বিপ্লবের ও তৎপরবর্তী শ্রেষ্ঠতর সময়ের কবিতা। মহৎ কবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক (আশা করা যেতে পারে), অভিজ্ঞতা সজাগ, ও চেতনা অবচেতনা ঐকান্ত্রিক ভাবে সক্রিয় থাকার দরুণ ব্যবহারিক পৃথিবীতে এ রকম মানুষের কাছ থেকে জীবনের উন্নতিশীল ভাঙা-গড়ার কাজে শুভ ও সার্থক আত্মনিয়োগ দাবি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির ভিতেরই তিনি ঢের বেশি স্বাভাবিক ও স্মরণীয়–এমনকি অধিকতর মহৎ;–বাস্তব কার্যক্ষেত্রে তেমন নন।

এ রকম উক্তি করতে গিয়ে আমি সত্যই আত্মবিস্মৃত কিনা তা সমসাময়িক কবি-বন্ধুরা বিচার করে দেখবেন।

আমার মনে হয়, এই সমস্ত উপরোক্ত বিষয় অনুভব করে আমি লিখি। কিন্তু কবিতা বা সাহিত্যই শুধু নয়, সুলিপি সৃষ্টি করবার জন্যও (এই সমস্তই ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষার কথা, সফলতার কথা নয়) লেখা প্রয়োজন মনে করি।

আজকের দুর্দিনে মানুষের নিঃসহায়তার রূপ কী রকম, কী করে তা কাটিয়ে উঠে জীবনের শুভ অর্থ বোধ করতে পারা যায়, এসব বিষয় নিয়ে যে কোনো প্রবীণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও তার লিপিময় প্রকাশ মূল্যবান জিনিস। যদি একথা স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে অগণন কবিমনীষীর সৎ জীবননির্দেশের সমুদ্র আমাদের হৃদয়ের কাছে থাকতেও তা প্রায়শই আমাদের জন্য লবণাক্ত হয়ে রয়েছে–এবং তার পাশেই ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের অন্নপূর্ণা মরীচিকা,–তবুও তাতে এ জিনিস প্রমাণিত হয় না যে কবিতা ও সাহিত্য ও সুলিপির ইতিহাস বিশ্ব-মানুষের ভাবনা ও চেতনাকে মূল্যজ্ঞানময় ও চরিত্রবান করে তোলেনি।

শোষিত মানবজীবনের, সেই জীবনোৎসারিত বিপ্লবের ও সেই বিপ্লবের শেষে আশা-ভরসার সমাজের কবিতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু নিয়েই কবিতা মহৎ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সমস্ত কাজও সময়, দেশ, প্রকৃতি ও প্রেমের ঐকান্তিক জিনিস হয়েও কেবলি শ্রুয়মান, ধ্যেয়মান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবন সম্পর্কে সচেতন ও অভিজ্ঞ,– ও এই অভিজ্ঞতা –এই সুজাতার থেকেই উৎসারিত।

[উৎস: আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত "সমালোচনা সমগ্র/জীবনানন্দ" গ্রন্থ]

.....

কবি সমরেশ দেবনাথ-এর বই

গ্রন্থ	প্রকাশনা
শ্রেষ্ঠ কবিতা	বিশ্বকবিতা পরিষদ
বর্তমান বিশ্বের কিবতা (প্রবন্ধা)	তরফদার প্রকাশনী
The Art Of Kissing (Poetry)	World Link
ভূমিপুত্র	চিত্রকথা প্রকাশনী
মৃত্তিকা কন্যা	চিত্রকথা প্রকাশনী
বঙ্গবন্ধু: বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে	বিশ্বকবিতা পরিষদ (সম্পাদিত)
ড. ওয়াজেদ: স্মারক গ্রন্থ	কবীর চৌধুরী উপদেষ্টা
বিশ্ব কবিতা (বাংলা) ৪র্থ সংখ্যা	সম্পাদিত
অস্ট্রিক ১০ম সংখ্যা	কবীর চৌধুরী প্রধান সম্পাদক
Wrld Poetry	সম্পাদিত
বাংলা ও বিশ্বের গ্রন্থ পরিচিতি	বিশ্বসাহিত্য সংগ্রশালা (সম্পাদিত)
শ্রেণী বৈষম্যের গল্প	হাওলাদার প্র:
Myth and Earth (English)	World Link
চিরায়ত কবিতা	World Link

পাওয়া যায় বইয়ের দোকানে

কবি অসীম সাহা-র বই

***কবিতা**	
পূর্ব-পৃথিবীর অস্থির জ্যোৎস্নায়	আনন্দ
কালোপালকের নিচে	বড়াল প্রকাশনী
পুনরুদ্ধার	সম্প্রীতি
মধ্যরাতের প্রতিধ্বনি	অনন্যা
উদ্বাস্তু	সম্প্রীতি
ভালোবাসার রং-তামাশা	বিদ্যাপ্রকাশ
প্রেমের কবিতা	বিদ্যাপ্রকাশ
মুহূর্তের কবিতা	আগন্তুক
অন্ধকারে মৃত্যুর উৎসব	আগন্তুক
শ্রেষ্ঠ কবিতা	অনন্যা
অসীম সাহার নির্বাচিত কবিতা	বিভাস
***প্রবন্ধ**	
প্রগতিশীর সাহিত্যের ধারা	মুক্তধারা
***গবেষণা**	
অগ্নিপুরুষ ডিরোজিও	আগামী প্রকাশনী
***উপন্যাস**	
উদাসীন দিন	নওরোজ কিতাবিস্তান
***গল্প**	
শ্মশানঘাটের মাটি	অনন্যা

সংগ্রহ করুন

মফিদুল হক

.....

মাহমুদ দারবিশ / একান্ত কথন চতুষ্টয়

এক বর্গমিটার কারাকক্ষ

এই হচ্ছে দুয়ার আর দুয়ারের ওপাশে হৃদয়নন্দনপুর। আমাদের বস্তুনিচয়– এবং সকল কিছুই তো আমাদের– আমরা পাল্টে নিতে পারি। আর দুয়ার তো দুয়ার বটে, দ্ব্যর্থকতার দ্বার, কল্পকাহিনীর প্রবেশপথ। যে দুয়ার আশ্বিনকে করে মৃদুমন্দ, চষা ক্ষেতে বয়ে আনে ফসলের উদ্‌গম। যে দুয়ারে নেই আর কোনো দ্বার, তবু তো আমি দুয়ার পেরিয়ে যেতে পারি আপনকার বাহিরে, এবং ভালোবাসায় বরণ করি উভয়ত, যা কিছু দৃশ্যের গোচর, যা কিছু দৃশ্যের বাহির। এই সমুদয় বিস্ময় ও সৌন্দর্য তো নিহিত বিশ্বভুবনে– *সেখানে*– তবুও তো দুয়ারে নেই আর কোনো দ্বার! কোনো আলো পৌঁছয় না আমার কারাকক্ষে, পৌঁছয় কেবল অন্তরপ্রকোষ্ঠে। আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। শান্তি বর্ষিত হউক যা কিছু রোধ করে আছে শব্দের প্রবাহ। আমার স্বাধীনতার বন্দনা করে আমি লিখেছি দশটি কবিতা, এখানে ওখানে। আমি ভালোবাসি ঘুলঘুলি দিয়ে গলিয়ে আসা আকাশের কণা– সামান্য এক ছটা আলো যেখানে সন্তরণ করে অশ্ব। আমি ভালোবাসি মায়ের তুচ্ছতি সকল কিছু, তার কাপড়ে লেপ্টে থাকা কফির ঘ্রাণ আমি পাই সাতসকালে যখন তিনি খুলে দেন মুরগির খাঁচার দ্বার। হেমন্ত ও শীতের মধ্যবর্তী ফসলের খেত আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি কারারক্ষীর সন্ততিদের, দূরের ফুটপাতে বিছিয়ে রাখা সাময়িকপত্রের সারি। আমি বিদ্রূপবহ বিশটি কবিতা লিখেছি সেই স্থান নিয়ে যেখানে আমাদের কোনো স্থান নেই। আমার স্বাধীনতা তো তেমনটি নয় যা তাদের কাম্য, আমার স্বাধীনতা হচ্ছে কারাকক্ষ প্রশস্ততর করে তোলা, দুয়ারের বন্দনা গান গেয়ে চলা। দুয়ার তো দুয়ার মাত্র, তবুও তো দুয়ার দিয়ে আমি যেতে পারি নিজের ভেতরে, বাইরে, করতে পারি ভেতরবাহির।

দুই.
ট্রেনে একটি আসন

এই উড়ুনি আমাদের নয়। বিদায়মুহূর্তের প্রেমিকযুগল। স্টেশনের হলুদ আলো। সেইসব গোলাপ যা প্রেম-প্রত্যাশী হৃদয়কে করে প্রবঞ্চিত, প্ল্যাটফর্মে ঝরে পড়ে বিশ্বাসখোয়ানো অশ্রু। এই পুরাণকথা আমাদের নয়। যাত্রা করেছে ওরা *এখান* থেকে। আমাদের কি এমন কোনো নিশ্চিত গন্তব্য রয়েছে, যেখানে পৌঁছে আমরা পেতে পারি যাত্রাশেষের আনন্দ? টিউলিপগুচ্ছ– আমাদের জন্য নয়। তাহলে রেলকে আমরা কেন ভালোবাসব? আমরা পথ চলছি এক শূন্যতার খোঁজে, তবে আমরা ট্রেনকে কেন ভালোবাসব, যখন নতুন স্টেশন অর্থ নির্বাসনের নতুন এক ঠাঁই। ধোঁয়াচ্ছন্নতায় অপেক্ষমান আমাদের প্রেম অবলোকনের জন্য যে লণ্ঠন তা আমাদের নয়। সরোবর পাড়ি দিয়ে যায় দ্রুতগামী ট্রেন। প্রতিটি যাত্রীর পকেটে গৃহপ্রবেশের চাবি, পরিবারের সমবেত ছবি। সব যাত্রী পৌঁছে যায় নিজ নিজ পরিবারে, আমাদের নেই ফেরবার মতো কোনো ঘর। আমরা চলছি এক শূন্যতার সন্ধানে, চলিষ্ণুতার মধ্যে যেন পেতে পারি প্রজাপতির চিরচঞ্চল শুদ্ধতা।

আমাদের নেই কোনো গবাক্ষ, যেখান থেকে বিনিময় করা যায় নানা ভাষার সম্ভাষণ। যখন আমরা অতীত দিনের ঘোড়সওয়ারি হয়েছিলাম তখন কি ভুবন ছিল অধিকতর স্বচ্ছতোয়া? কোথায় গেল সেই অশ্বদল? কোথায় আজ আমাদের গানের সেইসব অপ্সরার দল? আমাদের ভেতরকার নিসর্গগান আজ কত দূর? আপন দূরত্ব থেকেও বহু দূরবর্তী আজ আমি। তাহলে আমার প্রেম আছে আরো কত দূরে? প্রগল্‌ভ তরুণীরা দস্যুর মতো আমাদের হরণ করে। ট্রেনের জানালায় লিখে রাখা ঠিকানা আমরা বিস্মৃত হই। আমরা, দশ মিনিটের ভালোবাসায় মাতোয়ারা, পারি না এক গৃহে পুনরায় প্রবেশ করতে পারি না জাগিয়ে তুলতে পুনর্বার একই প্রতিধ্বনি।

তিন.
নিবিড় পরিচর্যা কক্ষ

যখন পৃথিবী আমাকে চেপে ধরে, বাতাস পাক খায় আমাকে ঘিরে, হাওয়াকে বাগে আনতে আমার দিতে হয় উড়াল, তখন বুঝি আমি তো কোনো পাখি নই, মনুষ্যমাত্র। আমার অন্তর চুরমার হয়ে যায় কত না বাঁশির বাদনে। আমার স্বেদ তুষারকণার মতো ঝরে পড়ে, হাতের তালুতে ফুটে ওঠে আপন সমাধিচিত্র। ধীরে ধীরে আমি দোলায়িত হই শয্যায়, আমি লাফিয়ে উঠি, হারিয়ে ফেলি চেতন কিয়ৎক্ষণের জন্য, তারপর ঢলে পড়ি মৃত্যুর কোলে। দোলায়মান সেই মৃত্যুর দ্বারে আমি চেঁচিয়ে উঠি, *ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমাকে, তোমার পায়ে পায়ে আমি কি পৌঁছে যেতে পারি মরণে?* এবং আমার মৃত্যু হয়, আমি একেবারে মরতে বসি। তোমার বিলাপধ্বনিহীন মৃত্যু কি শান্ত ও নিস্তব্ধ! শ্বাস ফিরিয়ে আনতে আমার বুকে বারবার চাপ দিয়ে চলা তোমার ও-দুটি

হাতবিহীন মৃত্যু কি শান্ত ও নিরুদ্বেগ! মরণের আগে ও পরে আমি তোমাকে ভালোবেসে যাই এবং এই দোলাচলের মধ্যে দেখি কেবল আমার মায়ের মুখ।

কিয়ৎকালের জন্য বন্ধনমুক্ত আমার হৃদয় ফিরে এসেছে আবার স্বস্থানে। প্রেমাস্পদের কাছে জানতে চাই, *কোন্ হৃদয়ে আমি বাঁধা পড়েছিলাম?* আমার বুকের ওপর ঝুঁকে সজল চোখে জবাব দেয় প্রেমিকা, হে আমার হৃদয়, কেন তুমি অসত্যোচ্চারণে দ্বিধা থরথর করো আমাকে। এখনও কিছু সময় আমাদের হাতে আছে, তাই আঁকড়ে থাকো আমাকে যতক্ষণ না শেবার রাণীর রাজ্য থেকে আসে তোমার ডাক।

আমরা পত্র বিনিময় করি। আমরা পাড়ি দিই তিরিশ সমুদ্র ও ষাটটি তীর, তারপরও ফুরোয় না আমাদের চলা।

হে আমার হৃদয়, হাওয়ার প্রেমে মাতোয়ারা যে অশ্ব কে তাকে বোকা বানাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ এই আলিঙ্গন সমাপ্ত করে আমরা প্রার্থনায় আনত হই পৃথিবীর কাছে ততক্ষণ থাকো কাছাকাছি।

থাকো কাছাকাছি যেন আমি বুঝতে পারি তুমি কি আসলে আমার হৃদয়, অথবা তুমি কি সেই স্বর যখন সে বলে ওঠে, *গ্রহণ করো আমাকে*।

চার.
হোটেলের একটি ঘর

শান্তি বর্ষিত হোক ভালোবাসার ওপর যখন উদয় হয় প্রেমের, ঘটে তার বিনাশ এবং প্রেমিক বদল হয় হোটেলে হোটেলে। এর ফলে কি হারাবার আছে কিছু? বাগানে বসে আমরা চুমুক দেব সান্ধ্যকফির পেয়ালায়। রাতে আমরা বলবো নির্বাসনের গল্প। এরপর আমরা যাবো হোটেলের ঘরে – নিবিড় প্রেমময় একটি রাত্রির সন্ধানে দুই আগন্তুক, আর তারপর, তারপর।

আমাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকবে খুচরো কিছু কথা, আমরা ভুলে যাব সিগারেটের প্যাকেট, যেন অন্যরা এসে এমনিভাবে কাটাতে পারে সন্ধ্যা, করতে পারে ধূমপান। আমরা বালিশের ওপর রেখে যাব আমাদের কিছু বেভুল ঘুম, যেন আসতে পারে অন্যরা, বিশ্রাম নিতে পারে আমাদের নিদ্রায়, আর তারপর, তারপর। কীভাবে আমরা এইসব হোটেলে যাপিত শরীরের ওপর অর্পণ করেছিলাম আস্থা? কীভাবে আমরা এইসব হোটেলে নিজস্ব গোপনীয়তা বিষয়ে নিরুদ্বেগ হয়েছিলাম? নিবিড় আঁধারে শরীর গেঁথে নেয় শরীর, যেন অন্যরা অব্যাহত রাখতে পারে আমাদের কান্না, আর তারপর, তারপর। যে-বিছানা ছিল সকলের জন্য, সার্বজনীন সেই শয্যায় শুয়েছিলাম কেবল আমরা দু'জন। আমরা বলেছিলাম সেইসব কথা যা কিছুক্ষণ আগে উচ্চারণ করে গেছে স্বল্পকালের যুগলেরা। বিদায়বেলা এগিয়ে আসে দ্রুতই। এই চটজলদি মিলন কি কেবল ভুলে যেতে অন্যদের যারা আমাদের ভালোবেসেছিল

অন্যসব হোটেলে? এসব অসংলগ্ন কথা কি তুমি আর কাউকে বলোনি? আরেক হোটেলে আরেক জনকে আমি কি আগে বলিনি এইসব কথা, অথবা বলিনি কি একই বিছানায় এমনিভাবে শায়িত? আমরা অনুসরণ করে যাব একই পদাঙ্ক, যেন আসতে পারে অন্যরা, অনুসরণ করতে পারে একই পায়ের ছাপ, আর তারপর, তারপর ।

আ ক ম ল হো সে ন নি পু

.....

গোলাঘর

উঠোনের এক পাশে পুরোনো শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাঘরটা অনেকদিন মেরামত করা হয়নি । পরিচর্যা না থাকায় ঘরের সবকটি খুঁটি কেমন ক্ষয়ে গেছে । দুএকটি খুঁটির গোড়া পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, খুঁটি এখন শূন্যের উপর ঝুলে আছে । শরফুদ্দিন গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে । খুঁটিগুলো যথেষ্ট পুরোনো ও কাঠের তৈরি । এখন যদি এগুলো বদলাতে হয়, তাহলে এতো কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে! থাকার ঘরের দরজা-জানালা লাগাতেই এখন কাঠ পাওয়া যায় না । সেখানে গোলাঘরে কাঠের খুঁটি লাগানোর চিন্তা করা, সেটা নিজের কাছে হাস্যকর মনে হয় শরফুদ্দিনের । হেলফেলায় ঝোঁপঝাড় বাঁধা বাঁশই এখন দশগাঁও ঘুরে এক বাড়িতে মিলে কি না! তবু খুঁটি বদলাতে হলে বাঁশের খুঁটিই লাগাতে হবে ।

শরফুদ্দিন মনে মনে হাসে । তার ভেতরটা কচলে তামাকপোড়া ঠোঁটে হাসি চিলিক দেয় । যদিও আশপাশে কেউ না থাকায় সেই হাসি আর কারো দেখার সুযোগ নেই । গোলাঘরের খুঁটি বদলানোর চিন্তাটাই এখন তার কাছে কেমন উদ্ভট লাগে । এই গোলাঘরের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা– সেটাই যেখানে এখন নিশ্চিত করতে পারছে না, সেখানে খুঁটি বদলানোর কথা তার মাথায় কি করে আসে! সে গোলাঘর থেকে মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে ।

আকাশে বেশ মেঘ জমেছে, ছাইমাখা মেঘের দল আকাশের তলে তলে জমাট হচ্ছে । শরফুদ্দিন ঠিক ধরতে পারে না, এখন কোন মাস– চৈত্র না বৈশাখ! আজকাল মাসের

হিসাবটাও ঠিক তার মাথায় চট করে আসে না। হয়তো প্রয়োজনও পড়ে না। কি দরকার মাস, তারিখ এসব মনে রেখে! আগে একটা সময় ছিল। ক্ষেতের ফসল বোনার জন্য সময়টা ঠিকটাক মত মনে রাখা লাগতো। এখনতো তার সেরকম টান নেই। কিন্তু গোলাঘরটা তার মাথা থেকে নামতে চায় না। যদি ঝড় ওঠে, তাহলে এবার আর ঘরটাকে খাড়া রাখা যাবে বলে মনে হয় না। পয়লা ঝাপটাতেই কাত হয়ে পড়তে পারে। কখনও কখনও তার যদিও মনে হয়, ঘরটা ঝড়ে বা বাতাসে পড়ে গেলেই বরং ভালো। এটা থেকেতো আর কোনো কাজে লাগছে না। আবার বাপ-দাদার আমলের এই গোলাঘর– এটাকে নিজে থেকে ভেঙে ফেলতেও মনটা কেমন ঝড়ে দুমড়ানো সুপুরি গাছের মত মোচড় দিয়ে ওঠে। মাথার ভেতর চিন চিন করে রক্তের কণা, নাকি রক্তের স্রোত! শরফুদ্দিন অনেকবার মনে করেছে, ঘরটা ভেঙে ফেলি।

কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। বাবার মৃত্যু যদিও খুব বেশিদিন হয়নি। তবে সেই কবে দাদার মৃত্যু হয়েছে, গোলাঘরটা ভেঙে ফেলার কথা মাথায় আসলেই সবার আগে দাদার মুখটা মনে পড়ে। মাথা ভরা কাশফুল যেন, এরকম পরিপাটি সাদা চুল। মুখভরা সাদা দাঁড়ি। চোখভরা মনে হয় মেঘের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসা চাঁদের ঢেলে দেওয়া থইথই জোছনার আলো। পুরো চেহারা জুড়ে কেমন তৃপ্তির শান্ত ছায়া। লোকটা ঘরের বারান্দায় গ্রামের আরও লোকজনের সাথে বসে বৃন্দাবনি হুঁকোর নলে মুখ লাগিয়ে ধোঁয়া টানতো, আর গড়গড় গড়গড় করে হুঁকোর আওয়াজ বের হতো। কেমন ভালো লাগার তামাকপোড়া ঘ্রাণ বারান্দায়, বারান্দা ছাড়িয়ে উঠোনে ছড়িয়ে পড়তো।

এরকম দৃশ্য শুধু দাদার আমলের জন্যই খাটে না, শরফুদ্দির বাবাও দাদার সেই রেওয়াজটা অনেকদিন ধরে রেখেছিল। সন্ধ্যা হলেই তাদের ঘরের বারান্দায় তার বাবার বয়সী, বাবার বয়সের চেয়ে ছোট বা বড় লোকজন এসে ভিড় করতো। নানারকম কথাবার্তায় তারা মশগুল থেকেছে। ঘরের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে বাটাভরা পানসুপারি এসেছে। চা-পান খেতে খেতে যখন রাত বেশ গভীর হয়ে ওঠতো, তখন আস্তে আস্তে আসর ভাঙতো। কখনও এরকম আসরে ছেদ পড়লে বাড়িটাকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো তার। এর একটা কারণ ছিল, শরফুদ্দিরা গ্রামের স্বচ্ছল গেরস্থ। অনেক জমিজমা তাদের। ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাতে যে ফসল হতো, এই ফসলেই ভরে ওঠতো তাদের এই গোলাঘরটি। সারা বছর এই ধান বিক্রি করে অনেক ভালোভাবেই তাদের সংসার চলেছে। তেমন কোনো অভাব অনটন ছিল না তাদের। আশপাশে অভাবের ছোঁয়া থাকলেও তারা কখনও টের পায়নি। গোলাভরা ধান আছে, এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় স্বস্তির ধন।

আজকাল খুব মনে পড়ে শরফুদ্দিনের। অগ্রহায়ণ মাসে যখন আমন ধান কাটা হত– সে কি হইচই বাড়ি জুড়ে। ডজন ডজন কামলা মুনিষ, নানা জায়গা থেকে আসতো– এরা হল্লা চিৎকার করে, গান গাইতে গাইতে ধান কাটতো, ধান মাড়াই দিতো, ধান

ঝাড়তো– এটাই ছিল তাদের কাছে বড় এক উৎসবের মতো। সারাটা বছর যেন তারা এই উৎসবের জন্য অপেক্ষা করে থাকতো। অগ্রহায়ন মাস আসার আগেই গোলাঘরটি সংস্কারের কাজ হতো– শরফুদ্দিনের দাদা, পরে তার বাবা গোলাঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতেন কোন খুঁটিটার গোড়া পচে গেছে বা দুর্বল হয়ে গেছে। সেটা বদলানো হতো, কাঠের খুঁটির সাথে দুএকটা বাঁশের খুঁটিও লাগানো হতো। শরফুদ্দিরা গোলাঘর পরিস্কার বা মেরামত হচ্ছে দেখলেই বুঝতে পারতো, সামনে ধান কাটার মৌসুম।

শরফুদ্দিনকে গোলাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে শরফুদ্দিনের বউ কুলসুম বেগমের বুকে কেমন ছেত করে খোঁচা লাগে। শরফুদ্দিনকেতো সে একেবারে লউয়েগোস্তে চিনে। একেবারে চাষাভূষা মানুষ। জমি, চাষ আর ফসল– এই ছকের বাইরে আর কোনো দুনিয়ার সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। এই নিয়ে সে কখনও ভাবেওনি। সে বছর কয়েক আগেও বলতো, 'গোলাভরা ধান থাকলে চাষার পোলার আর অতো চিন্তা কি! মাছ মাংশ নাই মিললো, নুন শাকতো আছে।'

সেই শরফুদ্দিন কতোদিন গোলায় আর ধান তুলতে পারেনি। গোলাঘরটা এখন খুলেও দেখে না। কুলসুম বেগম বলে, 'এখানে দাড়াইয়া কি করো। আসমানে মেঘ করছে। মনে অয় ঝড় ওঠবো। সইন্ধার আগে বাজার থাকি গিয়া আইঅওনা।'

শরফুদ্দিন এতোটা সময় অনেকটা ঘোরের মধ্যে ছিল– তার মাথার ভেতর ছিল গোলাঘর। কিছুতেই সেই গোলাঘরটাকে সে মাথার ভেতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। সেতো চাষার নাতি, চাষার পুত– সেওতো চাষা। কিন্তু সে তার নিজের জায়গা জমি কিছুই ধরে রাখতে পারলো না।

সে এরজন্য নিজেকে খুব একটা দায়ী করতেও পারে না। শরফুদ্দিনদেরতো অতো চাওয়া পাওয়ার কিছু নাই। তারা জমি চষে বীজ বুনবে, তাতে ফসল ফলবে– তাই খেয়ে দেয়ে শান্তিতে থাকবে। যখন গোলাভরা ধান থাকবে, তখন গ্রামে গ্রামে গাজীর গীত হবে, কোথাও যাত্রাপালা হবে। কখনও কখনও গানের আসর হবে। সবাই হেসেখেলে জীবনটাকে পার করে দিবে। এসময় তার বাবার অন্যরকম একটি চেহারা খুব মনে পড়ে। তাদের টঙ্গি ঘরে যাত্রার রিহার্সেল হতো। তার বাবাও একটা পার্ট দিতেন। একবার সে অনেক কান্নাকাটি করে সেই রিহার্সেলের ঘরে ঢুকতে পেরেছিল। সেদিন ছিল ফাইনাল রিহার্সেল। যাদের যাদের যাত্রার পার্ট ছিল, তারা সকলেই যার যার পোষাক পড়েছিলেন। শরফুদ্দিন মনে করতে পারে না, যাত্রার নামটি। তবে এটুকু তার মনে আছে, তার বাবা মাথায় পড়েছিলেন রাজার মত পাগড়ি। লম্বা চওড়া তার বাবাকে পাগড়ি, পাজামা আর শেরওয়ানি পরা অবস্থায়তো সে চিনতেই পারছিল না।

এরকম চিন্তার বাইরে কখনওই যেতে পারেনি শরফুদ্দিন। গ্রামের মাধ্যমিক স্কুল থেকে সে যা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, তাতে তার চলতে ফিরতেও কোনো সমস্যা হচ্ছিলো না। যেকারণে জমিজমা, চাষবাস, ফসল– এর বাইরে সে আর কিছু ভাবতে পারেনি, কিংবা এটুকুও বলা যায় তার ভাবার দরকার পড়েনি। বউ কুলসুম বেগম বেশ গলা

চড়িয়েই বলে, 'কি অইলো, আমি যে গলা ফাটাই কথা কইরাম। কানে যার না। শেষে মেঘতুফান আইলেতো আর যাইতায় পারতায় না।'

শরফুদ্দিন এবার গোলাঘরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বউয়ের মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ তার মনে হয়, কুলসুম বেগমের চেহারাটাও অনেকটা গোলাঘরের মত। সেখানে যেন কতকাল কোনো আদর পড়েনি, তেলপানির ছোঁয়া লাগেনি। মায়াবতী মুখটা জুড়ে চৈত্রের শুকনো পাতার খসখসে পোড়া মেঘ। মনটা ধক করে ওঠে, মাঠের খোলা বুকের মত হু হু বাতাস মাথার উপর দিয়ে, কানের কাছ থেকে উড়ে যায়। কুলসুম বেগমতো এরকম ছিল না– তার চোখের সামনে সেই লাজভরা চোখ, লাজরাঙা ত্বকের মুখটি ভেসে ওঠে।

তখনই তার মনে পড়ে, বাবা তখনও বেঁচে। বাবা ধান বেচে বাজারে যেতেন, আর এসে মায়ের সামনে বাজারের থলে রেখে বলতেন, 'আর মনে হয়না চাষাভূষা মানুষ বাঁচবো। ধান বেচি যে বাজার খাইবো, সেই দিন মনে হয় আর নাই।'

মা তার বাবার মুখের দিকে বোকা বোকা চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকতেন, যেন এরকম আজব কথা এর আগে তাকে আর কেউ শোনায়নি। বাবা বলতেই থাকতেন, 'এক মন ধান বেচি দেখো একটা ইলিশ মাছ কিনমু। সেই সাধ্য নাই। পেয়াজ, মরিচ, তেল, নুন সব জিনিসেরই দাম খালি বাড়ছে। আর বাড়ছে ধান চাষের খরচ। কুলিয়ে চলার কোনো পথ দেখিনা।'

শরফুদ্দিন তখন বড় হয়ে গেলেও, বাবা তখনও বেঁচে বলে সংসারের পুরো দায় তার ওপর বর্তায়নি। সে ক্ষেত সামাল দিতেই ব্যস্ত। সংসারের আশয় বিষয় নিয়ে বাবা কথা বললে সে জানতে পারতো, নতুন কি হচ্ছে। না হলে সে তো কাজ না থাকলে গা-গতরে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। তাতে কোনো সমস্যা হওয়ারও কথা না, এটাইতো চাষাভূষা মানুষের কাজ। কাম শেষতো, আনন্দ ফূর্তি করে সময় কাটাও। সে দেখে এসেছে, বাবা-দাদারা তাই করেছেন। আর সেতো শুধু একজন কৃষকের ছেলেই নয়, তাদের অনেক জমিজমা আছে বলে তাদের জোত জমিতে অনেক মুনিষ খাটে। তাদেরকে ঠিকটাক মত চালানোই তার কাজ। কিন্তু যেখানে তার বাবা-দাদা ধান বেচে জমি কিনেছেন, বাড়তি এটাওটা কিনেছেন।

একদিন শরফুদ্দিন দেখলো সেই বাবা কিনা শুধু ধান বেচে আর সংসার সামাল দিতে পারছেন না। মা অসুখে পড়লেন, তখন ধানের জায়গা বিক্রি করে মায়ের চিকিৎসা করাচ্ছেন। ছোট বোনের বিয়ে দিলেন, তারজন্য জায়গা বিক্রি করলেন। সেই যে জায়গা বিক্রি শুরু হলো, আর সেটা থামানো গেলো না। বাবা মারা গেলেন, একদিন মাও মারা গেলেন। শরফুদ্দিন যেন অথৈ সাগরে পড়ে। কোথায় এতদিন সে কামলা মুনিষ খাটিয়ে ধান চাষ করেছে। সেখানে নিজে জমিতে লাঙল ঠেলে, ধান কাটে, ধান

ঝাড়ে– সারাক্ষণ ধান চাষের সাথে জড়িয়ে থাকে। তবু সংসার সামাল দেওয়া সম্ভব হয় না তার।

তার মাঝেমাঝে মনে হয়, ছোট বেলায় যখন ছেলেরা দল বেঁধে মার্বেল খেলতো। তখন হাত থেকে কাঁচের তৈরি মার্বেল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তো। অনেকটা সেরকমই তার হাতের মুঠো থেকে পিছলে পিছলে বেরিয়ে যায় বাপ-দাদার জমিজমা। শুধু কৃষক হয়ে আর সময় চলে না, সংসার চলে না। ধান চাষের পেছনে যে খরচ, তা বিক্রি টিক্রি করে আর নগদ কিছু থাকে না। একসাথে বেশি টাকার দরকার হলেই তখন জমি বিক্রি করতে হয়েছে। কৃষকের হাত থেকে জমি ছুটতে থাকে। শরফুদ্দিন কিছুতেই আর জমি ধরে রাখতে পারে না। তার মনে হয় কোথাও সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। কৃষকের এখন কোমর ভাঙার পালা– সেই ভাঙা কোমর আর সোজা করে ওঠে দাঁড়ানো কঠিন। শরফুদ্দিন যখন তার কৃষক জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করে, তখন আশপাশের অনেক কৃষকের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠতে থাকে। যাদের মুখগুলোকে তার মনে হয় অচেনা, চৈত্রের ফাটা জমিনের মত রুক্ষসুক্ষ। যাদের চোখের সামনে এখন আর থোড় আসা যুবতী ধান গাছের দোল নেই, নাচ নেই।

সেরকম একটা সময়ে শরফুদ্দিনের হঠাৎ খেয়াল হয়, তাদের গোলাঘরটি খালি পড়ে আছে। কতদিন সেই গোলাঘরে ধান তুলে রাখা হয়নি। সেটা যে ইচ্ছা করে রাখেনি, বিষয়টা তা না। সে যে ধান পায়, তার অনেকটা ধারদেনা শোধ করতেই শেষ হয়ে যায়। বাকি ধান আর গোলাঘর পর্যন্ত নেওয়ার দরকার পড়েনা। ধানের মাচা বা টুকরিতে এখানে সেখানে রেখে দিলেই হয়। তা দিয়ে কোনোরকম পেট চলে। মাঝেমধ্যে ধানচাল বাকিতে কিনেও খেতে হয়। শরফুদ্দিন বুঝতে পারে না, এই একটা জীবনের ভেতর এত ওলটপালট কি করে হলো! যত দিন যায়, জীবনটা খালি কঠিন থেকে আরও কঠিন হয়। সে ঠিক যেন তার বাবার মতই কুলসুম বেগমকে বলে, 'নারে বউ, জমি চষা হালুয়া মাইনষের দিন মনে হয় আর নাই। জমি যদিও সকল মাইনষের খোরাক দেয়। কিন্তু হাল বাইয়া এখন আর হালুয়া বেটার পাছার কাপড় ঘুরবো না।'

কুলসুম বেগম কি বলবে, সেও অনেকটা তার শাশুড়ির মত চোখমুখ বড় করে শরফুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে থাকে। শরফুদ্দিন বলে, 'হালুয়া মাইনষের দেশ। কিন্তু হালুয়াই এই দেশে দেখছি এখন সব চাইতে বিপদে। অন্যরার এদিকওদিক সুযোগ থাকে। শুধু হালুয়াই আছে হুড়কির চিপাত। তার কোনো রক্ষা নাই। তারে নিয়া খালি লম্বা লম্বা কথাই অইবো। বাচবো কেমনে কেউ কয় না।'

কুলসুম বেগম কি বলবে, সেতো আর শরফুদ্দিন নয়। তার মাথায়তো আর এরকম ভাবনা আসেনা। সে যদিও কইলজা পুড়িয়ে সংসারটাকে সামলে সুমলে চলছে। তবু এর থেকে কোনো মুক্তি আছে কিনা, বা মুক্তির কোনো পথ আছে কিনা, সেটাতো আর সে বুঝে না। সে স্বামীর মুখে, সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে পারলেই খুশি। নিজে

কি খেলো, না খেলো– তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই তার। তার মাথার ভেতর থকথক করে পথ হারিয়ে ফেলা অন্ধকার।

যখন থেকে শরফুদ্দিনের কাছে গোলাঘর খালি পড়ে থাকার ঘটনাটা ধরা পড়ে– সেই সময়টা থেকে কেন জানি, খুব অসহায়, নিঃস্ব মনে হতে থাকে তাকে। মনে হয় কেউ যেন তার হৃৎপিন্ডটাকে খামচে ধরে আছে। তাতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসে। কেউ যেন তার বুকের হাড়গোর বেছে বেছে নিয়ে গেছে। বুকের ভেতর এখন আর কোনো সম্পদ জমা নেই। তার এই শূন্যতাটুকু সে না বউ, না অন্য কারো সাথে ভাগ করতে পারে না। সে একবার হলেও শূন্য গোলাঘরটার কাছে এসে দাঁড়ায়, আর তার অসহায়ত্বটাকে যেন সে যাচাই বাছাই করে।
তখন অবশ্য একটা ঘটনা ঘটে, যেই না গোলাঘরের কাছে আসে সে। তখনই তার নাকে এসে ধাক্কা লাগে তামাক পোড়ার গন্ধ। সে চমকে ওঠে– যেন আশপাশে তার দাদা, বা তার বাবা কোথাও বসে হুঁকো টানছেন। শরফুদ্দিন অনেকটা অভ্যাসবশেই যেন চারদিকে চোখ মেলে তাদের খোঁজে (যদিও গোলাঘরের পাশে এলেই সে তামাক পোড়া গন্ধ পায়, এটা হয়তো পুরোটা ঠিক না। সন্ধ্যার পরও সে উঠোনে যখন একা দাঁড়িয়ে থাকে, তখনও এরকম তামাক পোড়া গন্ধ এসে তার নাকে লাগে। শুধু গন্ধই না। তখনতো সে হুঁকো টানার গুড়গুড় শব্দও শুনতে পায়)। তামাক পোড়া গন্ধ পাওয়ার বিষয়টি সে একদিন কুলসুম বেগমকেও বলেছিল। কুলসুম বেগম সোজা সাপটা বলে দিয়েছে, 'ধুর, এখন কেউ তামাক খায়নি। সবাইতো বিড়ি টানে নাইলে সিগারেট টানে। এটা তোমার মনের ভুল।'

কুলসুম বেগম অনেকটা নীরবে গোলাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক গোলাঘর, না শরফুদ্দিনের কাছে– এটা ঠিক বোঝা যায় না। তবে তার খুব কষ্ট হয়। এই গোলাঘর থেকে সেওতো লোক লাগিয়ে ধান বের করেছে। এটা আর কতদিন আগের কথা। দেখতে দেখতে চোখের সামনে সব বদলে গেলো। কুলসুম বেগম শরফুদ্দিনকে বলে, 'এই যে হালুয়া সাহেব। আন্ধাইর যে অর খেয়াল আছেনি! কোনসময় বাজার করবায়!' শরফুদ্দিনের এতে কিছুটা ঘোর কাটে। সে কোনোদিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সে এখন সবজির জন্য বিচরায় যেতে পারে, বাজারে যেতে পারে– অন্য কোনোখানেও যেতে পারে। কুলসুম বেগম এ নিয়ে ভাবে না, গোলাঘরের সামনে থেকে মানুষটা সরে যাক, এটাই সে চেয়েছে। সে অনেকদিন লক্ষ্য করেছে, গোলাঘরের কাছে এলেই লোকটা কেমন যেন বিষাদমাখা কোনো ঘোরের মানুষ হয়ে যায়। তার চোখ কেমন জলশূন্য, আলোশূন্য হয়ে পড়ে।

সে রাতেই আকাশ তোলপাড় করে প্রচ ঝড় ওঠে। মৌসুমের প্রথম ঝড় বলেই কিনা শরফুদ্দিনের মনে হচ্ছিলো তাদের টিনের চাল ভেঙেচুরে উড়ে যাবে। বাইরে বাতাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ। সাথে মেঘের গর্জন, আঁধারচেরা বিজলির চমক। ঝমঝম বৃষ্টির ঝাপটানি। ঘর ভাঙার কথা মনে আসতেই আবার বুকটা ধ্বক করে ওঠে। বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সম্পদের অবশেষ বা শেষ চিহ্নগুলোর মধ্যে এই টিনের ঘরটিও একটি। এখন যদি সেই ঘরটি উড়ে যায়, শরফুদ্দিনের পক্ষে আর নতুন করে পাকা ও টিনের ঘর বানানো সম্ভব না। কিন্তু এরকম ঝড়ের কবলে কিইবা করার আছে তার। নিজেকে তখন পথের ধারে বসে থাকা হাত-পা বিহীন কোনো নিঃস্ব মানুষের মত মনে হয়। এতো অসহায় তাকে এর আগে আর মনে হয়নি। সময়ের চাকায় গড়িয়ে চলা শরফুদ্দিন বাঁকা কোমর সোজা করার কোনো আলামত না দেখেও এতোটা অসহায় বোধ করেনি। এইসময় নিজেকে কোনোভাবেই ঝড়ের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে না। একসময় খাটের উপর বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থেকে যেন সবকিছু ভেঙেচুরে যাওয়ার অপেক্ষা করে শরফুদ্দিন। এভাবে বসতে বসতে কখন যে সে বিছানায় ঢলে পড়ে, ঘুমিয়ে যায়– সেটা সে আর মনে করতে পারে না।

তার ঘুম ভাঙে কুলসুম বেগম, বাচ্চাকাচ্চাদের চেঁচামেচিতে। হঠাৎ ঘুমের ভেতর মনে হচ্ছিলো মেঘের বিকট আওয়াজ, যেন আকাশটাই এখন দুমড়ে মুচড়ে ঘরের চালের উপর পড়ছে। কিন্তু চোখ মেলার পর সে কিছুক্ষণ ঘোর বা একধরণের বিভ্রমের মধ্যে সময় কাটায়। ঘরের ভেতর সকালের রোদের আভাস, তাতে হালকা আলো ফুটছে। সে ধড়মরিয়ে খাটের উপর উঠে বসে– বাইরে অনেক লোকের কোলাহল।

সে কিছু আন্দাজ করতে না পেরে এক দৌড়ে ঘরের বাইরে ছুটে আসে। ঘুমছুটা চোখে উঠোনটাকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সে হঠাৎ করে অনুমান করতে পারে না কোথায় পরিবর্তনটা হয়েছে। সেরকম একটা মুহূর্তে উঠোনের উত্তর দিকটা তার চোখে খুব ফাঁকা লাগে। সে যেন মনে করতে পারে না, সেখানে এতদিন কি ছিল! আর তখনই সে বুঝতে পারে অনেক লোক সেখানে। উঠোনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে একটি ঘর। ঘুমের রেশটা তার চোখ থেকে পুরোপুরি মুছে যায়নি বলে, সে হুট করে মনে করতে পারে না এই ঘরটি এখানে কেন ছিল!

এসময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় কুলসুম বেগম।–'কতদিন কইলাম। ধান না থাউক। খুটিখাটি ঠিকটাক করো। ঘরটাতো চোখের সামনে খাড়া থাকতো।'

শরফুদ্দিনের বুঝতে আর কোনো সমস্যা হয় না– বাপদাদার আমলের তৈরি সেই গোলাঘরটি আর নেই। গোলাঘরটি শূন্য হতে হতে এখন নিজেই মাটির সাথে মিশে গেছে। #

জুলাই ২৬, ২০১০

ফা হ্ মি দা ম ঞ্জু ম জিদ

.....

শিশু ও টেলিভিশন

সময়ের এমন একটা স্টেশনে আমাদের গাড়ি এসে থেমেছে যেখানে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে চাইছেন সাম্প্রতিক পৃথিবীতে শিশুমঙ্গলের জন্য যা যা আবিষ্কৃত হচ্ছে তা যথার্থই কি শিশুর জীবনকে সুন্দরতর করছে, নাকি আর কিছু? শিশুকর্মীরা অলসতা করছেন না বলেই ধরা যাক। তবে এটা ঠিক যে নানান রকম অভিভাবক ও ব্যাবসায়ীদের মাঝখানে পড়ে শিশুদেরই বেশী খাবি খেতে হচ্ছে। এত আনন্দ এত হাসিগান- তবু সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের শিশু কিশোরদের এতো দুরবস্থা কেন তা খোঁজ করে দেখা প্রয়োজন। শৈশব পার হওয়া মাত্র কৈশর-এর কুয়াশায় কেমন ভাবে এগিয়ে চলেছে?

আধুনিক যুগে যতরকম উদ্দীপক (stimulus) একেবারে প্রাক প্রাথমিক বয়স থেকে শিশুর ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল টেলিভিশন । বিদেশী (USA, UK, Australia) পরিসংখ্যান এ শতকরা ৯৮% পরিবারে আজকাল একটা করে অন্তত T.V. set থাকেই। আমাদের দেশের (socioeconomic status) মত আয় অনুযায়ী সমাজে বিভিন্ন স্তরের বিভক্তি এত প্রকট নয়, তাই সেখানে এসব পরিসংখ্যান নেওয়া সহজও। সমাজের একটা বড় অংশের, অর্থাত শিশুদের, টেলিভিশনের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক তা যাচাই করা ও সমাজের উন্নয়ন ও অবক্ষয়ে টেলিভিশনের কি ভূমিকা তা আলোচনা করা আজ আমাদের কর্তব্য।

টেলিভিশনের সাথে শিশুর সম্পর্ক

শিশু পালনে আজকাল নানারকম মতভেদ দেখা যায়। যেহেতু সমাজের এক এক অর্থনৈতিক স্তরে পরিবারের নক্সা এক এক রকম, কোন একটি বিশেষ ফর্মূলা অনুসারে শিশুদের মানুষ করা সম্ভব না। তাই নানান আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের সুষ্ঠু ক্রমবিকাশ কেসন করে সম্ভ সেই জ্ঞানটা নতুন মা-বা ও শিক্ষকদের দেওয়া আমাদের কতর্ব্য। আমার বিশ্বাস সমাজের অবক্ষয়ের পিছনে রয়েছে এই অসুষ্ঠু বা ভুল

upbringing। সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে যে শিশু লালিত, সে বড় হয়ে একজন সুন্দর ব্যক্তিত্বের মানুষ হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে এই আমাদের আশা- তাই টেলিভিশন শিশু জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তা পর্যালোচনার দাবী রাখে।

অনেকে মনে করেন 'টেলিভিশন' যদিও একটা সামান্য ক্ষুদ্র ব্যাপার- তবু এর প্রভাব শিশুর জীবনে খুবই বিস্তারিত হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার দু'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ বিষয়ে বহু গবেষণা চালিয়ে এসেছেন। যাঁরা শিশু ও টেলিভিশন এই দুইয়ের সাথেই জড়িত যেমন, পিতামাতা, অন্যান্য অভিভাবক, শিক্ষক, সরকারি শিশু কর্মকর্তা, মিডিয়া বিশেষজ্ঞ, গবেষক, শিশুদের নিয়ে যারা পড়াশুনা করেন সেই সব ছাত্র ও ছাত্রী ও মানোবিজ্ঞান জগতের শিশুকর্মী তারা হয়তো এই অভিক্ষামালার ফলাফল সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হবেন। এই দুই গবেষক, বব হেজ (University of Western Sydney) যিনি শিশুদের ভাষাতত্বের উপর নানান বই লিখেছেন, ও ডোভিড ট্রিপ্ (University of Murduch, West Australia) শিক্ষা বিভাগের এক অন্যতম বিশেষ প্রফেসর, আপনাদের মনে জেগে ওঠা শিশু কল্যাণ সংক্রান্ত নানান প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে তাদের খুঁজে পাওয়া তত্বের মাধ্যমে। বিশেষত: শিশু দর্শকশ্রোতার সাথে টেলিভিশনের সম্পর্ক সম্বন্ধেই বেশী গবেষণা করা হয়েছে। দেখা হয়েছে যে সাধারণ শিশু কেমন ভাবে টেলিভিশনকে তার জীবনে স্থান দিয়েছে। তাঁরা বলেছেন উন্নতশীল দেশে শিশু লালনের মাঝে টেলিভিশনের যতটুকু ভূমিকা তা সম্বন্ধে অভিভাবক ও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ কাউকেউ অচেতন থাকলে শিশু কল্যানের অগ্রগতি সম্ভব না। শিশুরা স্বভাবগত ভাবেই TV র খুব শক্তিশালী ও সক্রীয় দর্শকশ্রোতা হয়ে থাকে। যখন তারা কোন অনুষ্ঠান দেখে তখন তা বেশ অর্থবোধক ও কৃষ্টি সুলভ দৃষ্টি ভঙ্গীতেই দেখে। যদিও সব অনুষ্ঠানের মানই শিশুর জন্য উপকারী নয় তবু অনুষ্ঠানের মান তারা নিজেরাই মূল্যায়ন করতে বেশ সক্ষম।

বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখাও ভালনা শিশুদের জন্য এতে শারিরীক ও মানসিক দুইরকম ক্ষতিই সংগঠিত হয়। বেশী TV দেখে যে সব শিশু, গবেষণা করে দেখা যায় যে

নীতিমূলক অনুষ্ঠান

অতিরিক্ত ..... বা নীতিমূলক অনুষ্ঠান যে সবসময় শিশুকে আকুষ্ট করবে তা নাও হতে পারে। অনুষ্ঠানটি শিক্ষনীয় হবে, অথচ শিশুর মনরঞ্জনও করবে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না, এই চেষ্টাই করতে হবে TV এর কর্তৃপক্ষকে।

অনেক সময় বিপরীত ফল হয় এসব অনুষ্ঠানের প্রভাবে। শিশু যদি বিশেষ কোন অনুষ্ঠান যথেষ্ট আকর্ষনীয় হচ্ছে না বলে বিরক্ত হয়ে টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়, তা ক্ষতিকর হয় যেহেতু ঐ বিষয়টা থেকেই শিশুরা সরে যায়। তাই শিশুদের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির দিকে পরিচালক প্রযোজকের একটু বেশী সতকর্তা অবলম্বন করতে

হবে। সাধারণ সামাজিক দৈনন্দিন পটভূমিকায় ফেলে অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য পেশ করলে তা শিশুদের কাছে স্বাভাবিক ভাবে বেশী গ্রহন যোগ্য হয়। শিশু দর্শকশ্রোতাদের উপর আরও একটু ভরসা ও বিশ্বাস এর প্রয়োজন। শিশু পছন্দ করে তেমন অনুষ্ঠান যা বিশ্বাসযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমান সাপেক্ষ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু নীতিবাক্য তাদের মনে ধরে না।

বেচারা টেলিভিশন

টেলিভিশনকে প্রায়শ: 'যতদোষ নন্দ গোষ' এ রকম অবস্থায় ফেলা হয়। একটি সংসারে মাদকদ্রব্য সেবন করে সঙ্গে সঙ্গে দোষ পড়ে ঐ বাক্সটুকুর । যেন বাবা মা দাদা দাদীর কোন দায়িত্বই নেই; dish না থাকলে যেন ফেরেশতা বনে যেত ছেলেটি। ১৬ বছরের মেয়ে প্রেমে পড়ে পাশের বাড়ীর ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার দোষটাও (scapegoat) এই TV এরই। তাই মাজে মাঝে মায়াও লাগে ঘরের কোনে এই নিরীহ যন্ত্রটির জন্য। আমাদের দেশে শিশুরা হয় মা বাবার সংসারের সাথে নইলে টেলির সাথে বসবাস করে। আয়া তার সঙ্গী হয়। এই জন্যেই প্রায়ই ফাঁকটা রয়ে যায়। অভিভাবকদের এইখানে একটা বড় পরিচালনার ভূমিকা আছে। সবকিছু সংসারের শৃঙ্খলা ও ছন্দময়তার সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে। শুধু একটা উদ্দিপকের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেই চলবে না।

Norway তে বরফের মধ্যেও অনুষ্ঠান করেছি নির্ঝঞ্ঝাটে। তারা কেউ আমার ভাষাও জানতো না তবু কত আর্কষনীয় অনুষ্ঠান দেখানো গেছে জনসাধারণকে।

শিশুদের অনুষ্ঠানে শিশুরা আনন্দ উপভোগ করছে এ দৃশ্য দেখতে শিশুরাই পছন্দ করে। B.B.C. তে তাই You & Me নামে এক্কেবারে ছোট্ট শিশুদের অনুষ্ঠানের জন্য যখন প্রথম দিই তখন তা আরও স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলাম। শতশত শিশু খুশী হয় শুনে যে আমি ঐ ধরণের অনুষ্ঠান করছি। গল্পবলার ও খেলাধুলার নানান মুহূর্তে শিশুদের মনমাতানো অনুষ্ঠান সেসব। U.S.A. তে Sesame Street নামে অত্যন্ত জনপ্রিয় শিশু অনুষ্ঠানটিতে কত যে গবেষক ও মনবিজ্ঞানী কাজ করে। অনুষ্ঠানটা এত ভাললাগে- জীবনের সঙ্গে এত সহজভাবে সংশ্লিষ্ট তাই। মোটকথা দূর্নীতি থাকলে সেখানে সার্থক শিশু অনুষ্ঠানের স্থান খুব অল্প।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এ বিষয়ে খুবই সতর্কতার সাথে নানান গবেষণা চালিয়ে গেছেন ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন (১৯৭৮)।

সৌভাগ্যবসত ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করারও সুযোগ আমার হয়েছিল London-এ (১৯৮৪)। আমি ব্যক্তিগত ভাবে শিশুঅনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট এ কথা জেনে খুশী হয়ে মিটিং এ ডেকেছিলেন। আমার উৎসাহ দেখে তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন তার একটি প্রকল্পে যা Professor Naiz এর সঙ্গে গবেষণা করেছেন। টেলিভিশনের সেক্স ও ভায়োলেন্স এর প্রভাব কতখানি শিশুর উপর পড়ে

তারই পরীক্ষা ছিল। এতে স্পষ্ট করে তারা বলেছেন যে কোন বিশেষ পারিপার্শ্বিকতা থাকা কালীন শিশু হিংস্র আচরণ করেছে বা অন্যের উপর নির্যাতন করেছে তা বলা মুশকীল (১৯৭৮). Prof. Eysenck এর বিশ্বাস একমাত্র TV স্ক্রিন' এ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দেখলেই শিশুরা নষ্ট হয় না- অন্যান্য নানান অনুকুল অবস্থার প্রয়োজন হয় যেমন- অন্যান্য অসৎ সঙ্গ, অতিরিক্ত মদ্যপান, মিথ্যাকথা বলা যার ছোট থেকে অভ্যাস বাড়ীর বিষাক্ত আবহাওয়া, সংসারের সদস্যদের মধ্যে মনোমালিন্য, ডিভোর্সড পরিবার বা যে সব পরিবারে চুরি ডাকাতি চলছে বা দুনির্তি মামুলি ব্যাপার। এই সব গবেষণা পক্ষপাত দৃষ্ট হলে চলবে না। একটি শিশু যদি সুন্দর পরিবেশে সুশিক্ষায় গড়ে ওঠে তবে শুধু টেলিভিশনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তার চরিত্রে কুপ্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেনা কোন মতেই। সুতরাং শুধু মিডিয়াতে ভায়োলেন্স নিয়ন্ত্রণ করেই একটি শিশুকে তার প্রভাব থেকে 'মুক্ত করা যাবে না - যদিও এ দিকে দৃষ্টি রাখা সমাজের সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের দায়ীত্ব। সরাসরি আলোচনায় Prof. ..... Hawsrth, Head, Psychology, Univercity of Nothingham বলেছেন franstration, বর্ণবৈষম্য বা Prejudead family তে মানুষ হওয়া শিশুরাই বেশী কুপ্রভাবের শিকার।

কতখানি মন্দ প্রভাব বিস্তার করে কিছু অন্যান্য সত্য। ক) শিশুর পারিস্পার্শিকতা খ) শিশুর প্রি গ্রোথ বা সঙ্গ ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঙ) অর্থ-সামাজিক অবস্থা চ) পরিবারের নক্সা ছ) শিশুর বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র/প্রবন্ধ

রবিউল হুসাইন

.....

বিশ্ব চলচ্চিত্রকর্মা সত্যজিৎ

বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বাঙালির অবদান কোনোদিন ছিলোন না। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় চলচ্চিত্র যেহেতু যন্ত্রকুশলতার দিক দিয়ে ও পরিবেশনার নতুন শিল্প আংগিক এবং জটিল ছিলো, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় প্রাচ্য বা ভারতীয় সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক জগতের সমকালীনতা বেশ পিছিয়ে ছিলো। সেই পরিবেশে চলচ্চিত্রের মতো এই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শিল্প-মাধ্যম খুব স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হতে পারে নি। আর এর বিকাশের আশা এক কথায় তখনকার দিনের পরিবেশে অসম্ভব ও অভাবিত ছিলো।

কিন্তু ১৯৫৫ সালে ৩৪ বছর বয়সী সত্যজিতের পথের পাঁচালি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললো। ১৯১৩ সালে রবি ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনার সংগে এই অম্ভব ঘনটার একমত্র তুলনা চলে যখন পথের পাঁচালি প্রানেসর কানে অনুষ্ঠিত নব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৫৬ সালে শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল হিসেবে বিশ্বনন্দিত হয়। দ্যাখা যায়, ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৬ এই ১১ বছরে ছবিটি ১২টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার বিভূষিত হয়েছিলো এবং বিশ্বচলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময় পরবর্তীকালের ইটালীর নব্য-বাসবতা রীতির এক গৌরবময় ও সোনালী অধ্যায়কে আরো সুষমামণ্ডিত করে তুলেছিলো যা বিশ্বচলচ্চিত্র শিল্পের এক অখণ্ড এবং অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিগনিত।

পথের পাঁচালি থেকে আগন্তক এই ২৮টি কাহিনীচিত্র ১৯৫৫ থেকে ১৯৯৯ মোট ৩৬ বছরের সোনালী ফসল। এর ভতরে ভেতরে ৫টি তথ্যচিত্র এবং ৩টি টেলিফিল্ম নির্মাণ করেছেন সত্যজিৎ। প্রতিটি ছবিতে তিনি তার বিস্ময়কর স্বকীয়তা, সৃষ্টিশীলতা ও শিল্প সুষমা এমন এক স্তরে নিয়ে গ্যাছেন যার জন্যে কুরোশিযোর মতো চিত্র পরিচালকও বলে গ্যাছেন যে সত্যজিতের ছবি না দেখলে মেঘ আর রৌদ্রের খেলা দ্যাখা যেতো না অথবা সত্যজিতের ছবিতে কোননা বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য নেই, সবই স্বয়ম্ভব।

আসলে সত্যজিতের চিন্তা ও কর্ম এবং সেই মতো পরিবেশনা এমন এক চড়া সুরে বাঁধা কার সম্পূর্নটা নিয়ন্ত্রিত স্তরে স্তরে গাঁথা এবং সাজানো। এই যে পরম্পরার দর্শনগত মানসিকতা তার অসাধারণ কল্পনাশক্তি, শ্রম, শৃংঙ্খলা ও কর্তব্যরোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত করে। এই কারনে অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্যের কোনো চিহ্নমাত্র নেই, প্রতিটিই নির্মেদ, নিরাবেগ, যথোপযুক্ত এবং যথার্থ। এই সব গুন সাধারনভাবে বাঙালি চরিত্রে বিরল। ইংরেজ আমল থেকেই বাঙালির অসম্মানজনক চরিত্র কথ্য কাহিনীতে একদা বলা হতো এবং এখনো হয়তো কেউ কেউ বলে থাকে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যে যে এরা অলস, ভীতু, শৃংঙ্খলাহীন, অসৎ মিথ্যুক, চতুর, মিথ্যুক কলহপ্রিয়, চাটুকারপ্রিয, হিংসুটে, পরশ্রীকাতর, পরস্ত্রীকাতর ইত্যাদি। কিন্তু সেই বাঙালিরাই তাদের নিজস্ব সৎচিন্তা ও মেধাবলে যুগে যুগে ক্ষনজন্মা পুরুষদেরকে জন্ম দিয়েছে এবং পরে ক্রমাগতভাবে প্রমাণিত করেছে পরিস্থিতির আনুকুল্যতায় এই মানুষেরা দীপ্ত ও দীপ্যমান হতে পারে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম কেননা মানুষের ধর্মই হচ্ছে অগ্রসরতা ও উন্নতিশীলতা। তাই জন্মেছে রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ, শেখ মুজিব এবং সেই ভীতু ও অলস বাঙালিরাই যুদ্ধ করে সুষ্টি করেছে এবং বাংলাদেশকে। এই প্রসংগটি সত্যজিতের

কর্মকুশলতার অসামান্য সৃষ্টিশীতলা ও শৃংখলাবোধ আলোচনা করলে এসে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কেননা সৃষ্টিশীলতার কাছে ইতহাসও বিপর্যস্ত হয়ে থাকে।

সত্যজিতের ছবিতে শিল্প নির্দেশনা, পরিচালনা ও নির্মাণতার শিল্পচরিত্রের শৃংখলাবোধ, অটুট আঁট সাঁট বাঁধুনী ও গাথুনী। একটি অনায়াস সহজ ভংগি, মনে হয় কিছুই না, আটপৌরে কিন্তু কঠিন সেই রীতি যেমন, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। জীবন থেকে উৎসারিত সেইসব শিল্প চেতনা ও বোধ, এর পেছনে আছে একটি অনুসন্ধিৎসু সংগ্রামী মানুষের চির বালকসুলভ জ্ঞান পি, ... এবং সেই মতো দীর্ঘ প্রস্তুতি। পারিবারিক ঐতিহ্য, সেইটিই পরবর্তীকালে জীবনের প্রতি দৃঢ়তা, একাগ্রতা, সংকল্পে অটল কর্মস্পৃহা এনে বহির্মুখী একটা সৃষ্টিশীল মন-মানসিকতা তৈরী করতে সাহায্য করেছে। তাই তার ছবিতে শিল্পি পরিচালনা, নির্দেশনা শুধুমাত্র বংশীচন্দ্র গুপ্ত বা অশোক শিল্প নির্দেশনা নয়, এই শিল্পক্ষমতা সামগ্রিক অর্থে বিশাল ব্যাপ্তি ও যোজনায় ছড়িয়ে গ্যাছে।

অর্থনীতিতে স্নাতক, পরবর্তীকালে মায়ের ইচ্ছেয় শান্তিনিকেতনে অসমাপ্ত বছর দুই-তিন শিক্ষানবিস সত্যজিতের বংশধারায় তৈরী শিল্পচৈতন্যকে আরো ক্ষুরধার করে তোলে। রবীন্দ্র আবহাওয়া, ব্রাহ্ম সমাজ, তার আগে ডিরোজিওর ইয়ং বেংগল আন্দোলনের ঢেউ, কোলকাতার কুখ্যাত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সবকিছুই সত্যজিৎকে নির্মান করতে সাহায্য করেছে। বলা যায়, তিনি বোধ হয় সেই বেংগল রেনেসাঁর লাষ্ট অব দি মহিকান্স্। পারিবারিক সূত্রে লেখাপড়া, ছবি আঁকা এবং সংগীত তিনটিই তিনি পেয়েছিলেন আবহাওয়া গুনে। এই সম্ভাবনাকে তীর্ষক-তীক্ষ্ণ করে তোলেন নন্দলাল এবং বিনোদ বিহারী, তার দুই গুরু এবং মাষ্টার মশাই তারা তাকে প্রকৃত শিল্পের দিক ও মন-মানসিকতায় করে তুললেন ভারতীয়, দেশীয়, নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি-সভ্যতার মুখোমুখি। তারা শিখিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিল্পধারার সংগে প্রাচ্য শিল্পধারা কোথায় পার্থক্য আর মিল হাতে-কলমে শিখাতে গিয়ে সত্যজিতের শিল্পীমনকে নন্দলাল ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য দিয়ে মুড়ে দিলেন। ছবি আঁকতে গিয়ে তার মাষ্টার মশাইরা বলেছিলেন যে, এ দেশের শিল্পীরীতি থেকে সত্যজিৎ যেন কোনোদিন বিচ্যুত না হন। পশ্চিমা রীতিতে ছবি আকাঁ শুরু হয় ওপর থেকে। আগে পাতা, ডাল, কাণ্ড তারপর মাটি। কিন্তু প্রাচ্যরীতিতে এর উল্টোটি। প্রকৃতির নিয়মে গাছ যে ভাবে বাড়ে তেমনি। প্রথমে মাটি, যেটি ভিত্তি, তারপর কাণ্ড, ডাল-পালা, তারপর পাতা-ফুল। আরো বলেছেন, সেচের যে লাইন আকাঁ হয় কাগজে, ধরা থাক একটা গোরুর বা প্রাণীর, লাইনটা এমনভাবে দিতে হবে যাতে অনুভব করা যায় যে সেই লাইন শুধুমাত্র পেন্সিলের সাধারন আঁচড় নয়। তার নিচে আছে রক্ত, মাংস, ধমনী। এই যে পর্যবেক্ষন ক্ষমতা এবং সর্বোপরি নিজের দেশ, পরিমণ্ডল, কৃষ্টি-সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিত সেটিকে সত্যিকার অর্থে সার্তকভাবে ..... করতে হিখিয়ে ছিলেন তার মাষ্টার মশাইয়েরা। এই কতা সত্যজিৎ অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে গ্যাছেন এবং

তিনি বলেছেন যে, এখনো তার ইচ্ছে হয় মাষ্টার মশাইদের পায়ের নীচে পড়ে থাকতে।

যুবক বয়সের প্রস্তুতি পর্বে সত্যজিতের এই শিক্ষাই প্রকৃত অর্থে তার প্রতিটি ছবিতে প্রতিফলিত। তিনি সব সময় নিজের দেশ, সমাজ ও পরিমণ্ডলের ভেতরে থেকে কাজ করে গ্যাছেন এবং তার শিল্পীন তথা ছবির শিল্প পরিচালনা বা নির্দেশনা দেশীয় ঐতিহ্য জারিত হয়ে ..... পরিবেশিত হয়েছে আর তা বৈশ্বিক শিল্পপরিবেশের এক গৌরবময় অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যপঞ্জিতে দ্যাখা যায়, সত্যজিতের আজীবন ..... ও শিল্পী বংশীচন্দ্রগুপ্ত ২৮টি কাহিনী চিত্রের মধ্যে ২০টির শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন। বাকী ৮টায় ছিলেন অশোক বসু। তেম্নি ৫টি তথ্যচিত্রের মধ্যে ১টি বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং ১টি অশোক বসু, ও ৩টি টেলিফিল্মর মধ্যে ১টি বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং ২টি অশোক বসু।

সত্যজিৎ বলেছেন, কোনোরকম গালভরা প্রচারমূলক বক্তব্য পেশ না করে আমার ছবিতে আমি আমার গল্পটাকেই উপস্তিত করতে চাই। প্রথম এবং অন্যতম কথাই হলো তাকে একটা গল্প হ'তে হবে। আমি কাহিনী বা প্লটে বিশ্বাস করি। কারণ, গল্প বলার ভারতের একটা ঐতিহ্য আছে।

সত্যজিতের জই মূলভাবনার সম্প্রসারিত রূপ তার ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য, কথোপকথন, শিল্প নির্দেশনা, অভিনয়, সংগীত প্রতিটি বিষয়ে প্রতিফলিত। এই জন্যে তার লাল খেরো খাতায় প্রতিটি দৃশ্যের খুটি নাটি সাবলীল ক্ষতার ছবি এঁকে একের পর এক ফিল্ম স্কেচে ভরিয়ে ভুলতেন। কী করবেন তার সম্পূর্ন ভাবনাটা তিনি ছবির মাধ্যমে সাজিয়ে তুলতেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে তিনি সেটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে সেলুলরেডে রুপ দিতেন। আসলে এইভাবে তিনি তার সহকর্মী এবং শিল্প-নির্দেশককে তার কল্পনার অনুসংগী করে তুলতেন। এবং তারা সেগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করতেন। এই বাস্তবায়িত রুপ আমরা তার প্রতিটি ছবিতে অসামান্য রুপে দেখি। পথের পাঁচালিতে ঝড়ে রাতে কুপিজ্বলা, শতছিন্ন বাতাস-কাঁপা পর্দা কিংবা বা ঝড়ের পরে হরিহর যখন ফিরে এলো গ্রামে, সেই সময়কার পড়ে থাকা টুকিটাকি উঠোনময় জিনিষ পত্তর, গাছের ভাংগা ডাল, ঝরা পাতা কিংবা ইন্দির ঠাকরুনের ছিন্ন পাটি নিয়ে ফিরে আসা এবং সর্বোপরি অপুরা গোরুর গরুর গাড়িতে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পর ঘরের মেঝের ফাটল বেয়ে জকটি বাস্তসাপের চকিতে চলে যাওয়া সবকিছু এতো নিখুঁত বাস্তব ও স্বাভাবিক যে এই ধারার পরম্পরা তার প্রতিটি ছবিতে দৃশ্যমান এবং নেত্রগ্রাহ্য এক অনুপম সৌন্দর্যের জন্ম দিয়েছে। মহানগরে নিম্নবিত্ত এক শহুরে পরিবারের ঘরের দৃশ্য, দেয়ালের আস্তর খসানো লগ্ন বাস্তবতা সত্যজিতের কল্পনাপ্রসূত হলেও এর অসামান্য রুপ দিয়েছিলেন বংশীদাশ গুপ্ত। এক বিদেশী দেখে ভেবেছিলেন যে প্রতিটি দেয়ালের নিচে বুঝি চাকা লাগানো যাতে ক্যামেরা চালানোর সময় দেয়ালগুলো সরানো যাবে যেম্নি করে ষ্টুডিওতে অষ্যরা করে থাকে, কিন্তু আসলে তা

স্থায়ী যা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভাবে যে এতোটুকু পরিসরে সত্যজিৎ কীভাবে ক্যামেরার কাজ করছেন। এরকম বহু উদাহরণে ভরপুর সত্যজিতের এই ভাবে ছবিগুলো। চারুলতা ছতিে যে ঘরটি ছিলো, সেটির স্কেচে দ্যাখা যায় ছবির পাশ দিয়ে লেখা আছে কী কী আসবাবপত্র দিয়ে ঘরটি সাজানো হবে তার অনুপুংখ বিবরণ ও তালিকা। তেম্নি দ্যাখা যায় অপুর সংসার ছবিতে অপুর ঘরের স্কেচে চৌকি, আলনা, বইয়ের র‍্যাক কত কী খুঁটি-নাটি জিনিষপত্তর যা নতুন একটি সংসার পাতায় জন্যে কাজে লাগবে। আসলে ন্যাচারালসেন বা প্রাকৃতিকতাকে রিয়েলিষ্টিক বা বাস্তবসম্মত করে তোলাই শিল্পীর ক্ষমতা নির্দেশ করে। সত্যজিতের সেই অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। আপাত খুঁতখুঁতে স্বভাবের যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ইস্পিত ফল পাওয়ার জন্যে, সত্যজিৎ তাই সব ব্যাপারে ছিলেন আপোষহীন এবং অতৃপ্ত। এসবই ছিলো একজন খাঁটি শিল্পীর গুন বৈশিষ্ট্য। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, গড ইজ ইন ডিটেইল্স্ অর্থাৎ খুঁটিনাটি অনুপুংখতার ভেতরে ঈশ্বর বা করেন। সত্যজিৎ সারাটি জীবন ধরে সেই সুন্দর ও সৎ ঈশ্বরকেই খুঁজে গ্যাছেন। শাখা-প্রশাখা ছবিতে একটি কথা আছে যে, যে বস্তটি যতো সহজ-সরল তার ভেতর দিয়ে ততোই মহৎ কিছু বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশী ও প্রবল। শিল্পী সত্যজিৎ যিনি আপাদমস্তক একজন পরিপূর্ন শিল্পী ছিলনে, তার শিল্পী জীবনের আপ্তবাক্যই যেন ছিলো এটি।

শিল্প নির্দেশনা শুধুমাত্র কেনো দৃশ্যের সেট বসানো বুঝায় না, সামগ্রিক অর্থে অভিনয়, দৃশ্যকল্প, ছবির ফ্লেমিং, কম্পোজিশন বা গঠনরীতি, যথার্থ সংগীত, শব্দ, ক্যামেরার ফেড-ইন, ফেড-আউট, জাম্পকাট, মন্তাজ, ... দৃশ্য, নিকটের বড়ো দৃশ্য সব বুঝায়। একটা প্রধান বৈশিষ্ট্যতার ছবিতে স্পষ্ট, সেটা হচ্ছে তথাকথিত আধুনিকতার নামে মন্তাজ, জুম, স্লো বা জা,স্পকাট দৃশ্য একেবারে নেই বললেই চলে। তিনি এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি বাংগালি জীবন বা কাহিনীর রুপায়ন করেন, সেই জীবন বা ছবিতে এই রকম দৃশ্য অপ্রয়োজনীয়। গল্প বা কাহিনীর কাছে সৎ থাকার জন্যে ওই সব গিমিক্সকে তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন সচেতন ভাবে। যা জীবনের জন্যে স্বাভাবিক ও সাবলীল এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতায় ..... তাই তিনি অনুসরণ করেছেন। তার ছবিতে চরিত্রানুযায়ী শিল্পী খোঁজা ও সংগ্রহ করাও উঁচু দরের শিল্প- নির্দেশনা প্রমান করে। তা না হলে বেশ্যাপল্লী থেকে কীভাবে এবং কেমন করে অশীতিপর এক ..... চুনীবালার মতো মহতী এক শিল্পীকে খুঁজে বের করেন কিংবা কীভাবে খুঁজে পান প্রয়াত প্রমোদ গাংগুলীকে?

ছবির ফ্লেমিং এবং কম্পোজিশনে সত্যজিৎ তার শিল্পীমন তার শিল্পীমন দিয়ে

বিশ্ব চরচ্চিত্রের মহৎ সৃষ্টি উদাহরণ দিয়েছেন যা কালজয়ী এবং ধ্রুপদী মাত্রার। পথের পাঁচালিতে ইন্দির ঠাকরুনের বহুল আলোচিত মৃত্যদৃশ্য। মৃতার হাকরা মুখে মাছি, দূর্গার ভয়-মিশ্রিত অবাক-করা চাউনী, পায়ে লেগে ঘটির গড়িয়ে যাওয়া দূর্গার মৃত্যুর পর অপুর পুঁতি খুঁজে পাওয়া, পরে পানা-পুকুরে ছুঁড়ে দিয়ে পানির কেন্দ্রানুগ

আবর্ত সৃষ্টি ও খুঁজে-যাওয়া মহানগরে ..... লাঠিটি শব্দ করতে করতে সিঁড়িতে গড়িয়ে যাওয়া, জল্লসাঘরে বিশ্বম্ভর বাবুর মদের গ্লাসে মাছি পড়া, চারুলতার চারুর জানালার খড়খড়ি তুলে নিজের অবরুদ্ধদ জীবনের বিপরীতে বাইরের রৌদ্রলোকিত কাটা কাটা দৃশ্য কিংবা দোলনায় দুলে ওঠার সংগে ক্যামেরা সমেত যাবতীয় দৃশ্যের দুলে দুলে ওঠা, অপুর সংসারে বউয়ের টাংঙা গাড়িতে ছেঁড়া পর্দার ভিতর দিয়ে কোলকাতা শহর অবাক চোখে দ্যাখা অথবা সকাল বেলার কুয়াশার ভিতর চলন্ত রেলগাড়ির তলায় এক ..... কাটা পড়া ও তার করুন মরণ চীৎকার, কিংবা শাখা-প্রশাখায় বৃদ্বদ পিতা অমর নাথের সংগে মানবিক রোগী পুত্র প্রশান্তের মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সিসটাইন চ্যাপেলের সেই বিখ্যাত ঈশ্বর ও আদমের হাত স্পর্শ করার অনুরুপে দুজনের চারটি হাত মেলানো-সব এখন বিশ্ব চলচ্চিত্রের ধ্রুপদী দৃশ্য। এসব দৃশ্য শিল্প নির্দেশনার চরম চূঁড়াতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং এসব দৃশ্য বার বার দেখেও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। যে সত্যজিৎ লাইকা বাকা-ক্যামেরা থেকে অরিফ্ল্যাকন ক্যামেরা চালিয়ে সার্থকতার চরম বিন্দুতে পৌঁছেছিলেন তার সীমাবদ্ধ যন্ত্রকৌশল চলচ্চিত্র সামগ্রীর অভাব কখনো পেছনে থাকতে দ্যায়নি শুধুমাত্র তার চরম নিষ্ঠা ও শৃংখলাবোধের জন্যে। বিদেশীরা বার বার অবাক হয়েছে এই ভেবে যে ওইসব মান্ধতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি একের পর এক কীভাবে অপূর্ব ও অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র নির্মান করে গ্যাছেন। হীরক রাজার দেশের সূচিং এর জন্যে পরিচালক, নায়ক-নায়িকাদের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত সারি সারি তাঁবু খাটানো হয়েছিলো। তারা তো দেখে অবাক সেই গরমে কীভাবে সত্যজিতের মতো পরিচালক গরীবানা হালে সুটিং করছেন।

সত্যজিৎ বলেছেন, আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করার জন্যে মা ভোর থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতেন। আমার মায়ের গুনের শেষ নেই। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো ঘন্টা কাজ করার আদর্শ আমি মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। আসলে তিনি তার মায়ের আদর্শে দীক্ষা নিয়ে এই রকম কঠোর পরিশ্রমী এবং নিজের কাজে সৎ হতে পেয়েছিলেন। তাই দ্যাখা যায় যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, তাতে সোনা ফলিয়েছেন।

ভয়েটল্যাণ্ডরে ক্যামেরায় স্থিরচিত্র তুলে বিলেতের এক কাগজের প্রথম প্ররস্কার পান। আন্তর্জাতিক প্রচ্ছদ প্রদর্শনীতে সুধীন্দ্র নাথ দত্তের সংবর্ত বইয়ের পচ্ছ দচিত্রের জন্যে সোনার মেডেল পান। রেজ লেটার অর্থাৎ রায়ের অক্ষর নামে তার নিজস্বরীতির ইংরেজী অক্ষরমালা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ও প্রবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে তিন বছরের শান্তি নিকেতনের লেখাপড়া বন্ধকরে ডি জে কীমার নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থায় ভিসুয়ালাইজার হিসেবে চাকরী নেন। এরপর সিগনেট পেসের ডিকে গুপ্তের সংগে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন বইয়ের মলাট আঁকা শুরু করেন। এবং এই মলাট শিল্পের চেহারা তার সৃজনীশক্তির জাদুস্পর্শে তখন সম্পূর্ন বদলিয়ে যায়।

বিভূতিভূষনের পথের পাঁচালির ছোটদের সংস্করণ আম আটি ভেঁপু বইটির অলকরন করেন, তখনই তার পথের পাঁচালি ছবি করার ইচ্ছে মনে জাগে। পরে হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশীবন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাশ গুপ্তের সংগে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গঠন করে। এসময় জাঁ রেনোয়া আসেন দ্য রিভার ছবির জন্যে। খবু কাছ থেকে সেই ছবির নির্মানরীতি দ্যাখেন। ইতিমধ্যে ডিজে কীমারের আর্ট ভিরেকটর হিসেবে পদোন্নতি হয় এবং প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন। লণ্ডনে প্রায় ১০০টি ধ্রুপদী ছবি দ্যাখেন খবু সীমিত সময়ে। এই ভাবে তার চলচ্চিত্রের প্রস্তুতি গ্রহন। প্রথমে ইচ্ছে ছিলো হরিসাধনদের সংগে ঘরে-বাইরে, ছবি করার কিন্তু তা না হয়ে পথের পাঁচালি এবং তারপরেই ইতিহাস সৃষ্টি। তিনি চলচ্চিত্রের কারুকৌশলেও সীমিত যন্ত্রপাতি নিয়ে সৃজনী শক্তির ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। গুগাবাবা অর্থাৎ গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে ভূতের কন্দেঠর জন্রে টেপ দ্রুত চালিয়ে যে তাড়াহুড়াপূর্ন শব্দ সৃষ্টি হয় সেই ধারার প্রথম প্রবর্তন করেন। চারটি ভূতের নৃত্যদৃশ্য চারটি স্তরে-প্রথমে সোজা, তারপর উল্টো এই ভাবে করে নিয়ে, যেহেতু ক্যামেরা অতো উচুঁতে নিয়ে বিশাল করে দেখাবার উপায় ছিলোনা, তাইএই অভিনবত্ব সৃষ্টি করেন। শতরঞ্জ কী খেলাড়ি ছবিতে একই সময়ে ইংরেজী ও হিন্দি কথা জুড়ে আর একটি অভিনবত্ব আনেন ডাবিং এর ক্ষেত্রে যা গিনিজ বুক অব ওয়ার্ল্ডের সিনেমাটোগ্রাফিতে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সত্যজিৎ সংগীতে চিরকাল নিমজ্জিত ছিলেন, বিশেষ করে পাশ্চাত্য সংগীতে। রবিশঙ্কর, বেলায়েত খার পাশাপাশি ....., মোর্জাট, বেথোভেনের দারুন ভক্ত ছিলেন, বিশেষ করে মোজার্টের। তার অনেক ছবির আবহ সংগীতে এদের সংগীত কর্মকে ব্যবহার করেছেন। ভালো পিয়ানো বাবজাতেন, নিজের প্রায় ছবিতে এবং অন্যের পরিচালনায় ছবিতেও সংগীত পরিচালনা করেছেন, নিজের সুকণ্ঠের ধারাভাষ্য দিয়েছেন এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। শাখা-প্রশাখায় বাখের সংগীত সম্বন্ধে কথোপকথন আছে। সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, ..., বিভূতিভূষণ ছাড়া পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের কাফকা, টমাস মান, টলষ্টয়, ..., লেখা পদন্দ করতেন। নিজে ৪০ বছর বয়সে সাহিত্য রচনা শুরু করেন। বিশেষ করে শিশু সাহিত্য ও বিজ্ঞান কল্পকাহিনীতে। এবং সর্বকালের একজন সেরা বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর গল্পকার হিসেবে আশ্চর্যরকম সফলতা লাভ করেন। প্রায় ৩৮টি বই লিখেছেন। এবং ..... আসিমভ সম্পাদিত পৃলিবীর একশটি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কল্প-কাহীনি সমগ্রে তার গল্প স্থান পেয়েছে। দি এ্যালিয়েন নামে ভিন্ন গৃহ থেকে আসা একটি জীবসম্বন্ধে ছবি করতে চেয়েছিলেন, তার প্রতিকৃতি ও চিত্রনাট্য ও শেষ করেছিলেন। শোনা যায় এই কাহিনী কিভাবে যেন বিদেশে পাচার হয়ে যায় এবং .....বিখ্যাত ইটির সংগে দি এ্যালিয়েনের বিস্ময়কর মিল দ্যাখা যায়। এসমৃন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ প্রসংগে সব সময় এড়িয়ে গ্যাছেন।

জীবনে সত্যজিৎ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তথ্যপঞ্জীতে দ্যাখা যায়, চলচ্চিত্রের জন্যে দেশী-বিদেশী মোট ৭০টি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৯১, কান থেকে লস এ্যাঞ্জেলস এর অস্কার মোট ৩৫ বছর ব্যাপী মৃত্যুপূর্বকাল পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পর পেলেন তারুসরকার কর্তৃক আগন্তকের জন্যে। আরো ভবিষ্যতে বতৌ যে পাবেন কে জানে। এতোসব কৃতিত্ব সত্বেও এমন একটি সৃষ্টিশীল ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ন সম্মান রেখে কিছু সমালোচনাও করা যায়। আশা করি পাঠকেরা ভেবে দেখছেন। যেমন,

(.) তার কৃতিত্ব আরো পরিপূর্নতায় ভরে উঠতো যদি তার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর কাহিনী বেয়ারীম্যান, বুনুয়েল বা ফেলিনির মতো নিজেদের রচনা হতো। মহৎ সাহিত্যের চলচ্চিত্র রুপায়ন বোধ হয় কিছুটা পরিমান অনায়াসলব্ধ যেহেতু মূল শিল্পগুন তাতে বিদ্যমান থাকেই, সেই আলোকে কথাটির সূত্রপাত করে বলা যেতে পারে। তাছাড়া মূল কাহিনী নিজের রচনা হলে সমস্ত কিছুই নিজের সৃষ্টি এই রকম কৃতিত্বের দাবীদার সম্পূর্ন হয়।

(.) দ্যাখা যায় তিনি তার প্রথম জীবনের মন-মানসিকতায় ও চলনে-বলনে পাশ্চাত্যধারার ভক্ত ছিলেন। ভারতের বিশাল সংগীত ঐতিহ্য থাকা সত্বেও পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। পরে অবশ্য শান্তি নিকেতনে গিয়ে তাঁর মননে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যাইহোক অনেকে মনে করেন, ছবির পরিচালনায় তিনি যেমন অনন্য, সংগীত পরিচালনায় সেরুপ সমমানের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি যেহেতু সেটি তার অধীনস্থ বিষয় ছিলোনা। ছবি নির্মানে সবকিছুর দায়িত্ব এককভাবে না নিয়ে অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ওপর ছেড়ে দিলে হয়তো ফল আরো পরিপূর্ন ও বিশুদ্ধ হতো।

(.) তার জীবদ্দশায় যখন তিনি পরিপূর্ন সৃষ্টিশীল এক আন্তর্জাতিক মাপের ব্যক্তিত্ব, তখন বাংলাদেশের এতোবড় একটা স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘটলো। এদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে ছিলো তার পূর্বপুরুষের আবাসস্থল। এসব ছাড়াও একজন বাঙালি এবং সর্বোপরি তার মতো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজনশীল চিত্রস্রষ্টা হয়ে বাঙালি ইতিহাসের এতোবড় ঘটনা সম্বন্ধে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র নির্ভর শিল্পসৃষ্টির কারনেও তার দিক থেকে কোনো ছবি তৈরীর উদ্যোগ গ্রহন বা আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি, এটা খুব আশ্চর্যজনক। তার মতো স্রষ্টা এই বিরল স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিষয়ে কাহিনী চিত্র নির্মান হতো দূরের কথা একটি তথ্যচিত্র ও নির্মান করেননি। এ ব্যাপারে অবশ্যতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে তার এ বিষয়ে যেহেতু কোনো অভিজ্ঞতা নেই তাই এই সবে তিনি আগ্রহীনন। তবুও কথা থেকে যায়।

(.) তার ছবি নির্মান ধ্রুপদী রীতির। তিনি আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় তাই অতো সময় দেননি। ফলে ছবিগুলো বেশ ধীর লয়ের নতুন আধুনিক চিত্ররীতি সৃষ্টির বদলে তিনি প্রচলিত রীতি অনুসরণ করে সেগুলোকে আরা ক্ষুরধার করে ব্যবহার করছেন।

(.) সারাজীবন প্রায় নতুন শিল্পীদের নিয়ে তিনি কাজ করেছেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি অসাধারন সব ছবি তৈরী করেছেন। কিন্তু ছবির তুলনায় অভিনয়ের দিক দিয়ে তিনি তার ছবির সাহায্যে অন্যান্য দেশের বড় পরিচালকের ছবির কিছু শিল্পীদের মতো বড় মাপের শিল্পী তেমনভাবে আমাদেরকে উপহার দিতে পারেন নি। হয়তো বা উন্নয়শীল দেশের শিল্পী বলেই আন্তর্জাতিকভাবে তারা অনুরুপভাবে স্বীকৃত হননি।

(.) তিনি শিল্পীদের সম্বন্ধে শেষজীবন বলেছেন যে, নতুন শিল্পী নিয়ে কাজ করা মানে সময়ের অপচয় করা। তিনি তাই শুধুমাত্র পুরনো অভিজ্ঞতাপূর্ন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। নতুনদের তুলনায় তারা তাড়াতাড়ি কাজ বোঝে এবং সেইমতো সাড়া দ্যায়। এই কথাগুলো তার আগের বলা কথার সংগে মেলে না, তাই স্ববিরোধী।

(.) অস্কার পুরস্কার পাওয়ার পর তিনি বলেছেন যে, এটি হলো চলচ্চিত্রের নোবেল পুরস্কার, এরপর আর কিছু পাওয়ার নেই। তার মতো দেশী-বিদেশী অসংখ্য পুরস্কার পাওয়া ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অসাধারন একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মুখে কথাগুলো যেন মানায় না। তিনি এসবের উর্ধে যেতে পারতেন অনায়াসে। হয়তোবা রোগাক্রান্ত বৃদ্ধ বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তার এই উক্তি ছিল আবেগাক্রান্ত।

(.) শেষের দিকে তার ছবির মান আগের ছবির তুলনায় ততো উৎকৃষ্টতর মানের হিসেবে পরিগনিত বা প্রমাণিত। বিশেষ করে সমালোচকদের চোখে। এরকম বিরুপ সমালোচনা হলেই তিনি ভীষনভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতেন।

এমন একটি মহৎ শিল্পীর এই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকে বিব্রত হতেন, যেহেতু তার মতো শিল্পী এসব ক্ষুদ্রতার অনেক উর্ধে থাকবেন এই আশাই তারা করতেন।

আসলে একটি মানুষ যখন চতুর্দিক থেকে অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠেন তখন আমাদের দেশের সাধারনেরা তার ভেতর কোনোরকম ক্ষুদ্রতা, ... বা দুর্বলতা ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না, পরিবর্তে তারা তাকে একজন দেবতার মতো নিষ্কলুশ একটি মানুষ হিসেবে দেখতে চান এবং একারনেই এই সব সমালোচনার জন্ম ও উৎপত্তি। কিন্তু হাজার হলেও মানুষ তো মানুষই, অন্য কিছু নয়।

যাইহোক, এতোসব সমালোচনা ..... সত্যজিতের ছবিতে শিল্পরুপ সামগ্রিক অর্থে এদেশের মানুষের জীবনের প্রতিরুপ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ-ভালোবাসা-বোধানুভব দেশপ্রেমকে তিনি নিপুন শৈল্য চিকিৎসকের মতো কেটেছেটে দেখিয়েছেন্ তার ক্যামেরা নামক ক্ষুর ধার দৃশ্য-অস্ত্র দিয়ে। যতই দিন যাবে ছবিগুলো ততোই আমাদেরকে আরো গভীরভাবে নিজেদের স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব বুঝাতে সাহায্য করবে। এগুলো আমাদের জন্যে চিরদিনের শিল্প-উৎসহ হয়ে থাকে।

কিশোরগঞ্জের মসুয়াগ্রাম, তার পৈত্রিক আদি নিবাস ছিলো, তারপর বিশপ ..... রোডের বাসা, তেম্নি পথের পাঁচালির নিশ্চিন্দ-পুরের পটভূমি দক্ষিন চব্বিশ

পরগনার গাড়িয়ার কাছে বোড়াল নামক গ্রামও ঠিক অর্থে তার আদি নিবাস যেখানে থেকে তার শিল্পী জীবনের সৃষ্টি বা শুরু। তারপর ফুলে ফলে ভরে আনত সেই বিরল জাতের ব্যক্তি-বৃক্ষটি আমাদের চলচ্চিত্রের প্রেরনা হয়ে রইবে। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ চলচ্চিত্র শিল্পের শূন্যস্থান পূরনের যে ঐশীবানী দিয়েছিলেন এই চলচ্চিত্র শিল্পের এবং তার প্রকৃত স্রষ্টার অভাবের কথা মনে রেখে, সেই শূন্যস্থান পূরন করেছেন সত্যজিৎ মাত্র তার ২৭ বছর পরে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথই পুনর্জন্ম লাভ করেছেন সত্যজিৎ নামক এই বিশ্বচলচ্চিত্র কর্মার মাঝে পরিপূর্ন এবং সম্পূর্নরুপে, মননে, মেধায়, কর্মে, বৈদগ্ধে উদ্যোগে, আচরনে এবং সর্বোপরি শিল্পসৃষ্টিতে

কবি সমরেশ দেবনাথ
রচিত-সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ

গ্রন্থ	প্রকাশনী	দাম
শ্রেষ্ঠা কবিতা	৩য় সংস্করণ-বিশ্বকবতিা পরিষদ	১০০.০০
বর্তমানে বিশ্বের কবিতা (প্রবন্ধ)	২য় সংস্করণ-তরফদার প্রকাশনী	১০০.০০
The Art of Kissing (Poetry)	2nd Edition World Link	200.00
ভূমিপুত্র	৪র্থ সংস্করণ-চিত্রকথা প্রকাশনী	১০০.০০

মৃত্তিকা কন্যা	২য় সংস্করণ চিত্রকথা প্রকাশনী	১০০.০০
বঙ্গবন্ধু: বাংলা ও বিশ্বসাহিত্যে	বিশ্বকবিতা পরিষদ (সম্পাদিত)	১০০.০০
ড. ওয়াজেদ: স্মারক গ্রন্থ	কবীর চৌধুরী উপদেষ্টা	১৫০.০০
বিশ্ব কবিতা (বাংলা) ৪র্থ সংখ্যা	সম্পাদিত	১০০.০০
অস্ট্রিক ১০ম সংখ্যা	কবীর চৌধুরী প্রধান সম্পাদক	১০০.০০
World Poetry	সম্পাদিত	১০০.০০
বাংলা ও বিশ্বের গ্রন্থ পরিচিত	বিশ্বসাহিত্য সংগ্রহশালা (সম্পাদিত)	১০০.০০
Myth and Earth (English)	World Link	200.00
শ্রেণী বৈষম্যের গল্প	হাওলাদার প্র:	১০০.০০
চিরায়ত কবিতা	World Link	200.00

বাংলাদেশের উপন্যাসের ইতিহাসে এক নতুন সংযোজন
৫০ বছর আগে রচিত কিন্তু সম্প্রতি উদ্ধারকৃত ও প্রকাশিত
সুনীল বরণ দে-**র উপন্যাস**

বাঁ ধ ভে ঙে দা ও

গ্রন্থের ভূমিকায় কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক লিখেছেন:
'সুনীল বরণ দে তাঁর সমাজের একটা আটকানো সময়ের
ছবি তুলে এনেছেন। তাঁর সমাজের বদ্ধতা, প্রথানুগত্য,
বর্ণপ্রথার অমানবিকতা আমাদের সামনে এক বর্ণনাময়
লিখনকৌশলে হাজির করেছেন। বইটি পড়ার সময় খেয়াল
করি তাই তো, পাঁচের দশকের কোনো উপন্যাসেই তো
এই চিত্র আসে নি।'

গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের
সহযোগী অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর;
প্রকাশ করেছেন বাংলা বাজারের মনন প্রকাশ

পলল প্রকাশনী
শো-রুম : ৪৭ (নিচ তলা), আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০,
মোবাইল: ০১৯২৪-৪৭৬০৫৮, ০১৭২০-১৭২৫৮৯

সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি বই

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের রূপরেখা (চলচ্চিত্র)
অনুপম হায়াৎ

ভারত বর্ষের ধর্ম ও দর্শন (ধর্ম ও দর্শন)
প্রেম রঞ্জন দেব

হুমায়ুন আজাদ মৃতদের সমান অভিজ্ঞ (প্রবন্ধ)
কুমার চক্রবর্তী

টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি (ইতিহাস,পরিচিতি)
খান মাহবুব

লালন সাঁইয়ের সন্ধানে,
(লালনের জীবনদর্শন ও গান) আবুল আহসান চৌধুরী

মাত্রামানব ও ইচ্ছামৃত্যুর কথকতা
(আত্মহত্যা বিষয়ক প্রবন্ধ) কুমার চক্রবর্তী

পরিবর্তনশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক আইন
(আইন গ্রন্থ) ড. মিজানুর রহমান,

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : একটি আইন
অনুসন্ধান (যুদ্ধাপরাধ) সম্পাদক- ড. মিজানুর রহমান

সম্প্রচার সংবাদ : রূপরেখা,
(টেলিভিশন সাংবাদিকতা) লেখক ফারুক আলমীর

প্লাটিনিংকা (সায়েন্স ফিক্‌শন) উপমা গুহ

মুঠোফোনের কাব্য (কবিত) নির্মলেন্দু গুণ

সাতটন জোক্‌স (জোক্‌স) সংগ্রাহক আলম তালুকদার

অন্যদেশে অন্য ভুবনে -, (ভ্রমণ কাহিনী) বিমল গুহ